হাস্যরসিক পরশুরাম

শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত



এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক :
জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টার
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

সরকার প্রদত্ত কাগজে মুদ্রিত

প্রথম প্রকাশ, ১লা, বৈশাখ, ১৩৬৭

প্রচ্ছদপট : তিলক বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্লক : স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোম্পানী

মুদ্রাকর :
শ্রীমন্মথনাথ পান
নবীন সরস্বতী প্রেস
১৭, ভীম ঘোষ লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

স্বাধীনতাসংগ্রামী, আদর্শনিষ্ঠ, নীতিধর্মে অটল, পরহিতব্রতী, বন্ধুবৎসল,
সাহিত্যপ্রেমিক, হাস্যরসজিজ্ঞাসু, একান্তসুহৃদ্
সুরেশচন্দ্র দে'র স্মৃতির উদ্দেশে—



মুখবন্ধ

বিজ্ঞানের ছাত্র ও ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের সফল কর্ণধার রাজশেখর বসু সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন প্রৌঢ় বয়সে অপ্রত্যাশিত ভূমিকায়—ব্যঙ্গকৌতুকের স্রষ্টা হিসাবে, 'পরশুরাম' ছদ্মনামের আড়ালে। নূতন অভিযানে তাঁহার প্রতিষ্ঠাও ছিল অপ্রত্যাশিত। প্রথম দুইটি গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি প্রথম শ্রেণীতে স্থান করিয়া লয়েন। এই দুইটি গ্রন্থে গল্প ছিল দশটি : শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড, চিকিৎসা-সঙ্কট, লম্বকর্ণ, ভূশণ্ডির মাঠে ('গড্ডলিকা') এবং বিরিঞ্চিবাবা, জাবালি, দক্ষিণরায়, স্বয়ংবরা, কচি-সংসদ্ ও উলট পুরাণ ('কজ্জলী')। ইহাদের মধ্যে সবগুলি গল্প সমান মর্যাদা দাবী করিতে পারে না এবং ইহাদের প্রসিদ্ধির ভিত্তি গল্পগুলির সামগ্রিক উৎকর্ষ অপেক্ষা কতকগুলি চমকপ্রদ উক্তি ও অনেক উদ্ভট উদ্ভাবন, যেমন, 'অটোম্যাটিক শ্রীদুর্গাগ্রাফ', 'হয়। zাস্তি পার না', লাটু নন্দী ও কেরাসিন ব্যাঙ, বৈবস্বত মনুকে ইয়ার-হিসাবে 'বিবু'-সম্বোধন, ''ননির বুঝি কাঁচা ঘাস আর হজম হয় না', 'ঠোঁটের সিঁদুর অক্ষয় হ'ক', 'লালিমা পাল (পুং)', সার আশুতোষের এক ভলুম এনসাইক্লোপেডিয়া লইয়া প্যালারাম ওরফে পেলব রায়কে তাড়া করা, সাম্রাজ্যবাদী ভারত-সরকারের উড়িয়া সার্জেন্ট দ্বারা গণ্যমান্য ব্রিটিশ প্রজাকে অপমানের অভিযোগ ইত্যাদি।

সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই যদি প্রচুর প্রসিদ্ধি লাভ হয় তাহা হইলে কখনও কখনও অসুবিধারও সৃষ্টি হয়। পাঠকের মনে হয় যে পূর্ণ পরিণতির পর তো আর উন্নতি সম্ভব নয় ; সুতরাং এখন স্রষ্টার প্রতিভা ম্লান হইতে বাধ্য। সেই কারণে 'গড্ডলিকা' ও 'কজ্জলী'র পর পরশুরাম আরও অনেক গল্প লিখিলেও সেই সকল গল্প, বিশেষ করিয়া তাঁহার পরের দিকে রচিত ছোটগল্প যথাযোগ্য সমাদর লাভ করে নাই। অথচ এই সকল ছোট গল্পের অনেকগুলিই সুসংহত, ইহাদের মধ্যে চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও গভীরতা সমধিক লক্ষণীয় এবং এই সকল গল্পে বিদ্রূপ ও কৌতুকের মধ্য দিয়া জীবনের রহস্যের উপর আলোকসম্পাত করা

হইয়াছে। আবার কোথাও কোথাও রোমান্সের অনুপ্রবেশে ব্যঙ্গকৌতুক সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। কিন্তু প্রথম দুই গ্রন্থের হৈ-হট্টগোল, অট্টহাস্য বা জাঁকজমক এই সকল ছোটগল্পে নাই। তবু আমার মনে হয় ইহাদের শিল্পনৈপুণ্য খুব উঁচু দরের এবং 'ভরতের ঝুমঝুমি', 'রটন্তীকুমার', 'আনন্দী বাঈ', 'নির্মোক নৃত্য', 'দুই সিংহ', 'গগনচটি', 'চিঠিবাজি', 'দাঁড়কাগ', 'যশোমতী', 'তিলোত্তমা', 'শিবামুখী চিম্‌টা' প্রভৃতির মত গল্প খুব বেশি পড়ি নাই।

বর্তমান গ্রন্থ রচনার একটু ব্যক্তিগত ইতিহাস আছে। তাহা নিবেদন করিয়া এই মুখবন্ধের উপসংহার করিব। প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর আগে গুরুতর হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া ডাক্তারের নির্দেশে নির্জন কক্ষে আবদ্ধ হই। প্রথম দিকে বই পড়াও নিষিদ্ধ ছিল, তারপর সেই নির্দেশ শিথিল করা হইলে পরশুরামের গ্রন্থাবলীকে ছাড়পত্র দেওয়া হইল, কিন্তু ডাক্তাররা বলিলেন আমার নিজের পড়া অপেক্ষা অপরের পড়িয়া শোনানো অধিকতর যুক্তিযুক্ত হইবে। হাতের কাছেই ছিল আমার নাতি শ্রীমান্ অংশুমান্ রায়। সে প্রথম খণ্ড শেষ করিয়া দ্বিতীয় খণ্ড শোনাইত, তারপর তৃতীয় খণ্ড; ততদিনে প্রথম খণ্ড আবার নূতন করিয়া শোনার জন্য উন্মুখ হইতাম. তারপর দ্বিতীয় খণ্ড এবং দ্বিতীয়ের পর তৃতীয়। মাসের পর মাস আমি—সঙ্গে সঙ্গে আমার নার্স—স্তব্ধ হইয়া শ্রীমানের সুললিত পাঠ শুনিতাম। স্বাভাবিক দক্ষতার সঙ্গে দাদাভাইয়ের এই বিষয়ে অভিজ্ঞতাও ছিল। সে নাকি 'লম্বকর্ণ' গল্পের একাধিক নাট্যরূপে লম্বকর্ণের এবং কখনও কখনও বংশলোচনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছে। আমার বিশ্বাস জটাধরের পার্টেও তাহাকে বেশ মানাইবে। আমি নিজেও তখন এবং তাহার পরে বহুবার আমাদের প্রিয় গল্পগুলি পড়িয়াছি এবং এই বই লিখিতে বসিয়া অংশুমানের তাৎপর্যপূর্ণ পঠন-পাঠনের কথা বারংবার স্মরণ করিয়াছি। এই সঙ্গে আর একটা কথাও মনে হইয়াছে। 'বটেশ্বরের অবদান' গল্পে সঞ্জীব ডাক্তার মন্তব্য করিয়াছেন, 'হার্ট খারাপ হয় তো চিকিৎসা করাবেন, ডিজিটালিস, অ্যামিনোফাইলিন, থেলিন এইসব দেবেন।' আমি ডাক্তার নই; তবু এই প্রেসক্রপশনে একটু সংযোজন করিতে চাই। হৃদ্‌রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে ওষুধ যাই দেওয়া হউক, অনুপান হিসাবে পরশুরামের গল্পপাঠের ব্যবস্থা করিলে সুফল পাওয়া যাইতে পারে।

আমার ভূতপূর্ব ছাত্র শ্রীপ্রতিভাকান্ত মৈত্র সমগ্র পাণ্ডুলিপি পড়িয়া দেওয়ায় অনেক ভুলত্রুটি সংশোধন করিতে পারিয়াছি। যাহা বাকী রহিল তজ্জন্য পাঠকের মার্জনা চাহিতেছি।

শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

সূচীপত্র

উপক্রমণিকা

(১)

আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে রাজশেখর বসু ওরফে পরশুরাম অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক। তাঁহার হাস্যরসপ্রধান গল্পসমূহের—তিনি অন্য কোন শ্রেণীর গল্প লিখেন নাই—অল্পবিস্তর সমালোচনাও হইয়াছে। যাঁহারা এই সকল ছোট ও বড় গল্পের বিশ্লেষণ ও বিচার করিয়াছেন তন্মধ্যে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি পরশুরামের হাস্যরসের কতকগুলি প্রধান লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে বঙ্গসাহিত্যের হাস্যরসিকদিগকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে—প্রাচীন ও নবীন। প্রাচীন হাস্যরসিকেরা—ঈশ্বরগুপ্ত হইতে দ্বিজেন্দ্রলাল—বিশুদ্ধ হাস্যরস সৃষ্টি করিতে চাহেন নাই; তাঁহারা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়া, প্রধানতঃ নব্য ফ্যাশন অথবা প্রাচীন কুসংস্কারকে বিদ্রূপ করিবার উদ্দেশ্যেই, হাসির সৃষ্টি করিয়াছেন। পরশুরামের মত আধুনিক হাস্যরসিকেরা শুধু সমসাময়িক কালে যে সকল অসামঞ্জস্য দেখিতে পাইয়াছেন তাহাকে উদ্ঘাটিত করিয়াই খুশী। ইহার অন্তরালে সংস্কারকের মনোবৃত্তি ক্রিয়াশীল হয় নাই। এই যুক্তি অংশতঃ সত্য। পরশুরামের হাসি অন্যান্য হাস্যরসিকদের ব্যঙ্গবিদ্রূপ অপেক্ষা অনেক বেশি স্বয়ংসম্পূর্ণ। কিন্তু ইহাও মানিতে হইবে কোন সাহিত্যই একবারে উদ্দেশ্যহীন হইতে পারে না, আবার প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ সাহিত্যই উদ্দেশ্যকে অতিক্রম করিয়া সার্বভৌমিকতা লাভ করে। পরশুরামের হাস্যরসের অন্যতম আকর্ষণ এই যে ইহার মধ্যে উদ্দেশ্য প্রকট হইয়া পড়ে নাই; কোন কোন ক্ষেত্রে এই নিরালম্বতা ইহাকে লঘু করিয়া দিয়াছে।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় খুব সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের সাহায্যে দেখাইয়াছেন যে, পরশুরাম অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ গল্পে প্রাচীন বিশ্বাস এবং আধুনিক যুগের নাস্তিকতা, যান্ত্রিকতাকে পাশাপাশি রাখিয়া এক অপূর্ব রসজগৎ রচনা করিয়াছেন। আমরা আধুনিক বিজ্ঞানকে গ্রহণ করিয়াছি অথচ প্রাচীন বিশ্বাসকে ত্যাগ করিতে পারি নাই। এই দুইয়ের আনাগোনা ও বৈপরীত্য নানারূপ হাস্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি

করিতে পারে এবং পরশুরাম সেই জাতীয় বহু পরিস্থিতির উদ্ভাবন করিয়াছেন। যে ব্রহ্মর্ষি দুর্বাসা প্রাচীনকালে দেবতা দৈত্য মানুষের বহু সংকট সৃষ্টি করিতেন তাঁহার সংকট মোচন করিয়াছে বিংশ শতাব্দীর এক অর্বাচীন বালক তাহার খেলার ইঁদুর খুঁজিতে যাইয়া। অপর দিকে—এই সকল দৃষ্টান্ত সমালোচক উল্লেখ করেন নাই—আমরা দিব্যমানবদের সাহচর্যে ইন্দ্রসভায় যাইয়া উর্বশীর পরাজয় এবং মর্ত্যে অবতরণ দেখিতে পাই। সিদ্ধিনাথ তো প্রজাপতি ব্রহ্মার সৃষ্ট তিলোত্তমা এবং আধুনিক জগতের চিত্রতারকা তিলোত্তমাকে পাশাপাশি উপস্থাপিত করিয়া ইহাদের অভিন্নতা ও সারহীনতা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন।

পরশুরাম যেখানে প্রাচীন জগৎকে পরিত্যাগ করিয়া আধুনিক জগতে নিজেকে সীমাবদ্ধ করিয়াছেন সেইখানেও অনুরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। আধুনিক জীবনে দূর নিকট হইয়াছে, জীবনের গতি অনেক দ্রুত হইয়া গিয়াছে এবং নানা বৈচিত্র্য ও জটিলতা আসিয়া গিয়াছে। কিন্তু এই ব্যাপ্তি ও জটিলতা নানা উপহাসাস্পদ পরিস্থিতির সম্ভাব্যতা সৃষ্টি করিয়াছে। আমাদের অতি পরিচিত আধুনিক ব্যবসায়ের জটিলতার মধ্যে শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী প্রাচীন অন্ধবিশ্বাসকে প্রবিষ্ট করিয়া এবং গণ্ডেরিরাম প্রাচীন আচারে ও পাপপুণ্যের ব্যাপারে সূক্ষ্ম হিসাব ঢুকাইয়া দিয়া অভিনব হাস্যরসের মালমসলা আমদানী করিয়াছেন। শিক্ষিত ও শিক্ষিতা তরুণ-তরুণীরা—অনেক সময় তাহাদের অভিভাবকদের তত্ত্বাবধানে—পাত্রপাত্রী নির্বাচন করিতে যাইয়া উদ্ভট পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। তাহার কৌতুকরস নানা গল্পে পরিবেশিত হইয়াছে। আবার ইহাও দেখা যায় যে যেখানে বিবাহের কোন সম্ভাবনাই ছিল না, সেখানে ট্রাম হইতে পতন, অপরিচিত সহযাত্রীদের অযাচিত উপদেশ, আড্ডাধারী বন্ধুদের নির্বন্ধাতিশয্যের ফলে চিকিৎসাবিভ্রাটে এক অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে এবং ইহার মধ্যে অতনু দেবতা পুষ্পবাণ নিক্ষেপ করিয়া এমন এক সমাধান করিয়া দিলেন যাহার ফলে আড্ডাটাই ভাঙিয়া গেল এবং মোটর কেনা হইল বটে কিন্তু নূতন বিপুলা আরোহিণীর অভ্যাগমে যাহারা এই মোটর কেনার জন্য বেশি উৎসাহ দেখাইয়াছিল তাহাদের আর জায়গা হইল না।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পরশুরামের গল্পগুলির যে বিশ্লেষণ দিয়াছেন তাহা হইতে তিনি কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। প্রথমতঃ 'এই হাস্যরসের

প্রধান উপাদান হাস্যরসজনক পরিস্থিতির উদ্ভাবন-নৈপুণ্য।' রসিকতা করিবার পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্য লইয়া পাত্র-পাত্রীরা রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয় নাই। পরিস্থিতির প্রভাবই তাহাদের মধ্যে হাস্যরসের নিষ্কাশন করিয়াছে। নিজ অন্তর্নিহিত প্রবণতা অপেক্ষা বাহ্য প্রতিবেশের প্রভাব প্রবলতর হওয়ার জন্য এই সকল রচনার রসিকতা খুব উচাঙ্গের হয় নাই এবং কোন উঁচুদরের কমিক চরিত্রের সন্ধান এইখানে পাওয়া যায় না।

চরিত্রসমূহের কথোপকথনেরও নিজস্ব দীপ্তি নাই; প্রায় কোন উক্তিই পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিজ প্রকাশভঙ্গির তীক্ষ্ণতার দ্বারা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। অবশ্য সমালোচক লক্ষ্য করিয়াছেন যে, পরশুরামের হাস্যরসের একটা লক্ষণ পরিমিতিবোধ ও সংযম-জ্ঞান। একটু অগ্রসর হইয়া বলা যাইতে পারে, এই ক্লাসিক পরিমিতিবোধ তাঁহার স্টাইলেও প্রতিফলিত হইয়াছে; বিশেষ করিয়া এই জন্যই তাঁহার চরিত্রদের অনেক উক্তি স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পরশুরামের হাস্যরসের আর একটি ত্রুটি লক্ষ্য করিয়া আলোচনা শেষ করিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ হাস্যরস বা humour-এর একটা লক্ষণ হাস্যরসের সহিত করুণ রসের সমাবেশ; কিন্তু ইহার পরিচয় এখানে পাওয়া যায় না।

ইহা সত্য অনেক শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে হিউমারের সঙ্গে করুণের সংমিশ্রণ থাকায় তাহা অনন্যসাধারণ মাধুর্য লাভ করে। ইহার সব চেয়ে বড় দৃষ্টান্ত ডন্ কুইক্সোট; আমাদের দেশের সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের হাস্যরস এই কারণে অপরাজেয় হইয়াছে। কিন্তু করুণরসের স্পর্শ না থাকিলেও হাস্যরস যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারে তাহার সাক্ষ্য অ্যারিস্টফেনিস, রাবেলে, মলিয়ের, বার্ণার্ড শ'—আর পরশুরাম। ইহাও সত্য যে পরশুরামের গল্পের আবেদন প্রধানতঃ হাস্যকর পরিস্থিতি উদ্ভাবন হইতেই আহৃত হয় এবং যেহেতু তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা ছোট গল্প সেই জন্য চরিত্রসৃষ্টির পরিধিও সীমিত। কিন্তু এই স্বল্প-পরিসরের মধ্যে দুই-একটি রেখার টানে অনেক চরিত্রই ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে। যেখানেইআড্ডা প্রভৃতির কথা আছে, সেইখানেই আড্ডাধারীরা—নিধে, বিনোদ উকিল, পিনাকী সর্বজ্ঞ ও ট্রেনযাত্রী ('একগুঁয়ে বার্থা'), ট্রামযাত্রী ('চিকিৎসা-সংকট') প্রভৃতি প্রত্যেকেই স্বীয় ব্যক্তিত্ব পাঠকের মনে মুদ্রিত করিয়া দেয়, এমন কি বেলেঘাটা কেরোসিন ব্যাঙের কথোপকথনও আপন বৈশিষ্ট্যে

সমুজ্জ্বল। ইহা ছাড়া কতকগুলি চরিত্র অন্তর্নিহিত প্রবর্তনার দ্বারাই পরিবেশের উপর আপন বৈশিষ্ট্য মুদ্রিত করিয়া দিয়াছে। সিদ্ধিনাথের চরিত্রের বৈচিত্র্য ও সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যের কথা বিদগ্ধ সমালোচক নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু জটাধর বকশী যে প্রতিদিন নূতন পরিস্থিতি রচনা করিয়াছে তাহা তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। কেদার চাটুজ্যের অনেক মন্তব্য আপন মহিমায় স্মরণীয় এবং 'স্বয়ংবরা' গল্পে স্বীয় প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের দ্বারা তিনি অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি আয়ত্তে আনিয়াছেন।

(২)

জনৈক সমালোচক বলিয়াছেন সাহিত্যের চরিত্রগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। কতকগুলি চরিত্র চেপটা (flat)—তাহাদিগকে একনজরে দেখিয়া ফেলা যায়, কারণ তাহাদের মধ্যে ব্যাপ্তি থাকিলেও গভীরতা, জটিলতা বা দুরবগাহ রহস্য নাই। আর কতকগুলি চরিত্রকে বলা যায় গোলাকার—ইহাদিগের সম্পূর্ণ পরিচয় কখনও পাওয়া যায় না, ইহারা এত জটিল ও রহস্যময় যে, যে এদিক দেখিবে তাহার কাছে ওদিক ধরা পড়িবে না। বলা বাহুল্য এই দ্বিতীয় শ্রেণীর চরিত্রগুলিই সেরা চরিত্র। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে এত বৈচিত্র্য ও গভীরতা থাকে, তাহা এত রহস্যময় যে সমালোচনা একটা সামান্য সূত্রের সন্ধান করিতে চেষ্টা করে বলিয়া একদেশদর্শী হইয়া পড়ে এবং বিভিন্ন সমালোচনার সমন্বয় ও বৈপরীত্যের মধ্য দিয়াই সাহিত্যের সমগ্র রূপ পরিস্ফুট হয়। ইহাই সমালোচনা-বৈচিত্র্যের সার্থকতা।

রাজশেখর বসু বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন এবং কর্মজীবনে বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা ছিলেন। কর্মব্যস্ত ব্যবসায়ী হইলেও তিনি ছিলেন বহুশ্রুত লেখক এবং তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল সংস্কৃত সাহিত্যে ও শাস্ত্রে। তিনি রামায়ণ ও মহাভারতের সংক্ষিপ্ত, তথ্যনিষ্ঠ গদ্য রূপান্তর করিয়াছিলেন। তিনি কৃত্তিবাস বা কাশীরাম দাসের মত কবিপ্রতিভা দাবী করেন নাই, আবার তাঁহাদের মত মূল কাহিনীতে কোন পরিবর্তনও করেন নাই। তাঁহার সম্পাদিত 'মেঘদূত' উচ্ছ্বাসহীন মূলানুগ অনুবাদ ও অন্বয়। তিনি যে

'চলন্তিকা' অভিধান সংকলন করিয়াছিলেন তাহার উদ্দেশ্য বাঙালী লেখক ও পাঠককে দৈনন্দিন লিখন পঠনে সাহায্য করা।

এই বাস্তবানুগ, তথ্যনির্ভর, উচ্ছ্বাসবিরোধী, এক কথায় অ-রোমান্টিক মনোবৃত্তি পরশুরামের হাস্যরসেও প্রতিফলিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলিতে পারেন, সমস্ত হাস্যরসই বৈপরীত্য, অসঙ্গতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং সেইভাবে আতিশয্য ও অতিরেককে সংযত করিয়া মানুষকে সহজ, সাধারণ পথে বিচরণ করিতে বাধ্য করিয়া তাহাকে ভাবনায়, ভাবপ্রকাশে পরিমিত, সংযত, বস্তুনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দেয়। এই শেষোক্ত মত কিন্তু ঠিক নহে। অনেক শ্রেষ্ঠ কমিক লেখক আছেন যাহাদের হাস্যরস প্রাচুর্য ও আতিশয্যের মধ্য দিয়া উপচাইয়া পড়ে এবং সেইখানেই তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য। এমনি লেখক হইতেছেন রাবেলে, বোকাচ্চিও, শেক্সপীয়র। পরশুরাম ইঁহাদের অনুগামী নহেন। তিনি প্রজাপতি ব্রহ্মা, দেবরাজ ইন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া স্কুলের ছাত্রের রোমান্টিক কল্পনাকে নীরস ব্যবহারিক জীবনের মাপকাঠিতে বিচার করিয়া ব্যঙ্গকৌতুকের উপাদানে পরিণত করিয়াছেন।

তাঁহার রচিত দুইটি গল্প—'অদলবদল' ও 'জাবালি'—তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি বুঝিতে সাহায্য করিবে। এই দুইটি গল্পের বিষয়বস্তু পৌরাণিক সাহিত্য ও কিংবদন্তী হইতে গৃহীত। 'অদলবদল' গল্প হিসাবে উদ্ভট, অসার্থক; ইহার মধ্যে সমালোচকের চিন্তা প্রবন্ধের সমতলভূমি পরিত্যাগ করিয়া রসের আকাশে উড্ডীন হইতে পারে নাই। তাহা হইলেও এই গল্পটিকে পরশুরামের রসজগতের চাবিকাঠি হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। আমাদের দেশের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লিরিক কাব্য কালিদাসের মেঘদূত; যে কোন সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লিরিক কবিতার সঙ্গে ইহা তুলিত হইতে পারে। ইহার অন্যতম প্রধান লক্ষণ উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগ যাহার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন:

মেঘমন্দ্র শ্লোক
বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক
রাখিয়াছে আপন আঁধার স্তরে স্তরে
সঘন সংগীত মাঝে পুঞ্জীভূত করে।

রাজশেখর বসু এই অমর কাব্যের সংক্ষিপ্ত, সুললিত, সহজবোধ্য সংস্করণ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু ব্যবহারিক নিরিখে দেখিলে এই ভাবোচ্ছ্বাস ভাবাতিরেক

বলিয়া মনে হইবে। বিষয়টি তো এই : কর্তব্যে ত্রুটি হওয়ায় ,জনৈক যক্ষ যক্ষরাজ কুবের কর্তৃক মাত্র এক বৎসরের জন্য অলকাপুরী হইতে নির্বাসিত হইয়াছেন ; এক বৎসর পূর্ণ হইলে তিনি অলকায় ফিরিয়া গিয়া স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হইবেন। এই শাস্তি কাহারও পক্ষে খুব বেশি ক্লেশদায়ক হইতে পারে না। মর্ত্যলোকে এমন মানুষ কমই আছে যে কোন না কোন কারণে প্রণয়িনীর নিকট হইতে এতটা সময় বিচ্ছিন্ন থাকে নাই। বিশেষতঃ পুরুষমানুষকে কাজে-অকাজে বিদেশে যাইতে হইবেই। বরং এতকাল প্রোষিতভর্তৃকা, একবেণীধরা গৃহলক্ষ্মীদের বিরহকাতরতাই সাহিত্যে বর্ণিত হইয়াছে এবং সমাজেও তাহারা সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছে। কিন্তু কালিদাসের যক্ষ একটু ভিন্ন রকমের পুরুষ। কয়েক মাস যাইতে না যাইতেই তিনি বিরহযন্ত্রণায় এত কাতর হইয়া পড়িলেন যে তিনি চেতন-অচেতনের পার্থক্য ভুলিয়া গিয়া মেঘকেই ভ্রাতৃসম্বোধন করিয়া বসিলেন এবং তাহাকে সংবাদবাহ করিয়া স্ত্রীর নিকট পাঠাইলেন। এই কয়েক মাসের বিচ্ছেদেই তাঁহার শরীর এত কৃশ হইয়া গেল যে অলক্ষ্যে তাঁহার হাতের সোনার বালা খসিয়া পড়িল। প্রশ্ন জাগিতে পারে মেয়েলোকের মত সোনার-বালা-পরা, চেতন-অচেতনের বিভিন্নতা সম্পর্কে প্রকৃতিকৃপণ, অশ্রুপাতপ্রবণ যক্ষ কি ধরনের পুরুষ ? এই প্রশ্নের অভিনব উত্তর দিয়াছেন ব্যঙ্গরসিক পরশুরাম। তিনি মনে করেন যে এই ছিঁচকাঁদুনে যক্ষ খাঁটি পুরুষই নহেন। তিনি রামগিরি পর্বতে যাইয়া পৌরুষ হারাইয়াছিলেন বলিয়াই ঐরূপ প্রলাপোক্তি করিতে পারিয়াছিলেন এবং পরে যক্ষিণীতে রূপান্তরিত হইয়াছিলেন। এই ব্যাখ্যার সমর্থনে পরশুরাম উদ্ভট শাস্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন। মহাভারতে কথিত আছে যে কাশীরাজদুহিতা অম্বা ভীষ্মকে মারিবার জন্য তপস্যা করিয়া পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের নপুংসক পুত্র শিখণ্ডী রূপে জন্মান্তরিত হয়েন। পরশুরাম বলিতেছেন যে, অম্বা দ্রুপদকন্যা শিখণ্ডিনী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভীষ্মকে মারিবার জন্য তাঁহার পুরুষ হওয়ার প্রয়োজন হয় এবং বিরহী যক্ষ দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে স্বীয় পুরুষত্ব ধার দিয়া নিজে যক্ষিণীতে রূপান্তরিত হয়েন। এই রূপান্তরণের তাৎপর্য এই যে, যে শ্লোকাবলীতে কালিদাস বিরহের ব্যাকুলতার চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা মেয়েলী কান্না ; ইহা মধুর হইতে পারে, সুন্দর হইতে পারে, কিন্তু পুরুষের পক্ষে ইহা অশোভন, তাই অংশতঃ উপহাসাস্পদ।

(৩)

যে কাহিনীর সারাংশ উপরে সংকলিত হইল তাহা 'অদল-বদল'-গল্পের দ্বিতীয় পর্বের সঙ্গে সম্পর্কহীন ; গল্প হিসাবেও ইহার কোন মূল্য নাই। ইহা শুধু 'মেঘদূত'-কাব্যের উপর ব্যঙ্গরসিকের টিপ্পনী এবং সেই হিসাবেই এই নিকৃষ্ট গল্প অন্য সার্থক গল্পের রস উপলব্ধি করিতে সাহায্য করে। যে যক্ষ শোকে অর্ধোন্মাদ হইয়া মেঘকে দূত নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাঁহার পৌরুষহানির বাহ্য রূপ হইল শিখণ্ডিনীকে স্বীয় পুরুষত্বদান। কুবেরের নির্দেশে শিখণ্ডী যক্ষকে ধার করা পুরুষত্ব ফেরত দিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু শিখণ্ডী ভীষ্মবধের সংকল্প হইতে নিরস্ত হইলেন না। সেই উদ্দেশ্য সাধন করিতে তিনি কৃষ্ণের দ্বারস্থ হইলেন।

পরশুরাম কল্পনা করিয়াছেন যে, কৃষ্ণ এবং নারদের সাহায্যে শিখণ্ডী—এখন পুনরায় শিখণ্ডিনী—নদীতীরে আশ্রমবাসী আয়ান ঘোষের কাছে উপস্থিত হইলেন। এই আয়ান কৃষ্ণের মাতুল, শ্রীরাধার স্বামী। ইনি কৃষ্ণের প্রতি সদয় নহেন ; ইহার কারণ বিবৃত করা নিষ্প্রয়োজন। কৃষ্ণের জন্যই ইনি গৃহী হইয়াও গৃহশূন্য। সংসারে ইনি একাকী, সমাজে ইনি নিন্দা ও উপহাসের পাত্র। কাজেই তিনি মনের দুঃখে নিভৃতে জপতপ শাস্ত্রপাঠ লইয়া ব্যাপৃত থাকেন। নারদকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া রাজকন্যা শিখণ্ডিনী এই প্রস্তাব দিলেন যে, অল্প কয়েক দিনের জন্য আয়ান তাঁহার পুরুষত্ব রাজকন্যাকে ধার দিবেন। তাঁহার ব্রত অর্থাৎ ভীষ্মবধ সমাপ্ত হইলে, শিখণ্ডী আবার শিখণ্ডিনী হইবেন। আয়ান পুরুষত্ব ফিরিয়া পাওয়ার পর তিনি শিখণ্ডিনীকে বিবাহ করিবেন ও দ্রুপদের নিকট হইতে প্রচুর যৌতুক পাইবেন। ভীষ্মবধ সমাপ্ত হইল বটে, কিন্তু শিখণ্ডী নিস্তার পাইলেন না ; পরশুরামের গল্পে দেখি অশ্বত্থামা গভীর রাত্রিতে পাণ্ডব শিবিরে ঢুকিয়া অন্যান্যের সঙ্গে শিখণ্ডীকেও হত্যা করিলেন। আয়ানের পুরুষত্ব আর ফিরিয়া আসিল না ; সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া তিনি আয়ানী নাম গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিয়া ব্রজমণ্ডলের ষোল হাজার গোপিনীদের নেত্রী হইয়া কৃষ্ণকীর্তন করিয়া খ্যাতি লাভ করিলেন।

শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রেম বৈষ্ণবধর্মের প্রধান উপজীব্য এবং এই প্রেমকথাকে অবলম্বন করিয়া যে বৈষ্ণবকাব্য রচিত হইয়াছে তাহা ভারতীয় সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। 'পদকল্পতরু' সম্পাদক বৈষ্ণবপ্রবর সতীশচন্দ্র রায় এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, এই কথা ভুলিলে চলিবে না যে শ্রীরাধা হইলেন

ভগবানের পরাশক্তি বা পরাপ্রকৃতি। ইহা হইতেই বৈষ্ণবধর্মের মূলতত্ত্বের আভাস পাওয়া যাইবে। শুধু কাব্য হিসাবে দেখিলে এই প্রেমের মানবিক ঐশ্বর্যই মনকে বেশি অভিভূত করে। কোন কোন বৈষ্ণব সাধক বলেন, ঈশ্বরের জন্য ভক্তহৃদয়ে যে আকৃতি জাগ্রত হয় পার্থিব জগতে তাহার রূপক খুঁজিতে হইলে সেই 'তপ্ত প্রেমতৃষা'কেই অবলম্বন করিতে হইবে যাহা অন্য সমস্ত বন্ধনকে ছিন্ন করিয়া, ধর্ম, সংসার, সমাজকে তুচ্ছ করিয়া, লজ্জাসংকোচকে বিসর্জন দিয়া, দয়িতের প্রতি অভিনিবিষ্ট হয়। বৈষ্ণব কবিরা এই একাগ্র প্রেমের জয়গান করিয়াছেন। বৈষ্ণবসাহিত্যে রাধার চিত্তদীর্ণ ব্যাকুলতা, সামাজিক অপযশ, সাংসারিক লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা—সব কিছুরই অপরূপ চিত্র আঁকা হইয়াছে।

বাস্তববাদী পরশুরাম এই ধর্মীয় রূপক ও রোমান্টিক উচ্ছ্বাসের 'প্রাকৃত' স্বরূপ তুলিয়া ধরিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণের প্রেম কোন অতীন্দ্রিয়, অলৌকিক, অনির্বচনীয় ঐশ্বরিক রহস্যের রূপক নহে, ইহার রোমান্টিক উচ্ছ্বাসও অতিশয়োক্তি-জর্জরিত। অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ বিরূপ মন্তব্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ইংলণ্ডের রক্ষক দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাত্মা সন্ত জর্জ সম্পর্কে গিবন যে ইতিকথা পরিবেশন করিয়াছেন তাহা জুগুপ্সারই সঞ্চার করে।

অক্ষতযোনি মেরিমাতার গর্ভে যিশুর আবির্ভাব সম্বন্ধে বিধর্মী ইহুদী ও গ্রীক ও রোমান pagan-দের মধ্যে যে জনরব প্রচলিত ছিল তাহা এত কুৎসিত যে উহার পুনরুক্তি করিতেও লজ্জা হয়।* আমাদের দেশে রাধাকৃষ্ণের প্রেম লইয়া কত গভীর তত্ত্ব, কত অতুলনীয় কাব্যের উদ্ভব হইয়াছে। তবু এই দাম্পত্যবন্ধনবহির্ভূত সম্পর্ক হাস্য-রসিকের দৃষ্টি একেবারে এড়ায় নাই। পাণিনি ব্যাকরণের পরিধি বিশাল; ইহার অগণিত সূত্রের মধ্যে কোথাও কোথাও দুইটি তুল্যবলযুক্ত নির্দেশ থাকিতে পারে। সেই সকল ক্ষেত্রে পাণিনি বিধান দিয়া গিয়াছেন এইরূপ বিপ্রতিষেধ বা তুল্যবলশালী সূত্র থাকিলে, পরেরটি মানিয়া চলিতে হইবে ('বিপ্রতিষেধে পরং কার্য্যম্')। ব্যঙ্গরসিক উদ্ভট কবি শ্লোক রচনা করিলেন:

নিজপতিরাত্মপ্রণয়ী তদন্থ চ হরিঃ কিং করিষ্যতি রাধা।
শৃণু সখি পাণিনি সূত্রং বিপ্রতিষেধে পরং কার্য্যম্॥

---

* The Bible as History (Werner Keller, Dr. William Neil, 1957), P. 325.

অর্থাৎ রাধা প্রথম প্রণয়ী স্বামী আয়ানকে ছাড়িয়া, পাণিনি সূত্রানুসারে, নবীন প্রণয়ী কৃষ্ণকে গ্রহণ করিয়া যেন শাস্ত্রসঙ্গতভাবে সমস্যার সমাধান করিলেন।

একটা প্রশ্ন থাকিয়া যায়: নিজ পতি আয়ান কি কখনও রাধার প্রণয়ী ছিলেন? বৈষ্ণব কাব্যগ্রন্থে গুরুজনদের ধিক্কার, ননদিনীদের গঞ্জনা, সামাজিক অপযশ প্রভৃতির উল্লেখ আছে, কিন্তু কৃষ্ণগতপ্রাণা রাধিকার হৃদয়ে অন্য কোন প্রেমিক কখনও জায়গা পাইয়াছিলেন এমন মনে হয় না। সেইরূপ দ্বিধা বা দ্বন্দ্ব থাকিলে এই বহুকীর্তিত প্রেমকাহিনীর তাৎপর্য ক্ষুণ্ণ হইয়া যাইত। বরং মনে হয় শ্রীরাধার কৃষ্ণানুরক্তিতে আয়ানের মনে কোন চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় নাই। যে কাহিনীকে বৈষ্ণব ধর্মশাস্ত্র এত রহস্যময় করিয়াছে এবং কবিরা যাহাকে এত অপরূপ সৌন্দর্য দান করিয়াছেন, বাস্তববাদী পরশুরাম তাহার সহজ ব্যাখ্যা দিয়া রোমান্সকে লঘু করিয়া ফেলিয়াছেন এবং জটিল ধর্মতত্ত্বকে সরল করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার এই ব্যাখ্যায় দেখা যায় আয়ান ঘোষের পুরুষত্বহীনতাই শ্রীরাধার কূলপ্লাবী প্রেমের ভিত্তি এবং অসমর্থ স্বামীও কৃষ্ণগুণগানের মধ্য দিয়াই ব্যর্থ জীবনকে সফল করিয়াছেন। গল্পের প্রয়োজনে তিনি শিখণ্ডীকে শিখণ্ডিনী-রূপে সৃষ্টি করিয়া পুরুষত্ব দান প্রতিদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং অশ্বত্থামার সাহায্যে সেই প্রক্রিয়ার পরিসমাপ্তি ঘটাইয়াছেন। এই সব গ্রহণ-প্রতিগ্রহণের অনুপ্রবেশে গল্পের কোন উন্নতি হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে, 'অদলবদল' গল্পাকারে লিখিত হইলেও ইহা প্রবন্ধ, কিন্তু ইহা পরশুরামের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝিতে বিশেষ সাহায্য করে এবং সেই কারণেই ইহার বিস্তারিত বিশ্লেষণ দেওয়া হইল।

(৪)

পরশুরামের 'জাবালি'তে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি তীক্ষ্ণতর ও স্পষ্টতর অভিব্যক্তি পাইয়াছে এবং গল্প হিসাবেও ইহা 'অদলবদল' অপেক্ষা অনেক উঁচুদরের। ইহার প্রথমাংশ বাল্মীকির রামায়ণ হইতে গৃহীত। পরশুরাম বাল্মীকির সমপর্যায়ের লেখক না হইলেও এই গল্পে তাঁহার মৌলিকতা প্রকাশ পাইয়াছে। যে সকল লোককে সঙ্গে করিয়া ভরত রামকে অযোধ্যায় ফিরাইয়া আনিতে গিয়াছিলেন তন্মধ্যে একজন ছিলেন দশরথের আশ্রিত ঋষি জাবালি। রাম

যখন অন্য সকলের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিলেন, তখন জাবালি নূতন যুক্তির অবতারণা করিলেন। তিনি বলিলেন যে, রামের পিতৃসত্য রক্ষা করিতে বনবাসে আসা অর্থহীন, কারণ দশরথ তাঁহার পিতা হইলেও, পিতা ও পুত্র বিভিন্ন ব্যক্তি। জৈবিক নিয়মে পিতার ঔরসে মাতার গর্ভে পুত্রের জন্ম হয়। ইহা হইতে পিতৃসত্য রক্ষা করিবার দায় পুত্রের উপর বর্তে না। তারপর দশরথ মৃত। পরলোক বলিয়া কোন কিছু নাই, মানুষ যে প্রেতকার্য করে তাহা শুধু ধূর্ত পুরোহিত সম্প্রদায়ের ছলনার জন্য। জাবালির বক্তব্য :

স নাস্তি পরমিত্যেতং কুরু বুদ্ধিং মহামতে।
প্রত্যক্ষং যৎ তদাতিষ্ঠ পরোক্ষং পৃষ্ঠতঃ কুরু ॥

(হে মহামতি, পরলোক সাধন ধর্ম নামে কোন বস্তু নাই তুমি এইরূপ মত অবলম্বন কর। যাহা প্রত্যক্ষ তাহাতেই তোমার মতি স্থির হউক, পরোক্ষের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর।) বলা বাহুল্য, নাস্তিকের এই যুক্তি রাম গ্রাহ্য করেন নাই। তখন জাবালি তাঁহার পূর্বযুক্তি একেবারে উল্টাইয়া বলিলেন :

'ন নাস্তিকানাং বচনং ব্রবীম্যহং
ন নাস্তিকোঽহং ন চ নাস্তি কিঞ্চন ॥'

(আমি নাস্তিকদের মত কথা বলিতেছি না। আমি নাস্তিক নই, এবং পরলোক প্রভৃতি যে কিছু নাই তাহাও নহে।) তিনি রামকে অযোধ্যায় ফিরাইয়া লইবার জন্য পূর্বোক্ত যুক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন এবং রাম যখন রাজি হইলেন না তখন নিজের কথা প্রত্যাহার করিয়া লইলেন।

পূর্বোক্ত কাহিনীতে দুইটি দার্শনিক মত প্রকট হইয়াছে—একটি প্রত্যক্ষবাদ অর্থাৎ আমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা গ্রহণ করি, বস্তুজগতে বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া যে জ্ঞান লাভ করি অথবা যে ইষ্ট লাভ করি তাহাই সত্য এবং তাহাই সৌন্দর্য ও মঙ্গলের একমাত্র উৎস। আমাদের নীতিবোধ ও ধর্ম ইহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। ধর্মশাস্ত্রে কথিত আছে যে ভগবান মানুষকে নিজের আদলে গড়িয়াছেন ; জনৈক ব্যঙ্গরসিক টিপ্পনী কাটিয়া বলিয়াছেন, মানুষও ঠিক সেইভাবেই তাহার ঋণ শোধ করিয়াছে। অর্থাৎ মানুষ যে দেবতাকে পূজা করে তিনি মানুষেরই ভাবমূর্তি, মানুষেরই মতই তাঁহার দোষগুণ, রিপুপরতন্ত্রতা আছে, নৈসর্গিক নিয়ম তাঁহার উপরেও প্রযোজ্য, শুধু তাঁহার শক্তি

অধিক। মানুষ ও দেবতার পার্থক্য কেবল তারতম্য; কোন মৌলিক প্রভেদ নাই। এইভাবেই পরশুরাম দেবতা, মুনিঋষি, যক্ষ, অপ্সরা প্রভৃতিকে লৌকিক নিয়মের দ্বারা বিচার করিয়া হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়াছেন।

রামায়ণে জাবালির যে দ্বিতীয় উক্তি আছে তাহাকে দার্শনিক কোন নাম দেওয়া সঙ্গত হইবে কিনা সন্দেহ। তাহাকে বলা যায় নিছক সুবিধাবাদ। অযোধ্যায় ফিরিবার পর জাবালি কি করিয়াছিলেন বা করেন নাই তাহা রামায়ণে কথিত হয় নাই। পরশুরাম যে কাহিনী সংযোজন করিয়াছেন তাহার মধ্যে সুবিধাবাদের স্পর্শ নাই। জাবালি ভরত, বশিষ্ঠ, সুমন্ত্র ও অন্যান্য ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদিগের মনোরঞ্জন করিয়া, নূতন পরিস্থিতিতে নিজেকে মানাইয়া লইতে চেষ্টা করিতে পারিতেন। ইহাতে খুব মুশকিল হইত বলিয়া মনে হয় না, কারণ রামের সমক্ষে রাজগুরু বশিষ্ঠ জাবালির নাস্তিকতা সম্পর্কে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহার মধ্যে বিরূপতার পরিচয় নাই। অবশ্য যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে বনে গিয়াছিলেন তাঁহাদের মনোভাব এবং বালখিল্যগণের ব্যবহার অনুরূপ পরিস্থিতির পরিচয় দেয়। কিন্তু তবু মনে হয় পরশুরামের গল্পে জাবালি যে সব কারণে অযোধ্যা ত্যাগ করিলেন তাহা নিছক সুবিধাবাদ নহে। সুবিধাবাদী হইলে তিনি জপতপ ত্রিসন্ধ্যা প্রভৃতি আচার পালন করিয়া অযোধ্যায়ই বাস করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না। নিজে যাহা বিশ্বাস করেন অযোধ্যা হইতে দূরে গেলেই সেই ধর্ম পালন করিতে পারিবেন এই জন্যই তিনি অযোধ্যা ত্যাগ করিলেন। ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে যে, অযোধ্যায় এই ব্রাহ্মণের অনুচর হইল কয়েকজন অন্ত্যজ নিষাদ এবং পরে হিমালয়ের পাদদেশে তিনি যখন আশ্রম স্থাপন করিলেন তখন তাঁহার সঙ্গী ও সেবক হইল পার্বত্য কিরাতগণ। তাঁহার ধর্ম তিনি নিজেই সহজভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন, 'আমি নাস্তিক কি আস্তিক আমি নিজেই জানি না। দেবতাগণকে আমি নিষ্কৃতি দিয়াছি; আমার তুচ্ছ অভাব-অভিযোগ জানাইয়া তাঁহাদিগকে বিব্রত করি না। বিধাতা যে সামান্য বুদ্ধি দিয়াছেন, তাহারই বলে কোন প্রকারে কাজ চালাইয়া লই। আমার মার্গ যত্র তত্র, আমার শাস্ত্র অনিত্য, পৌরুষেয়, পরিবর্তনসহ।'

এই জাতীয় যুক্তিবাদী মানুষ দৈবক্রমে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণরচিত শাস্ত্রে তাঁহার বিশ্বাস নাই; সেই শাস্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁহার প্রধান

আপত্তি ইহার পরিবর্তনবিরোধিতা, কারণ চলমানতা জীবনের ধর্ম। যাঁহার প্রিয়সঙ্গী নিষাদ ও কিরাত, তিনি নিশ্চয়ই চাতুর্বর্ণ্যের মহিমা স্বীকার করিতেন না। দেবতাদের অলৌকিক ক্ষমতা ও মহিমায় তাঁহার বিশ্বাস নাই এবং ইন্দ্রপ্রেরিত চর্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয় আহার্য গ্রহণ করিতে তাঁহার আপত্তি না থাকিলেও ইন্দ্রত্বের প্রতি তাঁহার কোন লোভ নাই। পরশুরামের গল্পে 'মহাভাগ দেবগণ ও অগ্নিকল্প ঋষিগণ' কোথাও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন না। অন্তর্যামী হওয়া দূরে থাকুক, দেবরাজ ইন্দ্র তো জনশ্রুতির ভয়েই চঞ্চল এবং বজ্রধর হইলেও বীররস অপেক্ষা শৃঙ্গাররসের উপরেই তাঁহার সমধিক আস্থা। বশিষ্ঠাদি মুনিগণ যে শাস্ত্রের অনুশাসন মানিয়া চলেন তাহা প্রত্যক্ষের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া এক অলীক পরলোক সৃষ্টি করিয়া যে অচল, অনড় অনুশাসন রচনা করিয়াছে তাহার সঙ্গে যুক্তির কোন সম্পর্ক নাই। এই শাস্ত্র অপরিবর্তনীয়, কিন্তু জীবন পরিবর্তনধর্মী। সুতরাং 'চিরযৌবনা' অপ্সরা গগনকুসুমের মতই কাল্পনিক। এই কথাই ব্যূঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ শালপ্রাংশু মহাভুজ জিতেন্দ্রিয় জাবালি ঘৃতাচীকে বুঝাইয়া দিলেন। বর্ষিয়সী অপ্সরার কৃত্রিম প্রসাধনরচিত ছলাকলার বিশ্লেষণ করিয়া তিনি বলিলেন, 'হে সুন্দরি, কিছু মনে করিও না।······তোমার মুখের লোধ্ররেণু ভেদ করিয়া কিসের রেখা দেখা যাইতেছে? তোমার চোখের কোলে ও কিসের অন্ধকার? তোমার দন্তপঙ্‌ক্তিতে ও কিসের ফাঁক।' অগ্নিকল্প ঋষি, মহর্ষি, দেবর্ষিরা সবাই দ্বিতীয় রিপু এবং তৃতীয় রিপুর প্রেরণায়ই দুঃসহ তপশ্চর্যায় প্রবৃত্ত হয়েন এবং ইঁহাদের অভ্যন্তরস্থ প্রথম রিপুকে জাগ্রত করিয়াই ইন্দ্র তাঁহার ইন্দ্রত্ব বজায় রাখেন। এক বিশ্বামিত্রের 'কীর্তি'কলাপের উল্লেখ করিলেই ইঁহাদের স্বরূপ এবং জিতেন্দ্রিয়, মানবপ্রেমিক জাবালির সঙ্গে ইঁহাদের পার্থক্য সূচিত হইবে। রাজা থাকাকালে ইনি বশিষ্ঠের কামধেনু অপহরণ করিতে যাইয়া অপদস্থ হইয়াছিলেন, তারপর তপস্যা করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন এবং আরও বেশি প্রলুব্ধ হইলে, 'স্বর্গের চক্রান্ত', মহেন্দ্রের দূতী মেনকার অভ্যাগমে তাঁহার পায়ে তপস্যার ফল দক্ষিণ করিলেন। এই তপোভঙ্গের ফলে শকুন্তলার জন্ম, কিন্তু নৃশংস পিতা কন্যার ভার বহন করিতে রাজি না হওয়ায় (পরশুরামের গল্পে) মেনকা তাঁহাকে যোগ্য পুরস্কার দিলেন—কর্দম-মেখলা!

(৫)

প্রত্যক্ষে নিবদ্ধদৃষ্টি, যুক্তিবাদী ব্যঙ্গরসিক হইলেও পরশুরাম ইহাও জানেন যে রজ্জুতে সর্পভ্রম প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতারই ফল এবং যুক্তির দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করা যায় তাহা টর্চের আলোর মত—তীক্ষ্ণ, তীব্র কিন্তু সীমিত। সূর্যের চারদিকে ভ্রাম্যমাণ পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়ায় এই নবপ্রকাশিত মত শুনিয়া (বার্নার্ড শ'য়ের সেণ্ট জোন নাটকে) জনৈক বিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া উঠিয়াছেন, যাহারা এই কথা বলে তাহারা কি চোখের মাথা খাইয়াছে ? বুদ্ধি দিয়া যাহা জানা যায়, যুক্তি দিয়া যাহা প্রমাণ করা যায় তাহার অতীত, অনধিগম্য বৃহত্তর ভাবজগৎ আছে বলিয়াই প্রত্যক্ষ ও বাস্তব জগৎ তাহার যথাযোগ্য মূল্য পায় ; যদি অলৌকিক আদর্শ না থাকিত তাহা হইলে ঐহিক জীবনের বিচার হইত কোন্ নিরিখে ? অলৌকিক জগৎ কবির স্বপ্ন, কিন্তু 'বস্তু হতে সেই মায়া তো সত্যতর'।

এই কথাটাই পরশুরামের দুইটি গল্পে খানিকটা সোজাসুজিভাবে, খানিকটা বক্রোক্তির সাহায্যে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গল্প দুইটি হইল—'সত্যসন্ধ বিনায়ক' ও 'মহেশের মহাযাত্রা'। এই দুইটি গল্পে উক্তি ও বক্রোক্তির তীক্ষ্ণতা থাকিলেও ব্যঞ্জনার ঐশ্বর্য নাই। কাজেই গল্প হিসাবে ইহারা উঁচু দরের নহে, কিন্তু ইহাদের পটভূমিকায় পরশুরামের হাস্যরসের আর একটা দিক সহজে উপলব্ধি করা যায়। সত্যসন্ধ বিনায়ক সবরকম দলে যোগ দিয়াছিল, কিন্তু সর্বত্রই মিথ্যা ও ভেজাল দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। শেষকালে নিজেই এক দল গড়িল, কিন্তু ক্রমশঃ তাহা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইল এবং প্রায় অনাহারে তাহার মৃত্যু হইল। তথাপি পার্থিব জগতে অপ্রাপণীয় সত্যের সন্ধানী বিনায়ক নিজেই বলিয়াছে, 'দেখুন মশাই, সব কাজ সকলের জন্য নয়ত, আমি নিজের পথ বেছে নিয়েছি, না হয় একলাই চলব। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যারা প্রথমে দাঁড়িয়েছিল তারা কজন ছিল ?···তারা প্রাণ দিয়েছে, আবার অন্য লোক তাদের স্থান নিয়েছে।' এই উক্তি জাবালির মুখে মানাইত না, কিন্তু ইহারা উভয়েই নিজ নিজ পথে সত্যের সন্ধানী—সত্য অর্থাৎ যাহা অপার্থিব কিন্তু পৌরুষেয়, চিরচঞ্চল অথচ ধ্রুব।

শিবচন্দ্র কলেজের অঙ্কের প্রফেসর মহেশ মিত্তির ভগবান্, পরলোক, ভূত কিছুই মানিতেন না। এই উগ্র নাস্তিক স্ত্রীবিয়োগের পর বিবাহ পর্যন্ত করেন

নাই এবং ভূতের অনস্তিত্ব সম্পর্কে প্রবন্ধলেখককে বাৎসরিক পুরস্কার দেওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে তাঁহার সঞ্চিত দশ হাজার টাকা উইল করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার বন্ধু ফিলসফির প্রফেসর হরিনাথ কুণ্ডুর সঙ্গে এই বিষয় লইয়া তর্কাতর্কি হাতাহাতি পর্যন্ত পহুঁছিয়াছিল। সকলের উপেক্ষা সত্ত্বেও মহেশ মিত্তির নাস্তিকতায় অটল রহিলেন এবং সেই অবিশ্বাস লইয়াই মারা গেলেন। মৃত্যুর পর কিন্তু বিচিত্র ভূতুড়ে কাণ্ড ঘটিতে লাগিল; সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে গভীর রাত্রিতে শবানুসরণকারী হরিনাথ যেন দেখিতে পাইলেন শব খাটিয়ার উপর উঠিয়া বসিয়াছে এবং হরিনাথের কানে ধ্বনিত হইতে লাগিল, 'ও হরিনাথ—আছে, আছে, সব আছে, সব সত্যি।' জীবিত মহেশ যাহা মানেন নাই মৃত মহেশ তাহা ঘোষণা করিয়া গেলেন।

মরমী কবি রবীন্দ্রনাথ এই সত্যই অনবদ্য ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন এই-ভাবে :

চোখের আলোয় দেখেছিলেম
চোখের বাহিরে
অন্তরে আজ দেখব যখন
আলোক নাহিরে।

পরশুরামের ভূতুড়ে গল্প ও রবীন্দ্রনাথের মিষ্টিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়া একই সত্য প্রকাশিত হইয়াছে।

পরশুরামের উভয়মুখীনতা অন্যভাবে প্রকাশিত হইয়াছে একই গোষ্ঠীর চিত্রণে—'জাবালি' ও 'বালখিল্যগেণের উৎপত্তি' গল্পদ্বয়ে। বালখিল্যগণ অপোগণ্ড, অকালপক্ক, তাই তাহারা বিদ্রোহী আবার রক্ষণশীলও। তাহারা বিদ্রোহের শ্লোগান বা আওয়াজ তুলিতে তুলিতে অকালে মাতৃগর্ভ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিল এবং লম্ববান বাদুড়ের স্তন্যে পুষ্ট হইয়াছিল। বিদ্রোহী ঊর্ধ্বপাদ, অধঃশিরা ত্রিশঙ্কু তাহাদের আদর্শ এবং ত্রিশঙ্কুর যাজক বিশ্বামিত্র তাহাদের পৃষ্ঠপোষক। আবার দেখা গেল বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রাদির দ্বারা দীক্ষিত ও শিক্ষিত রামচন্দ্রকে যখন জাবালি অপৌরুষেয় নিত্য ধর্মের অসারতা বুঝাইলেন, তখন যুক্তিবাদী বিধর্মী জাবালিকে শায়েস্তা করিতে এই বালখিল্য ঋষিরাই অগ্রসর হইয়া আসিলেন। তাঁহাদের হঠকারিতা তাঁহাদের নিজস্ব

গুণ, কিন্তু তাঁহারা যে ধর্মের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা চিরাচরিত সনাতন ধর্ম। দুইটি আখ্যানই ব্যঙ্গবিদ্রূপে পরিপূর্ণ কিন্তু ইহাদের মধ্যে যে বিরোধিতা রহিয়াছে তাহা পরশুরামের রচনার বৈচিত্র্য এবং তাহার মধ্যে পরস্পরবিরোধী ভাবের সমন্বয়ের সাক্ষ্য দেয়। এই সমন্বয়ের ভিত্তি পরিমিতিবোধ, কাণ্ডজ্ঞান ও বাস্তবমুখিনতা।

ব্যঙ্গবিদ্রূপ

(১)

জমদগ্নিপুত্র মহাক্রোধী পরশুরাম তাঁহার প্রধান অস্ত্র কুঠারের দ্বারা একুশ বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন। তিনি ভগবানের ষষ্ঠ অবতার ; তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল দুষ্কৃতকারীদের বিনাশসাধন এবং তদ্দ্বারা সাধুসমাজ স্থাপন করা। আধুনিক মানুষ বিজ্ঞানের সাহায্যে যে সব মারণাস্ত্র আবিষ্কার করিয়াছে তাহা পরশুরামের কুঠার, অর্জুনের পাশুপাত বা কর্ণের একাঘ্নী অপেক্ষা ভীষণতর।

কিন্তু আধুনিক মানুষ আর একটি অস্ত্রের সমধিক প্রয়োগ করে যাহা ধ্বংস না করিয়া সমাজকে রক্ষা করে, ইহা অম্লমধুর ও তিক্তকষায় ; ইহার নাম বিদ্রূপ, ব্যঙ্গ, ঠাট্টা-তামাসা, এক কথায় হাস্যরস। প্রাচীনকালে লোক হাসিতে জানিত না এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যে হাস্যরসের আপেক্ষিক অপ্রতুলতা দেখা যায়। মহাভারতে সকল রসের এত প্রাচুর্য দেখা যায় যে এই সর্বব্যাপী মহাকাব্যের অঙ্গীরস কি তাহা লইয়া বিতর্কের অবকাশ আছে ; বোধহয় ইহার সারকথা বুঝাইবার জন্যই শান্তরসের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। কিন্তু এই বিরাট গ্রন্থে কঠোর বিদ্রূপের সাক্ষাৎ পাইলেও বিমল হাস্যরসের সন্ধান কমই মিলে। কৃত্তিবাসের অনুবাদে বাল্মীকির রামায়ণের মহিমা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, কিন্তু অঙ্গদ রায়বারের কল্পনা আদিকবি করেন নাই। ইউরোপীয় সাহিত্যেও দেখিতে পাই, হোমারের ঈলিয়াড ও ওডেসী এখনও শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। কিন্তু তিনি নাকি Margites নামে একখানা কমিক মহাকাব্যও লিখিয়াছিলেন ; তাহা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইহা হোমারই লিখিয়াছিলেন কি না তাহাই নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। অনুমান করি ইহার গুণগত মূল্য ঈলিয়াড ও ওডেসী অপেক্ষা অনেক কম ছিল এবং সেই জন্যই ইহা টিকিয়া থাকে নাই। সমালোচকচূড়ামণি অ্যারিস্টটলও বলিয়াছেন যে কমেডির উদ্ভব হইয়াছে মহাকাব্য ও ট্র্যাজেডির অনেক পরে। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে হাস্যরসের পরিচয় খুব বেশি পাওয়া যায় না। নিরামিষাশী ব্রহ্মচারী বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের কপটতা লইয়া যে কৌতুক বা বিদ্রূপ করা হইত তাহার স্ফুলিঙ্গ এখানে-ওখানে পাওয়া যায়। একটি বাক্‌কেলিতে

বৌদ্ধ ভিক্ষুকে মাংস খাইতে আহ্বান করা হইলে তিনি উত্তর দিলেন, মদ্য সঙ্গে না থাকিলে তিনি মাংসের আস্বাদ উপভোগ করেন না। মদ্য তাঁহার প্রিয় পানীয় এইরূপ মন্তব্যের উত্তরে তিনি বলিলেন, বারাঙ্গনাদের সাহচর্যে তিনি মদ্য সেবন করিতে ভালবাসেন ইত্যাদি ইত্যাদি।* কিন্তু এই সকল উদ্ভট শ্লোক বিচ্ছিন্ন টুকরা মাত্র। প্রাচীন সংস্কৃত নাটকেও যে হাস্যরসের সন্ধান পাই তাহা খুব উচ্চাঙ্গের নয়। গ্যেটে অভিজ্ঞানশকুন্তলের মধ্যে পরিপূর্ণতার আস্বাদ পাইয়াছিলেন, কিন্তু এই সুমধুর নাট্যকাব্যের প্রধান অপূর্ণতা হাস্যরসের অপ্রতুলতা। কালিদাসের বয়স্য শেক্সপীয়রের বিদূষকের তুলনায় নিষ্প্রভ।

কালিদাস ছিলেন নিখুঁত সৌন্দর্যের কবি। তাঁহার কাছে হাসির আদর্শ মহাদেবের অট্টহাস্য যাহার সঙ্গে তুলিত হইতে পারে শুভ্র কুমুদকুসুমরাশি বা তুষারমৌলি হিমগিরি (শৃঙ্গোচ্ছ্রায়ৈঃ কুমুদবিশদৈর্যো বিতত্য স্থিতঃ কং রাশীভূতঃ প্রতিদিনমিব ত্র্যম্বকস্যাট্টহাসঃ—পূর্বমেঘ, ৫৮)। কিন্তু কমেডির হাসির প্রধান বিষয় অতিরেক, অপূর্ণতা, নির্বুদ্ধিতা, কপটতা, ছলনা, বাতিকগ্রস্ততা। কমেডির হাসি এই সব অসুন্দর বস্তুকে সুন্দর করে। সেই সৌন্দর্য প্রকাশের সৌন্দর্য, যেমন শোক, ভয় এবং জুগুপ্সা রসরূপের মধ্য দিয়া সুন্দর হইয়া উঠে। পূর্বেই বলা হইয়াছে কমেডি অনেকাংশে আধুনিক কালের সৃষ্টি। ব্যক্তির উৎকেন্দ্রিকতাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া মানুষ সমাজ গড়িয়া তুলিয়াছে। এই সমাজ-ব্যবস্থার প্রধান লক্ষণ স্থিতিস্থাপকতা। কাজেই যখনই কোন ব্যক্তি বা কোন গোষ্ঠী নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে চায়, তখনই আধুনিক যুগের পরশুরামরা পরিহাসরূপ কুঠারের দ্বারা আঘাত করিয়া তাহাদিগকে শায়েস্তা করিয়া সামাজিক রীতিনীতিকে অটুট রাখিতে চেষ্টা করে। কমেডির অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা ইংরেজ কবি-ঔপন্যাসিক মেরিডিথ কমেডির এই লক্ষণের বিশদ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তাঁহার বিশ্লেষণে কিছু কিছু শ্রেষ্ঠ কমেডি বাদ পড়িয়াছে; তাহা হইলেও বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতার জন্য এই ব্যাখ্যা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন কমেডির দৃষ্টি বর্তমানের উপর নিবদ্ধ, এখানে মানুষ সহজ, সুষম, সদাচারী হইবে; যখনই সে পরিমাণবোধ হারাইবে, আতিশয্যে স্ফীত হইবে অথবা কৃত্রিমতা অবলম্বন করিবে বা যাহা সে নয় তাহার ভান করিবে, বহ্বাড়ম্বর করিবে বা শঠতা ও কপটতার আশ্রয় লইবে, পাণ্ডিত্য জাহির করিবে কিংবা

সুরুচির খেয়ালিপনায় আসক্ত হইবে; যখনই সে প্রবঞ্চিত বা আত্ম-প্রবঞ্চিত হইবে, যখন তুচ্ছ বস্তুর অর্চনায় লিপ্ত হইবে বা অহমিকায় আচ্ছন্ন হইবে, কিংবা আজগুবি কিছু করিয়া বসিবে, যখন সে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া কাজে লিপ্ত হইবে বা বিকৃত মস্তিষ্কের পরিকল্পনায় বা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইবে, যখন তাহার কথা ও কাজে ঐক্য থাকিবে না, যখন সে সমাজের অলিখিত বন্ধন ভাঙ্গিবে, যখন স্থিরবুদ্ধির বিপরীত আচরণ করিবে বা ন্যায়ের পথ পরিত্যাগ করিবে, যখন ব্যক্তিগত জীবনে অথবা গোষ্ঠীগতভাবে সে মিথ্যা বিনয় দেখাইবে বা আত্মম্ভরিতায় ভরপুর হইবে, তখনই সে ব্যঙ্গকৌতুকের শিকার হইবে।

(২)

পরশুরাম প্রথমে 'গড্ডলিকা' ও 'কজ্জলী' এই দুইখানি গ্রন্থ লইয়া পা·ক সমাজের কাছে উপস্থিত হয়েন এবং অতি অল্পকালের মধ্যেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। লিমিটেড কোম্পানীর শেয়ার বেচাকেনা লইয়া আধুনিক কালে যে জুয়াচুরির কারবার চলিয়াছে, 'গড্ডলিকা'র প্রথম গল্প শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড-এ তাহার উপর তীব্র কশাঘাত করা হইয়াছে আর ইহার সঙ্গে জড়িত হইয়া আছে ধর্মের নামে ভণ্ডামি যাহা আবহমান কাল হইতে ব্যঙ্গসাহিত্যের খোরাক হইয়াছে। এই গল্পটির অনেক আকর্ষণীয় দিক আছে। প্রথমেই বলা যাইতে পারে ইহার সুনিপুণ গঠনকৌশলের কথা। ইহার নায়ক শ্রীশ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী, তান্ত্রিক সাধু, যিনি শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং মানিকজোড় পূর্ণ করিতে আসিয়াছেন গণ্ডেরিরাম বাটপাড়িয়া যিনি এই কোম্পানীর শেয়ার বাজারে ছাড়িবেন এবং ইহাদের হাতে পড়িয়াছেন প্রবীণ বিচক্ষণ অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রায় সাহেব তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় যাঁহার উপরে ডুবিয়া যাওয়া কোম্পানীর ভার দিয়া শ্যামবাবু ও গণ্ডেরিবাবু গা-ঢাকা দিবেন।

এই গল্পটি প্রকাশিত হইয়াছিল ১৯২২ সালে—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর—যখন কলিকাতার শেয়ার বাজার খুব জমজমাট এবং ভারতে ব্রিটিশ সূর্যের অস্তগমনের লক্ষণ দেখা যায় নাই। শেয়ার বাজার ইংরেজেরই সৃষ্টি। ইহা ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল; আবার ভোজবাজিও বটে, কারণ ব্যবসায়ের সঙ্গে ইহার কোন

প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নাই। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে কলিকাতা নগরীর পত্তন হয় এবং পলাশীর যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অল্পদিন পরই শেয়ার বাজার গড়িয়া উঠে। স্বয়ং রামমোহন রায় শেয়ার বাজারে কেনাবেচা করিয়া বেশ অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন। আজকাল ব্যবসায়ের রাষ্ট্রীয়করণের ফলে এবং অন্যান্য ভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রণবৃদ্ধির জন্য শেয়ার বাজার স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে এবং যে শাসনব্যবস্থায় ইংরেজ বুরোক্র্যাটের পদলেহী খেতাবধারী জবরদস্ত তিনকড়ি হাকিম শোভা পাইতেন তাহাও বিস্মৃতির গর্ভে লীন হইয়া গিয়াছে। তবু শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড গল্পের মাধুর্য ম্লান হয় নাই।

অর্থলোভ ত্যাগ করিয়াই মানুষ ধর্মাচরণ করিতে পারে। তাহা সত্ত্বেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, ধর্মকে অর্থোপার্জনের উপায় হিসাবে ব্যবহার করা হয়; মন্দিরের মধ্যে money-changer বা টাকার লেনদেনকারীদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় এবং মানুষের অন্ধ বিশ্বাসকে ভিত্তি করিয়াই পীঠস্থানগুলি ফাঁপিয়া উঠে। এই বৈপরীত্য ও সাহচর্যকে অবলম্বন করিয়া পরশুরাম এক পরমাশ্চর্য পরিকল্পনা করিয়াছেন। তিনি পল্লীর পীঠস্থানকেই কলিকাতার শেয়ার বাজারে আনিয়া ফেলিয়াছেন, যদিও যাঁহারা এই পীঠস্থানের মুনাফা লুটিবেন তাঁহাদের সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্কই থাকিবে না। এই অশ্রুতপূর্ব যৌথ কারবারের উদ্ভট বিজ্ঞাপন বা 'অনুষ্ঠান' পত্রেই এই কোম্পানীর অভিনবত্ব পরিস্ফুট হইয়াছে: সেবার ফুল হইতে সুগন্ধি তৈল হইবে এবং প্রসাদী বিল্বপত্র মাদুলীতে ভরিয়া বিক্রীত হইবে। ইত্যাদি ইত্যাদি। ঝানু ব্যবসায়ী গণ্ডেরিরাম বাটপাড়িয়া ঠিকই মন্তব্য করিয়াছেন, 'হদ্দ্ কিয়া শ্যামবাবু।' কিন্তু গণ্ডেরিরাম নিজেই ইহার বড় অংশীদার হইলেন। তিনি শেয়ার বাজারের পাণ্ডা; তিনি ভাল করিয়াই জানেন এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষণই এই যে, যাঁহারা কোম্পানীর মালিকানা লইয়া ছিনিমিনি খেলিতেছেন তাঁহাদের সঙ্গে কোম্পানীর ক্রিয়া-কলাপের কোন সংস্রব নাই। অনেক বড় ব্যবসায়ই এই অবস্থায় পঁহুছায়। অন্য প্রসঙ্গে গণ্ডেরিরাম বলিয়াছেন, তিনি ভেজাল ঘির ব্যবসায় হইতে প্রচুর অর্থ রোজগার করেন; কিন্তু তিনি থাকেন কলিকাতায় আর ভেজাল ঘি তৈরী হয় হাতরসে। নিজে ঐ ভেজাল বস্তু প্রস্তুত করা দূরে থাকুক, তিনি কোন দিন ইহা চোখ দিয়া দেখেন নাই বা নাক দিয়া গন্ধও গ্রহণ করেন নাই। তিনি

শুধু টাকা বিনিয়োগ করিয়াছেন এবং লভ্যাংশ গ্রহণ করিয়াছেন। আর টাকা তিনি না দিলে অপর কোন মহাজন যোগাইত। Mrs. Warren's Profession নাটকে Sir George Crofts বেশ্যাবৃত্তিতে অর্থবিনিয়োগের সপক্ষে অনুরূপ যুক্তি দিয়াছেন।

কমেডির উৎস হইল অসঙ্গতি, আর শিল্পকলার প্রধান লক্ষণ সুসঙ্গতি। এমন দিন ছিল যখন লিমিটেড কোম্পানীর অস্তিত্বই কেহ কল্পনা করে নাই আবার হয়ত এমন দিন আসিবে যখন লিমিটেড কোম্পানীর কথা লোকে ভুলিয়া যাইবে। কিন্তু প্রবঞ্চনা, চাতুরি, অন্ধবিশ্বাস লুপ্ত হইবে না এবং মানুষের বুদ্ধি নিত্য নূতন ফন্দী আঁটিবে। অসঙ্গতির মধ্যে সঙ্গতি বাহির করা, উদ্ভটকে বিশ্বাসযোগ্য করিয়া তোলা, সম্ভাব্য ও অসম্ভাব্যের সম্মিলন করা কমিক শিল্পের কৃতিত্ব। এই গল্পের স্রষ্টা সেই কৃতিত্ব দাবী করিতে পারেন। স্মরণাতীত কাল হইতে সর্বদেশে ধর্মকে ব্যবসায়ে পরিণত করা হইয়াছে; তবে সর্বত্রই ধর্ম সামনে রহিয়াছে, ব্যবসায়বুদ্ধি ধর্মের আড়াল হইতে ক্রিয়াশীল থাকে। বলিষ্ঠ কল্পনাশক্তি প্রয়োগের ফলে শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড গল্পে ব্যবসায়বুদ্ধি সোজাসুজিভাবে সম্মুখে আসিয়া আপনার প্রাধান্য ঘোষণা করিয়াছে—স্বপ্নাদেশ, একান্নপীঠ এক ঠাঁই এই সবই ব্যবসায়ের অঙ্গীভূত হইয়াছে; এমন কি মন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্বেই কোম্পানী বিশ হাত জলের নীচে চলিয়া গিয়াছে। এখানেই প্রতিভাবান জুয়াচোর শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারীর মৌলিকতা।

তাঁহার দ্বিতীয় কৃতিত্ব গণ্ডেরিরামকে সংগ্রহ করা। অ্যাটর্নি অটল বলিয়াছে, 'আমাদের শ্যাম-দা ও গণ্ডেরি-দা যেন মানিকজোড়।' কথাটা ঠিক, উভয়েই বাটপাড় এবং উভয়েই ধর্মধ্বজী। কিন্তু উভয়ের চরিত্রের পার্থক্যও খুব লক্ষণীয় এবং এই পার্থক্যের জন্যই গল্প এত সজীব হইয়াছে। ব্রহ্মচারী যত অসৎই হউন, ভীরু বাঙালী; তাই তাঁহার শঠতার পরিকল্পনাও সীমিত। তিনি অনেক মুসাবিদা করিয়া স্বপ্নাদেশ প্রভৃতির গুডউইল হিসাবে পনের হাজার টাকা দাবী করিয়াছেন এবং ম্যানেজিং এজেন্সির কমিশন হিসাবে এক হাজার টাকার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু দুঃসাহসিক ব্যবসায়ী গণ্ডেরিরাম আসরে অবতীর্ণ হওয়া মাত্র নিমেষ মধ্যে সমস্ত ব্যাপারটা জমকালো হইয়া উঠিল, আকাশে যেন তড়িৎপ্রবাহ খেলিয়া গেল এবং দুই-চার হাজার হইতে আমরা এক লাফে দুই-চার লাখের জগতে উন্নীত হইলাম। কাহারও এক পয়সা খরচ হইল না

কিন্তু আড়াই লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রী হইয়া গেল। স্বয়ং শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী এই বিরাট ধাপ্পাবাজির জন্য প্রস্তুত ছিলেন না এবং গণ্ডেরিরামের প্রস্তাব শুনিয়া ভড়কাইয়া গিয়াছিলেন।

গণ্ডেরিরাম শুধু যে ব্যবসায়ে সূক্ষ্ম হিসাব এবং বেপরোয়া অভিযানের সমন্বয় করিতে পারেন তাহাই নহে, তাঁহার ধর্মাচরণেও বৈশিষ্ট্য আছে এবং সেইখানেও ব্রহ্মচারী হইতে তাঁহার পার্থক্য সহজেই দীপ্যমান হইয়া উঠে। ব্রহ্মচারী জানেন তাঁহার ধর্মচারণ একটা মুখোশ মাত্র ; আত্মবিশ্বাস বা আত্মপ্রবঞ্চনার স্বল্পতার জন্য এইখানেও তিনি ধীরে ধীরে কুণ্ঠার সহিত অগ্রসর হয়েন। তিনি তামার ছোট কুপি হইতে গঙ্গাজল ছিটাইয়া, অটোম্যাটিক দুর্গাগ্রাফ রবারস্ট্যাম্পের সাহায্যে সংক্ষেপে ১০৮ বার দুর্গানাম লিখিয়া এবং শ্রীক্ষেত্রে যাইয়া অকিঞ্চিৎকর কামরাঙা ফল জগন্নাথ প্রভুকে দান করিয়া পুণ্যের বোঝাকে লঘু করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার সমস্ত কাজের মধ্যে অবিশ্বাসদিগ্ধ ভীরুতার পরিচয় পাওয়া যায় এবং বোধ হয় এই জন্যই তিনি বহু ব্যবসায়ে হাত দিলেও গণ্ডেরিরামের সাহচর্য পাওয়ার পূর্বে সমস্ত জায়গায়ই লোকসান দিয়াছেন। তাঁহার না আছে গণ্ডেরির মত স্বচ্ছ দৃষ্টি, না আছে মনের সাহস।

এই পার্থক্য ইঁহাদের ধর্মবোধেও প্রতিফলিত হইয়াছে। ইঁহারা উভয়েই আচারনিষ্ঠ এবং উভয়েই বিবেকহীন। কিন্তু গণ্ডেরির বিশ্বাসে কোন খুঁত নাই। তিনি কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করেন যে আচারই ধর্ম এবং এই দৃঢ় বিশ্বাসই তাঁহাকে বিনা দ্বিধায় অপকর্মে উৎসাহ ও শক্তি যোগাইয়াছে। তিনি নীতি ও অনুষ্ঠানের মধ্যে কোন সম্পর্ক স্বীকার করেন না। একাদশী, রামনবমী, শিব-রাত্রি প্রভৃতিতে উপবাস করেন ও অন্যান্য আচার পালন করেন এবং জীবহত্যা হইলে তিনি কখনই ঘনিষ্ঠভাবে শ্যামবাবুর কোম্পানীর সঙ্গে সংযুক্ত থাকিবেন না। অন্যান্য ব্যবসায়েও যদি অপকর্ম করা হয় তাহার সঙ্গে তাঁহার কোন প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ নাই ; সুতরাং তাহার পাপও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। আর পুণ্য সঞ্চয়ের কথা সকল শাস্ত্রকারেরাই বলিয়াছেন ; যদি তাই হয়, তবে যাহা সঞ্চয় করা যায় তাহার জোরে কিঞ্চিৎ অপচয়ও করা যায়। জমাখরচের অমোঘ নিয়ম সর্বব্যাপী। সুতরাং পুণ্যের জোরে পাপক্ষয় স্বীকার করিয়া লইলে এখানেও ডেবিট-ক্রেডিট, লাভ-লোকসানের পার্সেনটেজ না থাকিবার কোন কারণ নাই। ইহজগতে পুণ্য করিলে মৃত্যুর পর তাহার সুফল

লাভ হইবে—এই হিসাবনিকাশের কথা তো সকল ধর্মেই কথিত হইয়াছে। গণ্ডেরিরাম এই সর্বধর্মস্বীকৃত নীতিকেই সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিয়াছেন এবং সকল ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করিয়াছেন।

এই দ্বিধাহীন ধর্মবিশ্বাসই এই বাটপাড়কে অদম্য উৎসাহ দিয়াছে, তাঁহাকে প্রাণরসে উচ্ছল করিয়াছে। তাঁহার দৃষ্টি বহুমুখী। তিনি বহুশ্রুত; কবীরের বচন ও রবীন্দ্রনাথের কাব্য তাঁহার জিহ্বাগ্রে এবং তিনি তীর্থ দর্শন করেন, ধর্মশালা নির্মাণে অপরকে উৎসাহিত করেন ও সাহায্য করেন, কিছু কিছু দান-খয়রাতও করেন। তাঁহার উচ্ছল প্রাণশক্তি—এবং লাভের আকাঙ্ক্ষা—তাঁহাকে ঘোড়দৌড় মাঠেও আকৃষ্ট করিয়াছে; শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে ব্যবসায়ের ব্যবস্থা করিয়াই তিনি রেস খেলিতে চলিয়া যান, হয়ত তাহার পরই কোন ধর্মসভায় যাইয়া হাজির হইবেন। তাঁহার জীবনের সবগুলি প্রকোষ্ঠই স্বয়ংসম্পূর্ণ, আবার প্রত্যেকটিই অপরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই বৈচিত্র্য ও ঐক্যের মূলে রহিয়াছে তাঁহার জীবনবেদ।—পুণ্যসঞ্চয় ও ধনলাভ পরস্পরের পরিপূরক। রবীন্দ্রনাথের স্মরণীয় বাণী—বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়—এই জুয়াচোরের জীবনে ও কর্মে অপরূপ রূপ পাইয়াছে।

স্বপ্নাদেশ ও ধর্মমন্দিরকে সোজাসুজিভাবে শেয়ার বাজারে আনিয়া দেওয়ার পরিকল্পনা শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারীর, কিন্তু তাহাকে সার্থক করিবার কৃতিত্ব গণ্ডেরিরামের। শেয়ার বাজার এমন একটি জায়গা যেখানে বহু লোক প্রবঞ্চিত হয়; আর অল্প দুই-চারজন লোক লাভবান হয়। শেষোক্তদের মধ্যে সবাই যে ঠগ জুয়াচোর তাহা নহে; তবে ধূর্ত জুয়াচোরদের পক্ষে ইহা উত্তম লীলাভূমি, কারণ এখানে সবই প্রকাশ্যে আইনানুগভাবে করা হইতেছে অথচ যাহারা সর্বস্বান্ত হইতেছে এবং যাহারা এই নাটের গুরু তাহাদের সঙ্গে পরিচয়ই হয় না, আবার ঘটনাচক্রে দুই-একটি পতঙ্গবদ্ বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ বেয়াকুব একেবারে কাছে আসিয়াও পড়ে। সেইরকম চরিত্র রায়সাহেব তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। ইঁহার মেজাজ হাকিমী, কিন্তু নজর খুব নীচু। এই চরিত্রমাহাত্ম্যের জন্যই ইনি অতি সহজেই আরশোলার মত দুই কাঁচ পোকার শিকার হইয়াছেন। তিনকড়ির চরিত্রচিত্রণে পরশুরামের রচনার একটি গুণ প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে —ইহা তাঁহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনানৈপুণ্য। অবসর গ্রহণ করিলেও তাঁহার খেতাবের আকাঙ্ক্ষা লুপ্ত হয় নাই আর ইংরেজ সাম্রাজ্যের জবরদস্ত হাকিম

হইলেও প্রাচীন মন্ত্রতন্ত্রে তাঁহার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে অবশ্য যদি স্বল্পব্যয়ে কাজ সমাধা করা যায়। অল্প টাকা বিনিয়োগ করিয়া তিনি ঘন ঘন মিটিং ডাকিয়া ডিরেক্টরের ফি বাবদ কিছু অর্থ পকেটস্থ করিতে চাহেন এবং সেই সূত্রে তিনি ঘাড়ের বোঝা শ্যালীপোকে কোম্পানীর উপর চাপাইবার প্রস্তাব করিলেন, এমন কি তাঁহার বাড়ির একটি পুরানো কাঁসার ঘণ্টা বিক্রয় করিয়াও কিছু অর্থ উপার্জন করিতে ব্যগ্র হইলেন। অর্থগৃধ্নুতায় তাঁহার বুদ্ধি ও বিবেচনা এত আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে যে যখন গণ্ডেরি তাঁহাকে বুঝাইয়াছেন যে কোম্পানী বিশ হাত পানির নীচে ডুবিয়াছে, তখনও তিনি মাসিক এক হাজার টাকার টোপ গিলিয়া শ্যামবাবুর ১৬০০ শেয়ারের পিছনে আশি টাকা ঢালিয়া আরও ৩২০০ টাকার দায় ঘাড়ে নিলেন। ছোটখাটো নীচতার এই সকল পুঞ্জীভূত দৃষ্টান্তের জন্যই এই অতি তুচ্ছ ঘৃণ্য লোকটি স্মরণীয় হইয়াছেন। বকরূপী ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, অনন্ত কি? তদুত্তরে যুধিষ্ঠির উত্তর দিয়াছিলেন, 'পুরুষের লোভ'। তিনকড়ি জাতীয় চরিত্র যুধিষ্ঠিরের ভূয়োদর্শনের পরিচয় দেয়।

(৩)

ধর্মের নামে যে জুয়াচুরি ও ধাপ্পাবাজি চলে 'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পে পরশুরাম তাহার অন্য এক চিত্র আঁকিয়াছেন এবং ইহাও খুব প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। প্রথমেই বলা দরকার যে, জনপ্রিয় হইলেও শিল্পকলার দিক দিয়া ইহা 'শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড্'-এর তুলনায় অনেকটা হাল্কা রকমের। লৌকিক জগতে আমরা অলৌকিকের প্রত্যাশা করি এবং সেই প্রত্যাশাই সকল গুরুবাদের ভিত্তি। যে ভগবান্ নিরাকার বা ত্রিদিববাসী তাঁহার অস্তিত্ব মানিয়া লইলেও সেই বিশ্বাসেই মন ভরে না। আমরা লৌকিক জীবনে এমন লোকের সংস্পর্শে আসিতে চাই যাঁহাদের অলৌকিক দৈবশক্তি আছে, যাঁহারা অঘটন ঘটাইতে পারেন। সাধারণ জীবনে যাঁহারা এই ক্ষমতার পরিচয় দেন তাঁহাদিগকে আমরা বলি জাদুকর বা ম্যাজিসিয়ান। ইঁহারা দৈবশক্তি দাবী করেন না, কিন্তু যাহা অসম্ভব বলিয়া মনে করা হয় তাহাকে সম্ভব করেন। এই বিদ্যার সঙ্গে যদি ধর্মীয় বা দৈবশক্তির দাবী যোগ করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলেই অনেক ভণ্ডামি ও ধাপ্পাবাজির ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। দুই-চারজন ধর্মপরায়ণ

তপঃসিদ্ধ লোক সর্বকালে সর্বধর্মাবলম্বীদের মধ্যে পাওয়া যায় এবং হয়ত ঐহিক বিষয়ে অনাসক্তির জন্য এবং একাগ্রভাবে তপশ্চর্যা করার জন্য তাঁহারা সাধারণ সংসারী মানুষ অপেক্ষা কোন কোন বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টির পরিচয় দিতে পারেন। এই সব মহৎ লোকের ব্যক্তিত্বের মধ্যে এমন একটা ইন্দ্রজাল থাকে যাহা অলৌকিক ঐশী শক্তি বলিয়া মনে হয় এবং এই শক্তিই সাধারণ লোককে আকর্ষণ করে।

সাধারণ মানুষ অসাধারণ উপায়ে সাংসারিক সমস্যার সমাধান করিতে ইচ্ছা করে এবং তাহাদের বিশ্বাসপ্রবণতাকে মূলধন করিয়াই বহু ভণ্ড তপস্বী, মেকী সন্ন্যাসী, ধাপ্পাবাজ বাবাজী সর্বদেশে ও সর্বকালে পশার জমায়। তবে ইহাও দেখা যায় যে অনেকের বুজরুকিই বেশি দিন টিকে না এবং কেহ কেহ সহজেই ধরা পড়ে। শেষোক্তদের দলে পড়েন পরশুরামের 'কজ্জলী' গ্রন্থের বিরিঞ্চি-বাবা। এই গ্রন্থের প্রধান ত্রুটি ইহাই। এই সব সাধুবাবাদের খানিকটা সম্মোহিনী শক্তি আছে এবং খানিকটা ছলাকলা জানা থাকে এবং সেই জন্যই ইহারা সহজে ধরা দেয় না। কিন্তু আলোচ্য গল্পে সেই সম্মোহিনী শক্তির পরিচয় নাই। বিরিঞ্চিবাবা আসরে আসার আগেই তাঁহাকে জব্দ করার ব্যবস্থা পাকা করা হইয়াছে। দেখা গেল যে, নিবারণ ও সত্য গণেশমামাকে বেশ জানে এবং ছোট মহারাজ কেবলানন্দের নাম শুনিয়াই ইহারা এই ভেল্কিবাজির রহস্য আন্দাজ করিতে পারিয়াছে।

ভণ্ডামি সমস্ত দেশের ও কালের সাহিত্যেই বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গের বিষয়বস্তু হইয়া হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়াছে। আমাদের দেশের সিংহচর্মাবৃত গর্দভের অথবা নীলবর্ণ শৃগালের কথা ইহার অন্যতম নিদর্শন। ইউরোপীয় কমিক সাহিত্য সমধিক সমৃদ্ধ; সেখানে প্রাচীন কাল হইতে এক শ্রেণীর চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় যাহাদিগকে এক কথায় বলা যাইতে পারে অনধিকারী। যাহার যে বিদ্যা নাই তাহা যে জাহির করে অথবা যাহার যে জিনিসে অধিকার নাই তাহা যে দাবী করে, সেই সকল জুয়াচোরের মুখোশ খুলিয়া দেওয়াই ব্যঙ্গসাহিত্যের উদ্দেশ্য। এই জাতীয় সাহিত্য সেইখানেই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে যেখানে মিথ্যা ও সত্যের প্রভেদ প্রায় অনির্দেশ্য বলিয়া মনে হয়; অসম্ভব প্রায় সম্ভব হইয়া উঠে, শঠতা সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া সাফল্যের দ্বারদেশে আসিয়া পা পিছলাইয়া ধরাশায়ী হয়। ইউরোপীয় সাহিত্য হইতে দুইটি প্রখ্যাত দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হইবে। প্রাচীন কমেডির শ্রেষ্ঠ লেখক অ্যারিস্টফেনিস জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ নির্লোভ

মহামানব সক্রেটিস্‌কে ভণ্ড দার্শনিক হিসাবে চিত্রিত করিয়া একটি নাটক লিখিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে এই নাটক অভিনীত হওয়ার সময় সক্রেটিস্‌ নিজে মঞ্চের কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতেন যাহাতে দর্শকরা কল্পিত চরিত্রের সঙ্গে তাঁহাকে মিলাইয়া লইতে পারে। কেহ বলিবেন ইহা সক্রেটিসের মহত্ত্ব আবার ইহাও মনে করা যায় নাট্যকারের মনেও সক্রেটিসের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল। আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যে ভণ্ডামির সেরা দৃষ্টান্ত মলিয়েরের 'Tartuffe or the Impostor' (Tartuffe, ou Imposteur)। Tartuffe (টারটুফ্‌) প্রায় বাজিমাৎ করিয়াছিল। সে সব আটঘাট এমন ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল যে নিতান্ত আকস্মিকভাবে তাহার কলাকৌশল ধরা না পড়িলে তাহার উপকারী বন্ধুর নিস্তার ছিল না। সাধারণত অঘটন ঘটাইয়া কাহিনীর সমাপ্তি ঘটাইলে তাহা দোষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে, কিন্তু এইখানে এই জাতীয় পরিণতিই কমেডিকে গভীরতা দান করিয়াছে, কারণ ইহাই জুয়াচোরের অত্যাশ্চর্য ক্ষমতার চূড়ান্ত সাক্ষ্য বহন করে, আবার ইহাও দেখা যায় যে সাক্ষ্যপ্রপঞ্চ যে কোথায় লুকাইয়া থাকে এই সকল সুচতুর প্রতারকেরা তাহা জানে না।

বিরিঞ্চিবাবা ও তাহার সহযোগী কেবলানন্দ এত সহজে ধরা দিয়াছে যে এই কাহিনী সেইরূপ শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করিতে পারে না। ইহাদের পতন এত সহজে ঘটিয়াছে যে উত্থানই অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয়। এই অবশ্যস্বীকার্য মৌলিক ত্রুটি সত্ত্বেও এই গল্পের কতকগুলি গুণও লক্ষণীয় এবং ইহার কোন কোন জায়গায় প্রতিভার আভাস পাওয়া যায়।

প্রথমেই লক্ষ্য হইবে দুই-একটি রেখার টানে পার্শ্বচরিত্র আঁকার এবং সংক্ষিপ্ত মন্তব্যের মধ্য দিয়া গভীর ব্যঞ্জনা আক্ষিপ্ত করার ক্ষমতা। হাবশীবাগান লেনের মেসে যাহারা বাস করিত বা আড্ডা দিতে আসিত তাহাদের কথাই বলা যাইতে পারে। থিওসফি বা দিব্যপ্রেরণায় বিশ্বাসী সার্থকনামা পরমার্থ এবং শস্তায় কিস্তিমাৎ করিয়া অর্থ লাভ করিতে আগ্রহী নিতাইবাবুর চিত্র ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইহাদের বর্ণনা দিতে যাইয়া লেখক প্রসঙ্গক্রমে শরৎচন্দ্রের উপর এক হাত লইয়াছেন ; নিবারণ একটা মাসিক পত্রিকা লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল, যাহার মধ্যে পাঁচটি গল্প আছে এবং পাঁচটি গল্পের নায়িকাই 'এক একটি সতী-সাধ্বী বারাঙ্গনা'। আইনস্টাইনের রিলেটিভিটি বা আপেক্ষিকতাবাদ গণিত ও পদার্থবিত্তার সবচেয়ে দুরূহ বিষয় এবং আধুনিক বিজ্ঞানে ইহাই বোধ হয় সব

চেয়ে যুগান্তকারী আবিষ্কার। হাস্যরসিক একটি তুচ্ছ উপমার দ্বারা ইহাকে হালকা করিয়া দিয়াছেন। নেপোলিয়ন বলিয়াছিলেন মহতো মহীয়ান্ হইতে উপহাস্যতার দূরত্ব শুধু এক ধাপ। রিলেটিভিটি তত্ত্বের আক্ষরিক অর্থ এই যে সবকিছুই অন্যনির্ভর, দেশকাল-অনালিঙ্গিত কোন কিছুই থাকিতে পারে না। চৌদ্দ নম্বর হাব্শীবাগান লেনের মেসের নিবারণ এই দুরূহ, প্রগাঢ় এবং জটিল তত্ত্বকে একেবারে জলের মত প্রাঞ্জল করিয়া দিল: 'ঠিক। জনার্দন ঠাকুর পটলডাঙ্গায় কেনে আড়াই সের আলু, আর মেসে এলেই হয়ে যায় ন-পো।' অনাদি অনন্ত কাল এবং অসীম বিশ্বজগৎ যে দুরূহ তত্ত্বে বিধৃত হইয়াছে আর মেসের ঠাকুর বা চাকর বাজারের যে হিসাব দেয় তাহা মূলতঃ অভিন্ন।

অন্যান্য গৌণ চরিত্রগুলির অনেকেই আপন বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। সাহেবী সওদাগরী অফিসের কেরানী বরদা মুখুজ্যে যাহার নিদ্রা ও জাগরণ পর্যন্ত যন্ত্রের মত আয়ত্তাধীন, বীরপুঙ্গব ফেঁকু পাড়ে, তুর্কী আভিজাত্যগর্বিত, পূর্ববঙ্গনিবাসী মৌলবী বছিরদ্দি, তৃতীয় পক্ষের নবীনা স্ত্রীকে লইয়া বিব্রত গোবর্ধন মল্লিক— ইহারা সকলেই গল্পে জায়গা পাইয়াছে, কেহ জায়গা জুড়িয়া বসে নাই, কিন্তু প্রত্যেকেই হাসির খোরাক যোগাইয়াছে। প্রফেসর ননির উপকাহিনী একটু বেশি বড় হইয়াছে। তাহা হইলেও বন্ধু নিবারণের একটি উক্তিই ইহাকে স্মরণীয় করিয়াছে। এই খেয়ালি বৈজ্ঞানিককে ঘাস সিদ্ধ করিতে দেখিয়া নিবারণ জিজ্ঞাসা করিল, 'সেদ্ধ হচ্ছে? ননির বুঝি কাঁচা ঘাস আর হজম হয় না?' কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে আজ যে সব বস্তু রূপকথা বা আজগুবি ও উদ্ভট বলিয়া মনে হয়, বিজ্ঞানের প্রচেষ্টায় কালক্রমে তাহা প্রথমে সম্ভাব্য হইয়াছে এবং পরে বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। মানুষ উড়িতে শিখিয়াছে, শশধরের শশককে ধরিয়া ফেলিয়াছে, সমুদ্রের তলস্থিত পাতালের রহস্য আবিষ্কার করিতেছে। যাহা পরিহাসাস্পদ তাহা এক দিকে যেমন মহনীয় বস্তু বা বিষয় হইতে শুধু এক ধাপ দূরে আছে, তেমনি বাস্তব ও আজগুবির মধ্যে সীমারেখাও খুব সূক্ষ্ম। ঘাসও খাদ্য হিসাবে গণ্য হইতে পারে।

বিরিঞ্চিবাবার বাগাড়ম্বর ও অসম্ভব ক্রিয়াকলাপকে সম্ভাব্য করার জন্য গ্রন্থকার যে তিনটি চরিত্রের সমাবেশ করিয়াছেন তাঁহারা পরিবেশরচনার পক্ষে খুবই সুষম। প্রধান যজমান গুরুপদবাবু এক সময়ে শুধু বিত্ত অর্জন করিয়াছেন, তিনি খাদ্যাখাদ্য বিচার করিতেন না; বোধ হয় আইন-ব্যবসায় ছাড়া অন্য

কোন দিকে মন দেওয়ার মত তাঁহার অবকাশও ছিল না। স্ত্রীর মৃত্যুতে তিনি খানিকটা মতিচ্ছন্ন হইয়া একেবারে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া অলৌকিকের আলেয়ার পশ্চাদ্ধাবন করিবেন ইহা স্বাভাবিক। ব্যারিস্টার ও. কে. সেন বাঙ্গালী সাহেব লোক অর্থাৎ আধুনিক যুক্তিবাদে বিশ্বাসী এবং প্রাচীন কুসংস্কার-বিরোধী। মনে হয় তিনি ব্যারিস্টারিতে খুব সুবিধা করিতে না পারিয়া কয়লার ব্যবসায়ে মন দিয়াছিলেন, কিন্তু সেখানে বহু টাকা লোকসান দিয়া বিভ্রান্ত হইয়াছেন। মনের এই অবস্থায় তিনি অপর প্রান্তে যাইয়া যে, কোন আজগুবি আস্ফালনে প্রবঞ্চিত হইবেন, ইহাও অপ্রত্যাশিত নয়। আর আছেন স্থূলকায়, মিহি ধুতিপরা সম্পন্ন মুৎসুদ্দি গোবর্ধন মল্লিক যিনি তৃতীয় পক্ষ ঘরে আনিয়া দোটানায় পড়িয়াছেন। কামিনী ও কাঞ্চন তাঁহাকে প্রবৃত্তির পথে প্রলুব্ধ করিতেছে আবার জরা তাঁহার সম্মুখে এই পথের দুরূহতার সন্ধান দিতেছে বলিয়া তিনি নিবৃত্তির মহিমা উপলব্ধি করিতেছেন। এই সংকটের সহজ সমাধান সম্ভব নয় বলিয়া তিনি বাবার অলৌকিক শক্তির সন্ধান করিবেন ইহাও সম্ভব। আরও কিছু লোক ইঁহাদেরই মত আঘাত খাইয়া অথবা প্রলুব্ধ হইয়া এই ভাবেই বিরিঞ্চিবাবার বাগ্‌জালে জড়াইয়া পড়িয়াছেন ইহাও অনুমান করা যাইতে পারে।

বিরিঞ্চিবাবা এই আসরের উপযুক্ত নায়ক। জনৈক চতুর ব্রিটিশ রাষ্ট্রনায়ক বলিয়াছিলেন, যদি রাজন্যবর্গকে খোসামোদ করিতে চাও, তবে খুব পুরু প্রলেপ দিও। বিরিঞ্চিবাবাও সেই রকমই মনে করিয়াছেন যে যদি অলৌকিক শক্তিরই ভান করিতে হয় তাহা হইলে যত বেশি অসম্ভব কথা বলা যাইবে, মোহাচ্ছন্ন মানুষ তত সহজে প্রতারিত হইবে। এই কারণেই তাঁহার সমস্ত উদ্ভট, অদ্ভুত উক্তির মধ্যে একটা সুসঙ্গতি আছে এবং ইহাদের নিশ্ছিদ্র অযৌক্তিকতাই যুগপৎ বিস্ময় ও বিশ্বাস সঞ্চারিত করিয়াছে। তাই তিনি বিরিঞ্চি অর্থাৎ পিতামহ ব্রহ্মার সঙ্গে তুলনীয়; আদিম সৃষ্টির তিনি সাক্ষী, যিশু তাঁহার কাছে সেদিনকার ছেলে, বৈবস্বত মনু তাঁহার ইয়ার যাঁহাকে তিনি 'বিবু' বলিয়া সস্নেহে সম্বোধন করেন, তাঁহার কাছে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, কারণ ইহারা এক দেহে লীন হইয়া আছে। সুপ্রাচীন নীললোহিত বা শ্বেতবাহন কল্পে জীবসৃষ্টি আর অষ্টাদশ শতাব্দীতে জগৎশেঠের মাতৃশ্রাদ্ধ—তাঁহার কাছে ইহাদের মধ্যে কালগত বৈষম্য

নাই। তিনি একাধারে কালের অধীশ্বর এবং চন্দ্রসূর্যের চালক। অর্থচ এই সমস্ত আজগুবি কথা ইনি এত সংক্ষেপে, নিরুত্তাপে, অবলীলাক্রমে বলিয়া যাইতেছেন যে ইহাদের অসম্ভাব্যতায় খট্‌কা লাগে না। এই সংযত, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ক্লাসিক স্টাইলের লক্ষণ এবং ইহাই এই অসম্ভব কাহিনীকে সজীবতা ও সরসতা দান করিয়াছে। শুধু প্রশ্ন থাকিয়া যায়, এই অগণিত অভ্যাগতদের মধ্যে কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন দুই-চারজন লোকও কি ছিল না? অথচ দেখা গেল নিবারণ ও সত্য দূর হইতেই অতি তুচ্ছ মারণাস্ত্রের ব্যবস্থা করিয়া অবলীলাক্রমে বাবার ধাপ্পাবাজি ধরিয়া দিল।

(৪)

স্বভাবতঃ রক্ষণশীল হিন্দুসমাজে প্রাচীন কাল হইতেই ইষ্টদেবতা বা মন্ত্রগুরুর প্রচলন ছিল। এবং প্রত্যেক বংশেরই পুরোহিতবংশের মত গুরুবংশ ছিল। এই সব গুরুদের নিকট হইতে শিষ্যরা বেশি প্রত্যাশা করিত না এবং ইঁহারাও শিষ্যদের নিকট হইতে খুব বেশি কিছু দাবী করিতেন না। ইঁহারা সচ্চরিত্র সদাচারী, মোটামুটি শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ হইবেন, মাঝে মাঝে আশীর্বাদ জানাইতে শিষ্যবাড়ি উপস্থিত হইবেন এবং যথাকালে শিষ্য ও শিষ্যপত্নীকে শাস্ত্রীয় মন্ত্র উচ্চারণ করাইয়া পূজার্চনায় নিয়োজিত করিবেন। ইহা বংশগত অধিকার ও কাজ বা পেশা; কোন গুরু কোন অনন্যসাধারণত্ব দাবী করিতেন না, যদিও ইঁহারা ধর্মকার্যে শিষ্যকে নিয়োজিত করিতেন বলিয়া পূজারি পুরোহিত অপেক্ষা বেশি মর্যাদা পাইতেন। রায় বাহাদুর বংশলোচনের ইয়ার বিনোদ উকিল খুব সংক্ষেপে এই সেকেলে গুরুর চিত্র আঁকিয়াছেন, ইঁহারা বছরে বার দুই শিষ্যবাড়ি পায়ের ধূলা দিতেন আর পাঁচ সের চাল, পাঁচ পো চিনি, গোটা দশেক টাকা লাট্টু মার্কা থান ধুতিতে বাঁধিয়া প্রস্থান করিতেন। কালক্রমে এই গুরুগিরির অবমূল্যায়ন হইতে লাগিল। ইংরেজি শিক্ষার, বিশেষ করিয়া বৈজ্ঞানিক শিক্ষার, প্রভাবে ধর্মবিশ্বাস ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল এবং ধর্মকার্যে প্রবর্তনা দেওয়ার জন্য বংশগত অধিকারসম্পন্ন সম্প্রদায়ের প্রয়োজন রহিল না। গুরুরাও দেখিতে পাইলেন যে এই ব্যবসায় অচল হইয়া আসিয়াছে এবং তাঁহাদের আচারনিষ্ঠাও ক্রমশঃ শিথিল হইতে লাগিল। রায় বাহাদুর

বংশলোচন এই অধঃপাতকে স্বীয় গুরুর দৃষ্টান্তের দ্বারা স্পষ্ট করিয়া দিলেন। তাঁহাদের গুরুপুত্তুর কলিকাতায় থাকেন এবং রায় বাহাদুর শুনিয়াছেন, তিনি থিয়েটারে আব্‌দাল্লা সাজেন। 'রাধামাধব!'

মানুষ যতই যুক্তিবাদী, বুদ্ধিজীবী, প্রত্যক্ষনির্ভর হউক না কেন, অলৌকিকে বিশ্বাস তাহার মজ্জাগত ধর্ম এবং কোন না কোন উপায়ে এই বিশ্বাস আত্ম-প্রকাশ করিবেই। শুধু পরিবর্তিত আবহাওয়ায় অন্যান্য বিশ্বাসের মত এই বিশ্বাসও যুগে যুগে নূতন নূতন রূপ পরিগ্রহ করে। কেহ কেহ বিরিঞ্চিবাবার মত ভেলকি বাজি দেখাইয়া কিস্তিমাৎ করিতে চাহেন। আবার কেহ কেহ আছেন যাঁহারা শুধু মাধুর্যের দ্বারা, রূপের দ্বারা, আদবকায়দার দ্বারা, মোট কথা স্বকীয় ব্যক্তিত্বের দ্বারা শিষ্যবর্গের মনে প্রভাব বিস্তার করিয়া শিষ্যসাম্রাজ্য স্থাপন করেন। এই জাতীয় স্বামী মহারাজ বা গুরুদেবের শিষ্যরা গুরুপদবাবুর মত শোকে মতিচ্ছন্ন, জীবনযুদ্ধে পরাজয়ে বিভ্রান্ত ও. কে. সেন, তৃতীয় পক্ষের দ্বারা বিব্রত বৃদ্ধ গোবর্ধন মল্লিক বা লোভে বিমূঢ় নিতাইদা'র মত ছিটগ্রস্ত বেয়াকুব নহে। সাধারণ মানুষের মধ্যে অলৌকিকের মত যে আকৃতি এবং দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমি হইতে মুক্তি পাওয়ার যে আগ্রহ নিহিত থাকে তাহাই এই সব তথাকথিত মহাপ্রভুদের প্রভুত্বের ভিত্তি। এমনি একজন সাধারণ লোক হইলেন ধনিগৃহিণী, পুত্রকন্যাপরিবৃতা মানিনী দেবী। বাইশ বৎসরের স্বচ্ছন্দ গৃহিণীপনা, ছোটখাটো শিল্পকর্ম এবং স্বামীর সঙ্গে মান-অভিমান প্রভৃতি যখন ক্লান্তিকর হইয়া উঠিয়াছে, তখন তাঁহার আধ্যাত্মিক বৈচিত্র্যের জন্য মন আনচান করিয়া উঠিল এবং তিনি গুরু নির্বাচন করিলেন, খল্বিদং স্বামীকে। এই জাতীয় গুরুরা ভস্মমাখা জটাধারী সন্ন্যাসী নহেন, ইঁহারা অনেকাংশে প্রকাশ্যেই গৃহী লোকের মত জীবনযাপন করেন। খল্বিদং স্বামীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার যে অম্লমধুর বর্ণনা আছে তাহার মধ্যেই ইঁহাদের চরিত্রের লৌকিক ও আধ্যাত্মিক উভয় দিকই প্রতিফলিত হইয়াছে: 'স্বামীজীর নিত্যকর্মপদ্ধতি একেবারে ধরাবাঁধা। সকালবেলা অনুপান সহ তিন পাথরবাটি চা, দ্বিপ্রহরে পবিত্র অন্নব্যঞ্জন, তাহার পর ঘণ্টা তিন-চার যোগনিদ্রা, বিকালে নানাপ্রকার ফলমূল মিষ্টান্ন, পুনর্বার চা, সন্ধ্যায় মধুরকণ্ঠে ধর্মব্যাখ্যা, সঙ্গীত ও ঘুঙুর ভাবনৃত্য, রাত্রে সাত্ত্বিক পোলাও ও কালিয়া।'

এই সাধুর সঙ্গে বিরিঞ্চিবাবার সাদৃশ্য ও পার্থক্য, বিশেষ করিয়া পার্থক্য

লক্ষণীয়। বিরিঞ্চিবাবার পদ্ধতি অনেকটা ভেল্কিবাজির মত, অপরিপক্ক ও অমার্জিত। কিন্তু উভয়ের পরিণতি একই রকমের ; উভয়ত্র একটা বিরাট অ্যান্টি-ক্লাইমেক্স বা ভাবাবরোহ, ধপ্ করিয়া আকাশ হইতে পাতালে পতন। আলংকারিকেরা বলেন গুরুগম্ভীর সাহিত্য, গীতিকাব্য, মহাকাব্য বা ট্র্যাজেডির গোড়ায় আছে রূপক বা মেটাফর ; জীবনে যে দুই বস্তু বিচ্ছিন্ন, বিসদৃশ তাহাদের সম্মিলন বা সম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা। মানুষে মানুষে যে ব্যবধান তাহা ঘুচাইবার চেষ্টার নাম প্রেম এবং সেই ব্যবধানের অনতিক্রম্যতাই ট্র্যাজেডি। অপর পক্ষে, কমেডির গোড়ার কথা হইল অসামঞ্জস্য, সম্ভব-অসম্ভবের সহাবস্থান, মহতো মহীয়ানের অণোরপি অণীয়ানে পরিণতি। খল্বিদং স্বামীর আবাহন-বিসর্জনে কমেডির এই উত্থান-পতনের চিত্র অতি সুনিপুণভাবে চিত্রিত হইয়াছে।

মানিনী সম্পন্ন ঘরের গৃহিণী, তদুপরি অভিমানিনী, তবে সাধারণ বাঙ্গালী বধূর মতই নিয়মানুবর্তিনী। বাইশ বৎসর একটানা সংসার করিয়াছেন এবং নাতিদীর্ঘ দাম্পত্যজীবনে ছোটখাটো মান-অভিমান ও মতান্তর হইয়াছে ; প্রীতির শৃঙ্খল অনেকবার মেরামত করিতে হইয়াছে, কিন্তু মোটামুটিভাবে বলা যাইতে পারে যে তাহা বৈচিত্র্যহীন, একটানা গদ্যময় জীবন। কাজেই তাঁহার মনে ধর্মকর্মের আকাঙ্ক্ষা, গুরুবরণের উত্তেজনা জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক। আবার ইহাতে বংশলোচন যে একটু শঙ্কিত হইবেন তাহাও স্বাভাবিক এবং যে গুরু আসিয়া হাজির হইলেন, তিনি শিষ্যার মন জয় করার মত লোক বটে—'টকটকে গৌরবর্ণ, চাঁচর ঝাঁকড়া চুল, মধুর কণ্ঠস্বর, চোখে একটা অপূর্ব প্রতিভান্বিত ঢুলু ঢুলু ভাব।' তদুপরি বংশলোচনের অপেক্ষা বয়সে নবীন। মানিনী সাধারণ রমণী নহেন, তিনি গুরুকে যাচাই করিয়া পরে মন্ত্র লইবেন এইরূপ ঠিক করিয়াছিলেন। তবু তিনি সহজেই গুরুর দ্বারা আকৃষ্ট হইলেন, কিন্তু বংশলোচন প্রমাদ গণিলেন, কারণ প্রাচীনপন্থী গুরুরা—অর্থাৎ গুরু বংশাবতংসরা অখণ্ডমণ্ডলাকার ভগবানকে লাভ করিবার মন্ত্র দিয়াই ক্ষান্ত হইতেন, কিন্তু আধুনিক গুরুরা নিজেরাই অখণ্ডমণ্ডলাকারের পদটি দখল করিয়া বসেন !!

বংশলোচনের মুক্তি আসিল খুব সহজ উপায়ে। এখানে নেপোলিয়নের মন্তব্য স্মরণীয় : মহত্তম আর হাস্যকরের ব্যবধান শুধু এক ধাপ। এই গল্পের

প্রতি পদক্ষেপে এই উক্তির যাথার্থ্য অনুভূত হয়। একে তো প্রবীণ কেদার চাটুজ্জ্যের বিচক্ষণ মন্তব্য, তীক্ষ্ণবুদ্ধি উকিল বিনোদের সকৌতুক পরামর্শ, উদয়ের অপোগণ্ডসুলভ প্রলাপোক্তি সব সময়েই কমেডির পরিবেশ রচনা করিয়াছে এবং সজীব রাখিয়াছে। মানিনীর নিজের ধর্মোন্মাদের মধ্যেও তুরীয় ও তুচ্ছের অপূর্ব সমাবেশ হইয়াছে। গুরুভক্তির আতিশয্যে পরিচয়ের তৃতীয় দিনেই তিনি স্বামীজীর চর্বিত আকের ছিবড়া পরম ভক্তি সহকারে চিবাইতে লাগিলেন। ব্রহ্ম সকল জীবেই বিরাজ করেন, সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, কিন্তু তিনি আকের ছিবড়াকে আশ্রয় করিয়াছেন, ইহা দেখিলে জুগুপ্সা সঞ্চারিত হইয়া বীভৎস রসেরই সৃষ্টি করে।

এই গল্পের পরিসমাপ্তি খুবই মুখরোচক এবং অলৌকিক তত্ত্বকে যাঁহারা পেশায় পরিণত করিয়াছেন অথবা বলা যায়, যাঁহারা আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিকের পার্থক্য ভুলিয়া যান, ইহা তাঁহাদের যোগ্য পুরস্কার।

লম্বকর্ণ পরশুরাম-সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট চরিত্র। সে বেওয়ারিশ ছাগলমাত্র। ঘটনাচক্রে মানিনী দেবীর গৃহে আশ্রয় পাইয়া তাঁহার স্নেহ আকর্ষণ করিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া খল্বিদং স্বামী শূন্যগর্ভ সাড়ম্বর বক্তৃতার মাধ্যমে তাঁহার অনুকম্পা দেখাইলেন এবং স্বীয় ব্রহ্মজ্ঞানের পরিচয় দিলেন। তিনি জানিতেন না যে নভেল পড়া, লেস বোনা, ছাঁটা পশমের আসন বানানো কাজের পরিবর্তেই মানিনী তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্মব্যাখ্যা, সঙ্গীত ও ভাবনৃত্যের ইহার অধিক মূল্য নাই। এই গল্পের পরিণতিতে ভাবাবরোহ বা অ্যান্টি-ক্লাইমেক্সের সঙ্গে Irony বা বিপরীত লক্ষণার অপূর্ব সংযোগ হইয়াছে। যে অবোধ জীবের প্রতি করুণা দেখাইতে যাইয়া স্বামীজী জীবনসম্পর্কে অর্থহীন নৈতিক ও দার্শনিক বক্তৃতা দিয়াছেন সেই বুদ্ধিহীন পশুই যেন স্বীয় দিব্যদৃষ্টির ফলে ইহার শূন্যগর্ভতা বুঝিতে পারিয়া অঙ্কশাস্ত্রের অভ্রান্ত নিয়মেই স্বীয় শক্তির যথাযোগ্য প্রয়োগ করিয়া ইঁহাকে ধরাশায়ী করিল। একদিন ঝড়জল-দুর্যোগের আক্রমণ হইতে সে প্রভুকে রক্ষা করিয়াছিল আর অন্যদিন প্রভুপত্নীকে আসন্ন বুদ্ধিভ্রংশ হইতে রক্ষা করিয়া প্রভুকেও আপদমুক্ত করিল। এই নাটকের পরিশেষে বংশলোচন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'স্ত্রীচরিত্র কি অদ্ভুত জিনিস!' কিন্তু যে অখণ্ডমণ্ডলাকারপদপ্রার্থী মহাপুরুষ একটা 'বোকাপাঁঠা'র প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়ান তাঁহাকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করিয়া মানিনী দেবী

দেখাইয়াছেন যে স্ত্রীচরিত্রের খামখেয়ালীপনার অন্তরালে সাধারণ বিষয়বুদ্ধির পাকা বনিয়াদ রহিয়াছে।

গণৎকারেরা ভূত ভবিষ্যৎ গণনা করিতে পারেন এবং বর্তমান ঘটনাবলীরও গূঢ় তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতে পারেন। আমরা প্রত্যক্ষকে যত প্রাধান্যই দিই না কেন, প্রত্যক্ষের অতীত রহস্য জানিবার কৌতূহল মনুষ্যচরিত্রের অদম্য প্রবৃত্তি। সেই জন্য জ্যোতিষী, গণৎকার, হস্তরেখাবিচারকের সমাদর বা পশার সর্বদেশে ও সর্বকালে অটুট রহিয়াছে; যে বৈজ্ঞানিক এই সকল বিদ্যাকে পরিহাস করেন, তিনিও জ্যোতিষীকে কোষ্ঠী দেখান এবং হাতের কাছে হস্তরেখা-বিচারক পাওয়া গেলে হাত বাড়াইয়া দেন না এমন নাস্তিক বিরল। এই নিগূঢ় বিদ্যায় কোন খাঁটি তত্ত্ব নিহিত আছে কিনা সেই প্রশ্নের আলোচনা এখানে অবান্তর, তবে এই বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, বিশ্বাসপ্রবণতার আধিক্যের জন্য এখানে ধোঁকা দেওয়া সহজ এবং এই পেশায়, ভুইফোঁড়, প্রচারসর্বস্ব জুয়াচোরের ভিড় খুব বেশি, তবে ইহাদের পশার খুব বেশিদিন থাকে না। এমনি একজন ধাপ্পাবাজ, ভণ্ড তথাকথিত গ্রীক জ্যোতিষীর মুখোশ খোলা হইয়াছে 'গণৎকার' গল্পে যেখানে মীনেন্দ্র মাইতি মিনাণ্ডার দ' মাইটি নামে আসর জমাইয়া বসিয়াছিল, কিন্তু বেশিদিন পশার রক্ষা করিতে পারে নাই।

পরশুরামের গল্পের মৌলিক পরিকল্পনায় তেমন কোন বৈশিষ্ট্য নাই। মীনেন্দ্র মাইতি গল্পের বক্তার নিকট হইতে বেশ মোটা টাকা ধার করিয়া গা-ঢাকা দিয়াছিল। কিছুকাল পরে সেই মীনেন্দ্রই ভোল বদলাইয়া মিনাণ্ডার (মীনেন্দ্র) দ' মাইটি (মাইতি) সাজিয়া অদ্বিতীয় গণৎকার হিসাবে আসর জাঁকাইয়া বসিল। ফটো দেখিয়া পাওনাদারের সন্দেহ হওয়া এবং গণৎকারের প্রার্থী না দেখিয়া চটপট উত্তর দেওয়ার মধ্যে কিছুই বিস্ময়কর নাই। উত্তমর্ণ বক্তা নিজেই গা-ঢাকা দেওয়া অধমর্ণকে ধরিতে পারিতেন। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে মূল গল্পের প্রারম্ভে বা পরিণতিতে বিশেষ কোন মৌলিকতা নাই আর মিনাণ্ডার দ' মাইটির মত ধাপ্পাবাজ কলিকাতার মত বড় শহরে সব সময়েই প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। গ্রন্থকারের নৈপুণ্য উপকাহিনীর পরিকল্পনায়, ততোধিক মূল কাহিনীতে তাহার সংযোজনে। একটা প্রচলিত ইংরেজি উক্তির তর্জমা করিয়া বলিতে পারা যায়, এইখানে কুকুর লেজ নাড়ে না। লেজই কুকুর নাড়ে। রতন ডাংপিটে ছেলে, ফিটার মিস্ত্রীর সার্টিফিকেট

থাকিলেও সে কোন কাজ পাইলেও রাখিতে পারে না এবং সুবিধামত কাজও পায় না। এক সখের অভিনেতৃ-সম্প্রদায়ে সাকরেদি করে, কিন্তু কিছুই পায় না। তাহাকে গলগ্রহ হিসাবে নেওয়ার ভয়েই গোষ্ঠবিহারী তাহার বোনকে বিবাহ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছে। মিনাগুার দ' মাইটির আনুপূর্বিক কাহিনী শুনিয়া সে তাহার দল লইয়া এমন পিকেটিং শুরু করিয়া দিল যে মিনাগুার অর্ধেক টাকা পরিশোধ করিতে বাধ্য হইলেন। তবে তাহার পরই তাঁহার কলিকাতার ব্যবসায়ে মন্দা পড়ায় তিনি শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারীর পন্থা অবলম্বন করিয়া অন্যত্র পাড়ি জমাইতে সরিয়া পড়িলেন। রতনের চাকুরি হইল, গল্পের কথক তাঁহার পরহস্তগত ধনের অর্ধাংশ পাইয়া গেলেন। এই অপ্রত্যাশিত কিন্তু সম্ভাব্য পরিণতি এই গল্পের প্রধান বা একমাত্র আকর্ষণ।

(৫)

অসুখ করিলে সবাই ডাক্তার ডাকে আবার চিকিৎসকেরা সহজেই কমেডির শিকার হয়েন। বোধহয় তাঁহারা রোগ সারাইয়া রোগীকে বাঁচান এই জন্যই লোকের—এবং তাঁহাদের নিজেদের—মনেও একটা ধারণা জন্মে যে তাঁহারা জীবনদান করিতে পারেন। সুতরাং তাঁহারাও সহজেই ভণ্ড অথবা গণ্ডমূর্খ বলিয়া পরিহাসের পাত্র হইতে পারেন। ইউরোপীয় কমেডির আদিম অবস্থার চিত্র খানিকটা অস্পষ্ট, কিন্তু পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, যে অনুষ্ঠানে কমেডির জন্ম তাহার মধ্যে একজন চিকিৎসক থাকিত যে মৃত দেবতাকে বাঁচাইয়া তুলিত। অনুমান করা যাইতে পারে যে, চিকিৎসককে লইয়া কৌতুক বা বিদ্রূপ আদিম প্রহসনেরও একটা অঙ্গ ছিল। আধুনিককালে ইউরোপীয় নাটকে দুইজন শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক হইলেন মোলিয়ের ও বার্নার্ড শ'। ইঁহারা ডাক্তারদের লইয়া বহু ব্যঙ্গ কৌতুক করিয়াছেন এবং সেই কমেডির মধ্যে খানিকটা মৌলিক সাদৃশ্যও আছে; বার্নার্ড শ'য়ের জনৈক ফরাসী সমালোচক তো তাঁহার বইয়ের নামই দিয়াছেন—'বিংশশতাব্দীর মোলিয়ের'।

আমাদের সাহিত্যে এখানে ওখানে চিকিৎসক বা ডাক্তারদের লইয়া রসিকতা করা হইলেও মোলিয়ের বা বার্নার্ড শ'য়ের কমেডির ব্যাপকতা, গভীরতা বা তীক্ষ্ণতার কোন পরিচয় নাই। পরশুরামের এই শ্রেণীর রচনাও খুব উঁচু দরের

কিনা সেই বিষয়ে তর্ক উঠিবে, কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথমে চিকিৎসক ও চিকিৎসা-বিদ্যাকে কমেডির প্রধান বিষয়বস্তু করিয়া গল্প লিখিয়াছেন এবং প্রচুর সাফল্য লাভ করিয়াছেন এইরূপ দাবী অসঙ্গত হইবে না। 'যদু ডাক্তারের পেসেণ্ট' ও 'চিকিৎসা-সংকট' বাংলা সাহিত্যে অনন্য এবং 'চিকিৎসা-সংকট' গল্পের নাট্য-রূপও প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে।

বহুশ্রুত রাজশেখর বসু বার্নার্ড শ'য়ের নাটকের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না এইরূপ মনে করা বাতুলতা হইবে। যদিও দৃষ্টিভঙ্গিতে ঐক্য নাই, তবুও 'যদু ডাক্তারের পেসেণ্ট' গল্পে বার্নার্ড শ'য়ের 'The Doctor's Dilemma' নাটকের ছায়াপাত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। শ'য়ের নাটকে একজন প্রাচীন ডাক্তার আছেন—Sir Ralph Bloomfield Bonington বা B. B.—যিনি আবিষ্কারক বা বিশেষজ্ঞ নহেন, কিন্তু তাঁহার খুব হাতযশ, এমন কি তিনি রাজপরিবারেরও চিকিৎসক। নিজে খুব পণ্ডিত না হইলেও ঐ নাটকে যে সকল ডাক্তার একত্র হইয়াছেন তিনি তাঁহাদের সভাপতিস্থানীয়। অন্যত্র শ' চিকিৎসাশাস্ত্রকে ডাইনী বিদ্যার সঙ্গে তুলনা করিয়া :বলিয়াছেন—'that branch of witchcraft which is called medical science'—অর্থাৎ ইহা ঝাড়ফুঁক, মন্ত্রতন্ত্রেরই সামিল, ওঝা ও বৈদ্যের মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য নাই। ডাক্তার B. B. বলিয়াছেন যে, তিনি ধনুষ্টংকারের রোগীকে টাইফয়েডের ওষুধ দিয়াছিলেন আর টাইফয়েডের রোগীর উপর ধনুষ্টংকারের ওষুধ চাপাইয়াছিলেন, কিন্তু উভয়েই আরোগ্য লাভ করিয়া উঠিল এবং তিনি এই মারাত্মক ভুল ও তাহার বিরাট সাফল্যের অভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন। পরশুরামের ফিজিসাজিক ক্লাবের সভাপতি ডাক্তার যদুনন্দন গড়গড়ি প্রচুর টাকা উপার্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কোথায় ডাক্তারি শিখিয়াছিলেন তাহা কেহ জানে না; অনেকে বলেন ইনি খাঁটি হ্যামার-ব্র্যাণ্ড অর্থাৎ হাতুড়ে। তাঁহার 'খণ্ডযোজনী' শল্য চিকিৎসার সঙ্গে তান্ত্রিক সাধু বিঘোরবাবার 'মৃতসঞ্জীবনী' বিদ্যার সহযোগিতায় এক অঘটন ঘটিয়া গেল। The Doctor's Dilemma-র মত এখানেও চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রহসনের কমেডির সঙ্গে প্রেমের কমেডি জড়াইয়া গিয়াছে। পঞ্চীর প্রেমিক ছিল জটিরাম আর তাহার বিবাহ হইল রমাকান্ত কামারের সঙ্গে। রমাকান্ত এই গোপন প্রেমের সন্ধান পাইয়া একই বিছানায় ঘুমন্ত পঞ্চী ও জটিকে দেখিয়া রামদা'য়ের এক ঘায়ে উভয়ের মাথা কাটিয়া ফেলিল। বিঘোরবাবার

মৃতসঞ্জীবনী ও যদু ডাক্তারের খণ্ডসংযোজনী বিদ্যার সাহচর্যে 'ন ভূতঃ নঃ ভবিষ্যতি' জাতীয় ব্যাপার সংসাধিত হইল। পঞ্চী ও জটিরাম যদি পুনরায় যে যেমন ছিল তেমন হইয়াই বাঁচিয়া উঠে তাহা হইলে রমাকান্ত আবার গোলযোগ করিবে। সুতরাং জটিরামের মুণ্ড পঞ্চীর ধড়ে এবং পঞ্চীর মুণ্ড জটিরামের ধড়ে জুড়িয়া দেওয়া হইল এবং পুনর্জীবন পাইয়া তাহারা নির্বিঘ্নে সংসারযাত্রা শুরু করিল এবং উত্তমাঙ্গের দ্বারা সমাজে পরিচিত হইল। শৃঙ্গার, হাস্য ও অদ্ভুতরসের এমন সম্মিলন কদাচিৎ দেখা যায়।

'যদু ডাক্তারের পেসেণ্ট' গল্পটি সুপরিকল্পিত, সুগঠিত ও সুলিখিত কিন্তু ইহা তেমন পরিচিতি লাভ করে নাই। সাহিত্যে অনেক আজগুবি কাহিনী থাকে, কিন্তু অসম্ভবকে সম্ভাব্য হইতে হইবে। মনে হয় স্তন্যদায়ী জটিরাম এবং 'মস্কি-উল্লার' হস্তে কাষ্ঠছেদনে ব্যাপৃত পঞ্চীকে পাঠকবর্গ মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

'চিকিৎসা-সঙ্কট' চিকিৎসাবিভ্রাটের কাহিনী এবং এখানে চিকিৎসকদের মুদ্রাদোষ, অর্থগৃধ্নুতা ও বহ্বাড়ম্বরের খুব মুখরোচক বর্ণনা আছে। তদুপরি ইহার মিলনান্ত পরিণতি খুবই সুসঙ্গত হইয়াছে। নন্দ'র অলীক অসুখের চিকিৎসা-মৃগয়ার শেষ পরিণতি লেডি ডাক্তারের চেম্বারে; খুব স্বাভাবিকভাবেই এই গোবেচারী লোকটি লেডি ডাক্তারের বিপুলা ছত্র-চ্ছায়ায় আশ্রয় পাইয়াছে এবং বিবাহের উলুধ্বনির মধ্যে সংকটের মুক্তি পাইয়াছে। এই পরিণতির মধ্যে ঈষৎ করুণরসেরও স্পর্শ আছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, বিপুলানন্দের মিলনে সান্ধ্য আড্ডাটি ভাঙ্গিয়া গেল। মোটর কেনা হইল বটে, কিন্তু বন্ধুদের আর সেই মোটরে বেড়াইবার সুযোগ হইল না।

ক্রমিকতা আছে অল্পের মধ্যে তাহা গ্রন্থকারের রচনাচাতুর্যের পরিচয় দেয়। ইহাদের অবান্তর কৌতূহল ও সদুপদেশ দানের প্রবৃত্তি চূড়ান্ত প্রকাশ পাইয়াছে সর্বশেষ বক্তার মন্তব্যে: 'আরে মোলো, ভালো করলে মন্দ হয়। স্পষ্ট দেখলুম লেগেছে। তবু বলে লাগেনি।' নন্দ'র বন্ধুদের কথাবার্তার বৈচিত্র্য এবং বৈশিষ্ট্যও লক্ষণীয়। প্রত্যেকের বক্তব্যের মধ্যে স্বীয় ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হইয়াছে এবং যদিও কাহারও সঙ্গে অপর কাহারও মতে মেলে না তবু ইহাদের মন্তব্যগুলি এক অপরূপ বর্ণালির সৃষ্টি করিয়াছে। হিসাবী ষষ্ঠীখুড়ো ঘরে বউ আনা ও মোটর গাড়ি কেনা এই উভয় প্রস্তাবেরই বিরোধী, তিনি বলিলেন, 'আমার মতে মোটর কারও যা, পরিবারও তা। ঘরে আনা সোজা, কিন্তু মেরামতী খরচ যোগাতে প্রাণান্ত। আজ টায়ার ফাটল, কাল গিন্নীর অম্বলশূল, পরশু ব্যাটারি খারাপ, তরশু ছেলেটার ঠাণ্ডা লেগে জ্বর।… এই শীতকালে কোথা দু-দণ্ড লেপের মধ্যে ঘুমুব মশায়, তা নয়, সারারাত প্যান প্যান ট্যাঁ ট্যাঁ।' ইহার উপর নিধুর মন্তব্যও খাসা: 'ষষ্ঠীখুড়ো যে রকম হিসাবী লোক, একটি মোটা-সোটা ভাল্লুকের মেয়ে বে করলে ভাল করতেন। লেপ-কম্বলের খরচা বাঁচত।'

চিকিৎসকদের অজ্ঞতা যেমন সীমাহীন, তাহাদের আত্মবিশ্বাসও তেমনি প্রচণ্ড। সবাই অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়ায়, সবাই নিজেদের বাহাদুরি দেখাইতে ব্যস্ত, কারণ সকলের মূলধনই ধাপ্পাবাজি; ইহাদের ভাষার প্রকার-ভেদ থাকিলেও সকলের বুলিই অর্থহীন প্রলাপ আর সকলের লক্ষ্যই রোগীর পকেট। ইহাদের মধ্যে অ্যালোপ্যাথিই বেশি জায়গা জুড়িয়াছে, কারণ অ্যালোপ্যাথিরই বৈজ্ঞানিক দম্ভ আকাশচুম্বী। অ্যালোপ্যাথদের আর একটা দুর্বলতা আছে; তাহারা যুথবদ্ধ হইয়া চলে, একে অপরের সহায়তা করে। কেহ সার্জন, কেহ চিকিৎসক, কেহ রক্তপরীক্ষক, কেহ ধাত্রীবিদ্যায় পারদর্শী, কাজেই কন্‌সালটেশনের প্রয়োজন হয়। ইহাদের এই দুর্বলতা বার্নার্ড শ'র নাটকের জনৈক ডাক্তার সোজাসুজি স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন, তাঁহাদের পেশা এক চক্রীর আড্ডা ('...not a profession, but a conspiracy')। হোমিওপ্যাথ, কবিরাজ ও য়ুনানী হাকিমরা এইভাবে জাল বিস্তার করে না।

'চিকিৎসা-সংকট' সুগঠিত, সুলিখিত সরস গল্প হইলেও ইহাকে প্রথম শ্রেণীর রচনা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না; কারণ ইহার ব্যঙ্গবিদ্রূপ খুব ভাসা-ভাসা রকমের। কয়েকজন চিকিৎসকের মুদ্রাদোষ, অর্থলোভ, দাম্ভিকতা এবং

রোগীর অসহায়তা বা অজ্ঞতার সুযোগ লইয়া ধাপ্পা দেওয়ার অতি মোটা কৌশলের ঝকঝকে বর্ণনা অতিক্রম করিয়া ইহা কোন গভীর রহস্যে পঁহুছিতে পারে নাই বা কয়েকটি রেখার টানে কোন চরিত্রকে সজীব করিতে পারে নাই। পঞ্চাশ-ষাট বছর পূর্বে জনৈক প্রথিতযশা ডাক্তার —আমাদের Sir Ralph Bloomfield Bonington—ধনী মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীর মাথায় স্টেথোস্কোপ লাগাইতেন এইরূপ জনরব উত্তর কলিকাতায় প্রচলিত ছিল। আর বড়-ছোট অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তাররা সবাই দুর্বোধ্য শাস্ত্রীয় কিচিরমিচির আওড়াইয়া, অনাবশ্যকভাবে ওষুধ ও অন্য ব্যবস্থাদি করিয়া নিজেদের ও জাতভাইদের অর্থাগমের ব্যবস্থা করেন। অ্যালোপ্যাথরা আর কিছু না করুন মোটা মোটা বই পড়িয়া ও মুখস্থ করিয়া পাস করিয়াছেন। হোমিওপ্যাথদের সেই প্রয়োজন হয় না; তাঁহারা প্রায় সবাই 'জন্মসিদ্ধ' মহা-পুরুষ; সেই জন্যই পাণ্ডিত্যের প্রগাঢ়তা দেখাইবার জন্য তাঁহাদের বড় বড় বই দেখাইতে হয় এবং তাঁহাদের প্রধান হাতিয়ার অ্যালোপ্যাথির অসারতা, বিষাক্ততা প্রভৃতির নিন্দা। সুতরাং ডাক্তার তরফদার বা নেপাল ডাক্তারের উপর লেখক যে বিদ্রূপ নিক্ষেপ করিয়াছেন তাহার মধ্যে অভিনবত্ব নাই। কবিরাজ তারিণী সেনের চিত্র আঁকিতে যাইয়া লেখক বিষয়ের মধ্যেই প্রবেশ করেন নাই। 'যস্তিবাবু' zাস্তি পারনা' প্রভৃতি উচ্চারণ ভঙ্গিমার দ্বারা শস্তা হাসির খোরাক পরিবেশন করিয়াছেন এবং যিনি স্বর্গবৈদ্য ধন্বন্তরির উত্তরপুরুষ এবং মহর্ষিকথিত শাস্ত্রোক্ত চিকিৎসাপদ্ধতিতে চিকিৎসা করেন তিনি সোজা-সুজিভাবেই অলৌকিক শক্তি দাবি করিবেন ইহা খুবই স্বাভাবিক। য়ুনানী হাকিমের চিত্রও অমনি ভাসা-ভাসা; বরং তাঁহার মুন্সী বেশি চট্‌পটে এবং প্রাণবন্ত।

শেক্সপীয়রের মত মোলিয়েরও জন্মগত প্রতিভাবলেই সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন। ইঁহারা কেহই পণ্ডিত ছিলেন না। কিন্তু প্রতিভাবলেই ইঁহারা সকল বিষয়ের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করিতে পারিতেন। মোলিয়ের বুঝিতে পারিয়াছিলেন সমস্ত চিকিৎসাবিদ্যাই অ-বিদ্যা; তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কমিক চরিত্র Sganerelle চিরকালের জন্য চিকিৎসাশাস্ত্রকে উপহাসাস্পদ করিয়াছে, কিন্তু সে আদৌ ডাক্তারই নয়, তাহাকে জোর করিয়া ডাক্তার সাজানো হইয়াছে। যাহাকে শাস্ত্র বলিয়া মানিব তাহার প্রথম ও প্রধান লক্ষণ হইল

প্রামাণ্যতা; সে এমন নির্দেশ দিবে যাহা অভ্রান্ত, কারণ তাহার পশ্চাতে রহিয়াছে নৈয়ায়িক বা গাণিতিক প্রমাণ, যাহা সাময়িক বা ব্যক্তিগত সুবিধার অপেক্ষা রাখে না অথবা যাহার সত্যতা অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রকট হইলেও তাহা অভিজ্ঞতানিরপেক্ষ। এই দেশকালনিরপেক্ষ সামান্য সূত্রের সন্ধানই শাস্ত্র ও বিজ্ঞানের লক্ষ্য। এই জন্যই আমাদের দেশের মুনিরা নিত্য, অপরিবর্তনীয়, অপৌরুষেয় শাস্ত্র রচনা করিতে চাহিয়াছেন এবং নাস্তিক, ব্যবহারিক পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানও লজিক বা ন্যায়-শাস্ত্রকে গণিতের অঙ্গীভূত করিতে চাহিতেছে। এই আদর্শ হয়ত মানুষের নাগালের বাহিরে; তবে ইহাই শাস্ত্র ও বিজ্ঞানের লক্ষ্য।

চিকিৎসাশাস্ত্রের বিন্দুবিসর্গ না জানিয়াও Sganerelle একজন প্রাজ্ঞ ডাক্তার বলিয়া গৃহীত হইয়া এই পেশায় খুব মজা পাইল। এইখানে রোগীরা এত অসহায় এবং চিকিৎসকের উপর এত নির্ভরশীল যে চিকিৎসক যাহা কিছু বলে তাহাকেই বেদবাক্য বলিয়া গ্রহণ করে, তাহারা যে কোন ব্যবস্থাই শিরোধার্য করিয়া নেয় এবং তদপেক্ষাও সুবিধার ব্যাপার এই যে যাহারা মারা যায় তাহারা মর্ত্যলোকে ফিরিয়া আসিয়া ডাক্তারের উপর দোষ চাপায় না। কাজেই বাক্যে ও ব্যবস্থাদানে ডাক্তারদের বেপরোয়া হইতে কোন বাধা নাই। তাই সে জনৈক রোগীকে পরীক্ষা করিতে যাইয়া হৃদ্‌পিণ্ডের স্থান দেহের ডান দিকে ও যকৃতের স্থান বাঁ দিকে মনে করিয়া তাহার কাজে অগ্রসর হইল এবং তদনুসারে মন্তব্য করিল। তখন গৃহস্বামী সবিনয়ে নিবেদন করিলেন যে তাঁহার একটি বিষয়ে খট্‌কা লাগিতেছে কারণ তাঁহারা শুনিয়া আসিয়াছেন যে হার্টের অবস্থান দেহের বাঁ দিকে আর লিভার আছে ডান দিকে। বাক্‌চতুর চিকিৎসক অমনি উত্তর দিল, 'হাঁ পূর্বে তাই ছিল বটে, কিন্তু এখন আমরা ওসব বদ্‌লাইয়া দিয়াছি।' এই বিখ্যাত উক্তির মধ্যে চিকিৎসা-শাস্ত্রের মৌলিক গলদ ধরা পড়িয়াছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্য ক্ষেত্রে তাহাকেই প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করা হয় যাহা ব্যতিক্রমহীন ও সর্বজনীন। প্রত্যেক বিশেষকেই এই সাধারণ সূত্রের নিরিখে বিচার করিতে হয়। এই সকল জিজ্ঞাসায় যে মত পরিবর্তন না হয় তাহা নহে, কিন্তু এই কঠোর পদ্ধতিতে অগ্রসর হইয়াই তাহা সম্ভব। কিন্তু চিকিৎসা ব্যাপারে সবাই অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়িতেছে, সবাই সীমিত একান্ত বাহ্যিক ভাসা-ভাসা পরিচয়ের ভিত্তিতে অগ্রসর হইতেছে, একজনে আজ

দশটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে যে সিদ্ধান্ত করিল, আর একজনে কাল বারটি দৃষ্টান্ত দেখাইয়া অপর সিদ্ধান্তে উপনীত হইবে, কিন্তু উভয়েই সর্বজ্ঞতার দাবী করিয়া বৈজ্ঞানিক সাজিতেছে। তাই আজ হৃদ্‌পিণ্ডকে বাঁদিকে বসাইয়া কাল ডানদিকে বসাইলে রোগী কোন মতকেই অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দেয় না এবং বার্নার্ড শ'য়ের নাটকে টাইফয়েড রোগীকে টিটেনাসের ওষুধ প্রয়োগ করিলে চিকিৎসক অবাক্ না হইয়া এই ভুলকেই বিজ্ঞানের জয়যাত্রার অঙ্গ বলিয়া মনে করে।

বার্নার্ড শ' সোসালিস্ট। তিনি মলিয়েরকে ছাড়াইয়া আর এক ধাপ অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি মনে করেন সামাজিক অব্যবস্থার ফলেই অধিকাংশ রোগের উৎপত্তি হয় এবং এই অব্যবস্থাই এই পরভুক্ রোগোপজীবী চিকিৎসক সম্প্রদায়কে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। ইঁহারা দুই-একটি পরীক্ষার উপর নির্ভর করিয়াই ওষুধ আবিষ্কার করেন এবং আর তিন-চারটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া তাহা পরিবর্তন করেন, কখনও জীববিজ্ঞানের গভীরতম রহস্যে প্রবেশ করেন না। তাই রোগের চিকিৎসা অপেক্ষা নূতন রোগের উদ্ভাবনেই ইঁহাদের আনন্দ এবং সেই রোগের অনস্তিত্ব প্রমাণিত হইলে ইঁহারা ক্ষুব্ধ হয়েন। তিনটি কুকুর ও একটি বাঁদরের পরীক্ষা চালাইয়া ডক্টর প্যারামোর Paramore's disease আবিষ্কার করিলেন। আর কয়েকটি বেশি প্রাণীর উপর পরীক্ষা চালাইয়া দেখা গেল সেইরকম কোন রোগ নাই। তখন ডঃ প্যারামোরের কি আক্ষেপ! আর ইহাই তথাকথিত চিকিৎসা-বিজ্ঞান।

এই জাতীয় কমেডিতে পরশুরাম পহুঁছিতে পারেন নাই। তিনি চিকিৎসা ব্যবসায়ের ব্যবসায়িক দিক ও চিকিৎসকদের মুদ্রাদোষ লইয়া পরিহাস করিয়াছেন; তাঁহার ব্যঙ্গ চিকিৎসাশাস্ত্রের অন্তর্নিহিত অসঙ্গতিকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

(৬)

পরশুরাম চিকিৎসা ব্যবসায়ী, আইনব্যবসায়ী, ধর্মব্যবসায়ী প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের লোভ ও ভণ্ডামির তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ করিয়াছেন। তিনি নিজে গল্পলেখক অর্থাৎ সাহিত্যব্যবসায়ী; সুতরাং এই সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁহার সবিশেষ পরিচয় থাকার কথা। এই সম্প্রদায়ের চারিত্রিক দুর্বলতা লইয়া কৌতুক ও ব্যঙ্গ

করিতে তিনি কার্পণ্য করেন নাই। তিনি দেখিয়াছেন সাহিত্যব্যবসায়ীরা লোভী বটে কিন্তু ইঁহাদের প্রধান দুর্বলতা দম্ভ এবং তজ্জনিত ঈর্ষা। ইহারও একটা ভিত্তি আছে। সাহিত্য প্রতিভার সৃষ্টি, তাহা অলৌকিক রসের আস্বাদ দেয়, কিন্তু সাহিত্যিক নিজে লৌকিক জগতের মানুষ এবং মানুষের সব কয়টি রিপুই তাঁহার মধ্যে আছে—বিশেষ করিয়া লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য। টেনিসনের জীবনী আলোচনা করিতে যাইয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, কবি যেমন করিয়া কাব্য রচনা করেন, তেমন করিয়া নিজের জীবন রচনা করেন না। টেনিসনপুত্র পিতার যে পুঙ্খানুপুঙ্খ জীবনচরিত লিখিয়াছিলেন তাহা পড়িয়াই কবি এই মন্তব্য করিয়াছিলেন, কারণ, টেনিসনের বহির্জীবনে তিনি বহু মানবিক দুর্বলতার পরিচয় পাইয়াছিলেন। কবিরা সৃষ্টি করেন; তাঁহারা প্রজাপতি ব্রহ্মার সঙ্গে তুলিত হইয়াছেন। কাজেই মানুষ হিসাবে তাঁহাদের চরিত্রের প্রধান দুর্বলতা আত্মম্ভরিতা। বিশ্বস্রষ্টা প্রজাপতি ব্রহ্মা এক ও অনন্য। কিন্তু সাহিত্যিকরা সংখ্যায় গণনাতীত এবং সেই কারণেই তাঁহাদের মধ্যে তিক্ত ও তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হওয়া স্বাভাবিক আর এই খ্যাতিলুব্ধ ও অর্থগৃধ্নু সম্প্রদায়ের দুর্বলতাকে পরিপুষ্ট করিবার জন্য একদল শিষ্যও গড়িয়া উঠে। এই শিষ্যসামন্তরা সাহিত্যিক গুণ্ডা।

সাহিত্যিকদের রেষারেষি প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। গ্রীক নাটকের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখি ব্যঙ্গরসিক অ্যারিস্টফেনিস শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি রচয়িতা ইউরিপিদিসকে একাধিক প্রহসনের বিষয়ীভূত করিয়াছেন এবং জ্যেষ্ঠ ঈস্কাইলাসের সঙ্গে ইউরিপিদিসের প্রতিযোগিতার হাস্যকর চিত্র আঁকিয়াছেন। এলিজাবেথের আমলে ইংরেজি নাটকের বিকাশের সময় দেখি রবার্ট গ্রীন নবাগত শেক্সপীয়রের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করিয়াছেন; সমসাময়িক নাট্যকার বেন জনসন শেক্সপীয়রের বন্ধু হইলেও সব সময় বন্ধুপ্রীতি দেখান নাই। আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাস এত অস্পষ্ট যে ঠিক করিয়া কিছু বলা যায় না, তবে ভবভূতি নিরবধি কাল ও বিপুলা পৃথ্বীর কাছে যে আবেদন জানাইয়াছেন তাহার মধ্যে কালিদাস বা অন্য কোন সমসাময়িক কবি বা নাট্যকারের সাফল্যে অসূয়ার আভাস পাওয়া যায়। আধুনিক কালে দেখি, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সাহিত্যিক প্রতিপত্তিতে বঙ্কিমচন্দ্র ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন, রমেশচন্দ্র দত্তের মৃত্যুর পর শ্রীঅরবিন্দ যে প্রবন্ধ লিখেন তাহার মধ্যে সাহিত্যিক

মহানুভবতার পরিচয় নাই, সুলেখক দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 'আনন্দ-বিদায়' প্রহসনে রবীন্দ্রনাথকে ছোট করিতে যাইয়া নিজেকেই হেয় করিয়াছেন এবং এক পক্ষে প্রীতি ও অপর পক্ষে ভক্তির অভাব না থাকিলেও রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের সম্পর্ক কখনও সহজ হয় নাই।

সাহিত্যিকদের আত্মম্ভরিতা, লুব্ধতা, ধাপ্পাবাজি, সর্বোপরি দম্ভ ও মাৎসর্যকে কেন্দ্র করিয়া পরশুরাম তিনটি গল্প লিখিয়াছেন—'রামধনের বৈরাগ্য', 'বটেশ্বরের অবদান' ও 'দুই সিংহ'। ইহার মধ্যে 'রামধনের বৈরাগ্য' গল্পে বিশেষ উৎকর্ষ নাই। কাহিনীকে সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা হয়—আদি, মধ্য ও অন্ত্য। এই গল্পটির মধ্যভাগে পরশুরামের প্রতিভার ছাপ আছে, তবে তাহা অন্য প্রসঙ্গে আলোচিত হইবে। শেষাংশ অস্পষ্ট; এখানে পরশুরাম নিজেই তালগোল পাকাইয়া কোন রকমে উপসংহার করিয়াছেন। প্রথমাংশ বেশ জোরাল লেখা; কিন্তু তাহা গল্প অপেক্ষা প্রবন্ধের লক্ষণাক্রান্ত। তবে তাহা হইতে গ্রন্থকারের একটি বক্তব্য খুব সুস্পষ্ট হইয়াছে—সাহিত্যে আর্থিক সাফল্য আর শিল্পগত সার্থকতা এক বস্তু নয়। গ্রন্থকার নিজেই বলিয়াছেন, 'সাহিত্যে কালো-বাজার নেই, কিন্তু চোরা-বাজার আছে। রামধন বিলিতি ও আমেরিকান ডিটেকটিভ গল্প হইতে চুরি করিয়া গল্প লিখিতে লাগিলেন এবং গল্পগুলির খুব কাটতি হওয়ায় তাঁহার প্রচুর অর্থাগম হইল। কিন্তু এই সব গল্প নিকৃষ্ট রুচির লোকে পড়ে; সুতরাং রোজগার বাড়িলেও কালচার্ড সমাজে তাঁহার তেমন প্রতিপত্তি হইল না। ক্ষুব্ধ হইয়া রামধন প্রণয়ভিত্তিক মৌলিক উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং পৃথিবীব্যাপী সাহিত্যে সেক্স অ্যাপীল প্রাধান্য পায় দেখিয়া নরনারীর যৌন সম্পর্ককে কেন্দ্র করিয়া এক অভিনব উপন্যাসের পরিকল্পনা করিলেন। গল্পটি মাসিক পত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে লাগিল কিন্তু তিনি উপসংহারে পহুঁছিবার পূর্বেই এমন বিপর্যয় ঘটিয়া গেল যে লেখকবৃত্তি ছাড়িয়া তিনি গোপনে বিষ্ণুপ্রয়াগে এক সন্ন্যাসীর আশ্রমে আশ্রয় লইলেন।

সাহিত্যিকদের উপর বিদ্রূপ নিক্ষেপ করিয়া পরশুরাম আরও দুইটি গল্প লিখিয়াছেন—'বটেশ্বরের অবদান' ও 'দুই সিংহ'। এই গল্প দুইটি 'রামধনের বৈরাগ্য' অপেক্ষা অনেক ভাল; 'দুই সিংহ' যে কোন শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গপ্রধান গল্পের সঙ্গে তুলিত হইতে পারে। বটেশ্বর শিকদার ও দামোদর নস্কর গল্পসরস্বতী

বঙ্গ উপন্যাসের আকাশে দুই শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষ্ক এবং সেই কারণেই ইঁহারা প্রতিদ্বন্দ্বী এবং ইঁহাদিগকে কেন্দ্র করিয়া দুইটি সাহিত্যিক-দলও গড়িয়া উঠিয়াছে। ইঁহাদের প্রতিভা গল্প দুইটির বিষয় নয়, কারণ গ্রন্থকারের লক্ষ্য সাহিত্যিকের চরিত্র উদ্ঘাটন, তাঁহাদের প্রতিভার বিচার বা বিশ্লেষণ নহে। ইঁহাদের রচনায় শ্রেষ্ঠ শিল্পকলার ছাপ থাকিতে পারে ; আবার তাহা জনপ্রিয়, খদ্দের-ভোলানো গল্পও হইতে পারে। কিন্তু উভয় সাহিত্যিকেরই প্রধান চারিত্রিক দুর্বলতা আত্মম্ভরিতা। আর গ্রন্থব্যবসায়ে সাফল্য সাহিত্যিককে কত হেয় ও পরিহাসাস্পদ করিতে পারে তাহার সরস বর্ণনাও গল্প দুইটিকে সজীব করিয়াছে। 'বটেশ্বরের অবদান' গল্পে অনুপস্থিত দামোদরের অবদান যে একেবারে নাই তাহা নহে, তবে বটেশ্বরই প্রধান এবং তিনি কেমন করিয়া বেয়াকুব বনিয়া গেলেন তাহাই গল্পের বিষয়।

সাহিত্য স্রষ্টার সৃষ্টি হইলেও তাহার নিজস্ব সত্তা আছে এবং তাহার গতিও স্বকীয় নিয়মেই নিয়ন্ত্রিত হয়। স্রষ্টা ইচ্ছা করিলেই মধ্যপথে গল্পের গতি ঘুরাইতে পারেন না বা চরিত্রের পরিবর্তন করিতে পারেন না। বার্নার্ড শ' বলিয়াছেন যে, তিনি প্রচারধর্মী লেখক এবং সেইজন্য বিশেষ কোন আইডিয়া গ্রহণ করিয়া চরিত্র সৃষ্টি করেন এবং নির্ধারিত পথে চরিত্রগুলিকে চালিত করিতে চাহেন, কিন্তু খানিকক্ষণ পরেই অবাক হইয়া দেখেন, তাহারা যে যার মতে ও পথে অগ্রসর হইতেছে এবং তিনি আর তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিতেছেন না ('I have no more control over them than I have over my wife')! বটেশ্বর শিকদার মাসিক পত্রে একটি ধারাবাহিক গল্প লিখিতেছিলেন যাহার নায়িকা অলকা যক্ষ্মারোগগ্রস্তা। অন্যতম পাঠিকা অলকা রায়ও যক্ষ্মারোগে ভুগিতেছিল। সে নিজেকে উপন্যাসের নায়িকা অলকার সঙ্গে একাত্ম করিয়া ফেলিল। তাহার এই খেয়াল গোপন করিয়া পাঠকবর্গের প্রতিনিধি সাজিয়া অলকা রায়ের স্বামী এবং পরে আত্মীয় সঞ্জীব ডাক্তার বটেশ্বরের সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন গল্পের অলকা যেন বাঁচিয়া উঠে এবং গল্পটি যেন হাঁসপাতাল হইতে মুক্ত সুস্থ স্ত্রী এবং স্বামীর মিলনে পরিসমাপ্ত হয়। লেখকরা অর্থ ও যশ দুই-ই সমানভাবে কামনা করে। স্বীয় কল্পনাপ্রসূত চরিত্রকে পাঠকবর্গ জীবন্ত মানুষ বলিয়া মনে করিয়া এত উত্তেজিত হইয়াছে দেখিয়া বটেশ্বর খুবই উৎফুল্ল হইলেন। কিন্তু তাঁহার

আত্মম্ভরিতা গোঁড়ামিতে পরিণত হইল। তাঁহারা অর্থাৎ বড় লেখকরা ভগবানেরই অনুসরণ করেন ; তাঁহারা ট্রাজেডি ও কমেডি দুইই রচনা করেন ; তিনি উন্মাদ পাঠকদের কথায় কর্ণপাত করিবেন না এবং তাঁহার সংকল্পিত প্লট বদলাইবেন না। সুতরাং নায়িকা অলকার অবধারিত মৃত্যুতেই উপন্যাসের উপসংহার হইবে।

এমনি করিয়া বটেশ্বরের আত্মম্ভরিতা যখন ফাঁপিয়া একটা বিরাট বেলুনের আকার ধারণ করিয়াছে তখন সঞ্জীব ডাক্তারের স্ত্রী অনিলা ফিল্ম অ্যাকট্রেস কদম্বানিলা সাজিয়া উপস্থিত হইল এবং এই গল্পের সিনেমার স্বত্ব কিনিবার প্রস্তাব দিল। কদম্বানিলা নায়িকা অলকার ভূমিকা লইবে এবং বটেশ্বর গল্পের জন্য দশ হাজার টাকা পাইবেন আর সিনেমার মাধ্যমে প্রচারের মোহ তো আছেই। বটেশ্বর একটু টলিলেন, কিন্তু কদম্বানিলার অনুরোধেও প্লট বদলাইতে রাজি হইলেন না। এইবার ফাঁপানো বেলুনের ফাটিবার পালা। কদম্বানিলা ট্র্যাজেডির নায়িকা হইতে রাজি হইল না ; অনন্যোপায় হইয়া সে বলিল যে তাহা হইলে (বটেশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী) দামোদর নস্করের 'মানস-মরালী' উপন্যাসই তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। এই অব্যর্থ বাণে ধরাশায়ী হইয়া বটেশ্বর বলিলেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা ; অলকাকে বাঁচিয়েই রাখব .। অন্য কারও কাছে তোমাকে যেতে হবে না।··আমরা গল্প লিখিয়েরা হচ্ছি সর্ব-শক্তিমান্, কলমের খোঁচায় সৃষ্টি স্থিতি লয় করতে পারি।' একটা ধূর্ত মেয়ের পিনের খোঁচায় আত্মম্ভরিতার বেলুন যে চুপসিয়া যাইবে তাহা এই সর্বশক্তিমান লেখক পরে বুঝিতে পারিলেন। সর্বশক্তিমান হইলেও তিনি সর্ব্বজ্ঞ নহেন।

এই গল্পের কৃতিত্ব আরোহ-অবরোহের লুকোচুরি খেলা। ধাপে ধাপে বটেশ্বরের আত্মম্ভরিতা আকাশচুম্বী হইয়া উঠিয়াছে আর ধাপে ধাপে তাহা ধরাশায়ী হইয়াছে এবং সূর্যের আলোর মত এই সত্য স্পষ্ট হইয়াছে যে সাহিত্য বড়ই হউক আর ছোটই হউক সাহিত্যিক আর পাঁচজনের মতই সাধারণ ব্যক্তি ; বরং তিনি মায়ালোকে বাস করেন বলিয়াই তাঁহাকে সহজে ফাঁদে ফেলা যায়। 'বটেশ্বরের অবদান' সুললিত গল্প, কিন্তু শ্রেষ্ঠ গল্প নয়, কারণ ইহার মূলে রহিয়াছে একটা বাতিকগ্রস্ত রোগিণীর এমন একটা খেয়াল পাঠক সহজে যাহার সামিল হইতে পারে না। সাহিত্য বাস্তবের অনুকরণ করে না, কিন্তু তাহাকে সম্ভাব্য হইতে হইবে। সেই সম্ভাব্যতার অভাবের জন্য ইহা

সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য হইয়া উঠিতে পারে নাই। বাতিকগ্রস্তা অলকাকে পিছনেই থাকিতে হইয়াছে। এইখানেই এই গল্পের ত্রুটির সূত্র পাওয়া যায়। সব সময়ই দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিয়াছে বটেশ্বরের উপর; সেই জন্য অন্য চরিত্রগুলি বিকশিত হইতে পারে নাই এবং প্লটেও বিশেষ বৈচিত্র্য নাই।

'দুই সিংহ' একটি নিটোল, নিখুঁত গল্প; শুধু যে ইহার প্লট খুব সুগঠিত তাহাই নয়, তাহার মধ্যে প্রত্যাশিত ও অপ্রত্যাশিতের অপরূপ সম্মিলন হইয়াছে এবং স্বল্পপরিসর ছোট গল্প হইলেও ইহার ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দেয়। পরিবেশ অতি সাধারণ, কলিকাতা অথবা অন্য যে কোন শহরে এই জাতীয় ঘটনা ঘটিতে পারে অথচ এই গল্পে যাহা ঘটিল তাহা অতিশয় উদ্ভট ও বিস্ময়কর। একজন নিরীহ সেকেলে চালচলনের ধনী ব্যবসায়ীর বাড়িতে তাহার আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছেলে ও মেয়ে একটি সাহিত্যিক চা-চক্রের ব্যবস্থা করিল। ইহা খুব মামুলি ব্যাপার। কিছু বড় সাহিত্যিক, তাহাদের কিছু চেলা, দুই-চারজন সাংবাদিক ইহাতে নিমন্ত্রিত হইবেন তাহাও নিত্যনৈমিত্তিক প্রোগ্রামের অঙ্গ। এই সভায় দুই শ্রেষ্ঠ literary lion, ঔপন্যাসিক বটেশ্বর শিকদার ও দামোদর নস্কর, প্রধান অতিথি হিসাবে আমন্ত্রিত হইলেন; ইঁহাদের পরস্পরের প্রতি মনোভাব যাহাই থাকুক চা-চক্রে এক জায়গায় আসার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছুই নাই। সভাপতি রূপে আমন্ত্রিত হইলেন প্রবীণ সাংবাদিক অনুকূল চৌধুরী।

তিন প্রধানের জন্য তিনখানি ভাল চেয়ার আনা হইল; তাহাদের একখানি অন্য দুইটির তুলনায় ঈষৎ উৎকৃষ্ট। ইহার মধ্যেও বিস্ময়ের কিছু নাই বা গোলযোগের কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু একটি চেয়ারের এই সামান্য উৎকর্ষই তুলকালাম কাণ্ডের সূত্রপাত করিল। শেক্সপীয়রের হৃদয়বিদারক ওথেলো ট্র্যাজেডির মূলে ছিল ডেস্‌ডিমোনার রুমাল হারানো। এই কমেডিরও গোড়ায় আছে একটি চেয়ারের আপেক্ষিক শোভনতা। ইহা যতই তুচ্ছ হউক, ঠিক সন্ধিক্ষণে যে ভাবে ইহা গুরুত্ব লাভ করিল তাহা ডেস্‌ডিমোনার রুমালের গুরুত্বের সঙ্গে তুলনীয়। কমেডিতে তুচ্ছ বস্তুকে মর্যাদা দেওয়া হইলে তাহা সহজেই ব্যঙ্গের খোরাক যোগায়। কে প্রথম সারিতে বসিবে, যৌথ আবেদনে কাহার নাম কোথায় থাকিবে, এই জাতীয় তুচ্ছ ব্যাপারের উপরও যে কৌলীন্য নির্ভর করে তাহা আমরা প্রতিদিনই দেখিয়া থাকি। বটেশ্বর ও দামোদর

একই সময়ে আসিয়াছিলেন ; বয়সে বড় বলিয়া প্রধান উদ্যোক্তা বটেশ্বরকে ভাল চেয়ারটায় বসাইয়া দিলেন। ইহা অগ্নিতে ঘৃতাহুতির কাজ করিল। দামোদর-বাবু প্রথম একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সাফ জবাব দিলেন, 'ও চেয়ারে আমি বসতে পারি না।' ততক্ষণে উভয় পক্ষের মস্তানরা জড়ো হইয়াছে এবং তাহাদের জবরদস্তিতে দামোদর বাবু ভাল চেয়ারে বটেশ্বরবাবুর কোলেই তাঁহার আড়াইমণি বপু স্থাপন করিলেন! পর্বতশীর্ষ হইতে পর্বতগুহায় এক লাফেই পহুঁছান গেল—সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রলেপ যে কত লঘু তাহা প্রমাণিত হইল। ইংরেজিতে একটা প্রবচন আছে—Scratch a Russian and find a Tartar. অর্থাৎ সুসভ্য লোকের গায় একটু আঁচড় দিলেই বর্বরতা বাহির হইয়া আসে। দেখা গেল এই দুই সাহিত্যরথীর বেলায় সেই আঁচড়টুকুরও প্রয়োজন হয় নাই।

দামোদর নস্কর গল্পসরস্বতী নাক উঁচু করিয়া নিম্নস্তরের চেয়ারে বসিতে আপত্তি করিয়া যে কাণ্ড বাধাইয়া দিলেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দল যে যাহার পক্ষ লইয়া যে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল তাহা মাতালের আড্ডায় বা খেলার মাঠের হাঙ্গামা এমন কি রাজনৈতিক লড়াইকেও হার মানায়। একবার দুই বিশিষ্ট নাগরিককে দুই দল মেয়র নির্বাচন করিয়া একই চেয়ারে বসাইয়া-ছিলেন। কিন্তু সাহিত্যের অলৌকিক রসপূত, সৌন্দর্যময় জগতে এই দাঙ্গা-বাজি এমনই বেমানান অথচ বর্তমান ক্ষেত্রে এমন প্রত্যাশিত ও সুসঙ্গত যে ইহা অপূর্ব কমেডির সৃষ্টি করিয়াছে। প্রথমে দুই সাহিত্যিকের প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব যে ভাবে নিরূপণ করা হইল তাহা অ্যারিস্টফেনিসের নাটকে দাঁড়িপাল্লায় ওজন করিয়া ঈসকাইলাস ও ইউরিপিদিসের নাটকের মূল্যায়নের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। দামোদর গল্পসরস্বতী নিরুপাধিক বটেশ্বর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এই দাবী উত্থাপিত হইলে অমনি বটেশ্বরের বালখিল্য সাহিত্যিক ভক্তরা সর্বসম্মতিক্রমে নিখিলবঙ্গ সাহিত্যিকদের পক্ষ হইতে 'অত্র সভায় অস্মিন মুহূর্তে' বটেশ্বর শিকদারকে আরও জমকাল উপাধিতে ভূষিত করিল। প্রহসন এখানেই থামিল না। মধ্যযুগে বিবাদনিষ্পত্তির অন্যতম প্রথা ছিল দুই বীরের দ্বন্দ্বযুদ্ধ। আপাদমস্তক লৌহবর্মে আচ্ছাদিত করিয়া একজন তাঁহার লৌহহস্তাবরণ নিক্ষেপ করিতেন। ইহাই প্রতিপক্ষকে প্রাণঘাতী দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান। প্রতিপক্ষ উহা তুলিয়া লইলেই সম্মুখসমরে জয়পরাজয়ের মধ্য দিয়া বিতর্কের অবসান হইত।

শেক্সপীয়রের ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডি দ্বিতীয় রিচার্ড শুরু হইয়াছে এইরূপ কালান্তক দ্বন্দ্বযুদ্ধের প্রস্তুতির গুরুগম্ভীর বর্ণনা দিয়া। পরশুরামের মনে এই দৃশ্যটি উপস্থিত ছিল কি না জানি না। কিন্তু বটেশ্বরের প্রধান সমর্থক সম্পাদক গৌরচাঁদ সাঁপুই তাহাদের দাবীর সমর্থনে অতি তুচ্ছ হাতিয়ারের সাহায্যে মল্লযুদ্ধের আহ্বান জানাইয়া এবং অস্ত্রনির্বাচন বিষয়েও খুব মহানুভবতা দেখাইয়া বলিল, 'আমার দস্তানা নেই, এই বাঁ পায়ের মোজাটা খুলে ফেলে চ্যালেঞ্জ করছি, আমার সঙ্গে যে লড়তে চায় সে মোজা তুলে নিক। সবতাতে আমি রাজি আছি—ঘুষি, গাট্টা, লাটি, থান ইট, যা চাও।' প্রতিপক্ষ এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ না করিয়া দামোদরের আড়াইমনি বপুকে তুলিয়া ধরিয়া বৃদ্ধ বটেশ্বরের কোলের উপর বসাইয়া দিল !

এই মহাসংকটের অবসানের পথ কাহারও মনে আসিল না। কেহ পুলিসে খবর দেওয়ার কথা বলিলেন, গৃহস্বামীর পুত্র সুমন্ত প্রস্তাব করিল যে ফায়ার ব্রিগেড আসিয়া হোজ পাইপ দিয়া জলের তোড় গায়ে ফেলিলে দুই সিংহ ও অনুবর্তী শেয়ালরা যথোচিত শিক্ষা পাইবে, কিন্তু তাহার বোনের উপস্থিত বুদ্ধিতে কমেডি চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করিল। সরস্বতীর বরপুত্রদের এই হাস্যকর এবং প্রায় মারাত্মক দ্বন্দ্বের উপযুক্ত পট-ভূমিকায় রহিয়াছে সরস্বতী পূজার পাণ্ডাল। এই পূজাও প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়। তথাকথিত পূজা শেষ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ফুর্তি জিয়াইয়া রাখিবার জন্য তিন দিন পর বিসর্জনের ব্যবস্থা হইয়াছে। পূজার নির্বাণোন্মুখ প্রহসন এই সদ্য রচিত প্রহসনকে সঞ্জীবিত করিল আর মনে রাখিতে হইবে উভয় প্রহসনের নায়করা সবাই যে যার পথে বাণীর উপাসক ! বিসর্জনের প্রধান উদ্যোক্তা ক্লাবের সেক্রেটারি প্রাণধন নাগ মা সরস্বতীকে একটু ওয়েট করিতে নির্দেশ দিয়া লরি ও বাছাই জন চারেক মস্তান সহ সাহিত্যসভায় উপস্থিত হইল। তখনও কিন্তু পাণ্ডালে মাইকে গান বাজিতেছে—'অত কাছা-কাছি বঁধু থাকা কি ভালো—ও-ও'। এই মস্তানরা নিজেরাও হাস্যরসিক। যখন চেলাদের সমর্থনপুষ্ট দুই সিংহ ইহাদের অনুরোধে চেয়ার ছাড়িলেন না, তখন ইহারা বিসর্জনের লরিতে চেয়ারসুদ্ধ সাহিত্যমহারথীদ্বয়কে তুলিয়া লইয়া সোজা আলিপুর চিড়িয়াখানায় রাখিয়া আসিল। সাহিত্যসভা এবং সরস্বতী পূজা হইতে আলিপুরের চিড়িয়াখানা—অ্যান্টি-ক্লাইমেক্স বা ভাবাবরোহের এইরূপ দৃষ্টান্ত

বিরল। ক্লাবের সেক্রেটারি উপন্যাস-সম্রাটদের ড্রাইভারদের নির্দেশ দিয়া রাখিয়াছিল যে আধ ঘণ্টা পরে তাহারা যে যার মনিবকে তুলিয়া লইয়া যাইবে। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের একটা লক্ষণ এই যে, সুসঙ্গত উপসংহার হইলেও পাঠকের মনে একটা রেশ থাকিয়া যায়, তাহার মনে জিজ্ঞাসা উদ্রিক্ত হয়। এই শিল্পগুণই শরৎচন্দ্র এই বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে, লেখার চেয়ে না লেখার আর্ট বড়। 'ঘাবড়াবেন না, আপনাদের ড্রাইভারদের বলা আছে তারা আধ ঘণ্টার মধ্যে মোটর নিয়ে এসে পড়বে। ততক্ষণ আপনারা একটু গল্প-গুজব করুন, দুটো সুখ-দুঃখের কথা কন।'—জয়হিন্দ ক্লাবের সেক্রেটারি তো এই কথা বলিয়া খালাস। কিন্তু পাঠকের মনে একটা প্রশ্ন বারংবার ধ্বনিত হইবে : সেই আধ ঘণ্টা চিড়িয়াখানার সামনে দুই সিংহ মুখোমুখি (বা পাশাপাশি দাঁড়াইয়া কি ভাবে কাটাইলেন ?

(৭)

কতকগুলি গল্পে পরশুরাম সাধারণভাবে সামাজিক অসাধুতা, কালোবাজারি, চোরাবাজারিকে কশাঘাত করিয়াছেন। এখানে কোন বিশেষ শ্রেণী বা সম্প্রদায় তাঁহার বিদ্রূপের লক্ষ্য নয়। এই রকম তিনটি গল্পের আলোচনার দ্বারা তাঁহার কলাকৌশলের উপর আলোকসম্পাত করা যাইতে পারে। 'বদন চৌধুরীর শোকসভা'য় তিনি এক মজার পরিস্থিতি রচনা করিয়াছেন। মৃত বদন চৌধুরীর প্রেতাত্মা যমরাজের নিকট হইতে ছুটি লইয়া তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য আহূত শোকসভায় উপস্থিত হইলে অশরীরী প্রেত বলিয়া তাঁহাকে কেহ চিনিতে পারিল না। আবার তাঁহার প্রধান শত্রু মৃত সাংবাদিক ঘনশ্যাম ঘোষাল অনুরূপভাবে সেই সভায় উপস্থিত হইলেন। ইঁহারা দুইজন সকলের অলক্ষিতে সভাপতি ও প্রধান বক্তার মনের ভিতরে প্রবেশ করিয়া পরস্পরের প্রতি বিষ উদ্গীরণ করিলেন। ইহাই প্লট এবং ইঁহারাই প্রধান চরিত্র। সুতরাং এই গল্পটিকে গল্পাকারে লিখিত জোরাল প্রবন্ধ বলা যাইতে পারে। কিন্তু গ্রন্থকার সুকৌশলে মধুরেণ সমাপয়েৎ নীতি অনুসরণ করিতে পারিয়াছেন—অতি সাধারণ শ্রোতা রামলাল সিংঘি ও প্রেততত্ত্ববিশারদ হারাধন দত্তের মন্তব্য জুড়িয়া দিয়া। সভা পণ্ড করিয়া প্রেতরা চম্পট দিলেই যে দুই বক্তার উপর তাঁহারা ভর

করিয়াছিলেন—সভাপতি গোবর্ধন মিত্র ও প্রধান বক্তা আঙ্গিরস গাঙ্গুলী—মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং উপস্থিত একজন ডাক্তারের চিকিৎসায় সুস্থ হইলেন। হারাধন দত্ত ঠিক ধরিতে পারিয়াছিলেন যে ইহা প্রেতের ঝগড়া এবং তিনি প্রেতের কুদৃষ্টির প্রতিষেধক হিসাবে কানে তুলসীপাতা দিতে সবাইকে উপদেশ দিলেন। যণ্ডা গোছের রামলাল সিংঘি মোটাবুদ্ধির লোক; নিজে মদ্যপ, সে এলোমেলো বক্তৃতা ও তৎপর পতন ও মূর্ছা দেখিয়া সহজ সিদ্ধান্ত করিল যে বরেণ্য বক্তারাও—একজন অবসরপ্রাপ্ত জজ আর একজন নামী অধ্যাপক—মাতাল হইয়া সভায় আসিয়া বিশৃঙ্খল চেঁচামেচির দ্বারা এই কেলেঙ্কারী করিয়াছেন। তাহার অনবদ্য বক্তব্যের অংশবিশেষ উদ্ধার করা যাইতে পারে—'দুজনেই বেশ টেনে এসেছেন ··। বদন চৌধুরী মরেছে, সবাই মিলে শোকসভা করছিল, এ তো বহুত আচ্ছা। তোরা গান শুনবি, নাচ দেখবি, দুটো হা-হুতোশ করবি, বুক চাপড়ে কেঁদে ভাসিয়ে দিবি, আউর ভি আচ্ছা। কিন্তু একি কাণ্ড, দু' হাজার লোকের সামনে মাতলামি করছিস! আরে ছ্যা ছ্যা! আমরা যা করি নিজের আড্ডায় করি, সভায় দাঁড়িয়ে এমন বেলেল্লাপনা করি না।' সেন্স ও ননসেন্সের এমন সমাবেশ কদাচিৎ দেখা যায়!

'উৎকোচ-তত্ত্ব' গল্পটিতে অসাধু মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী এবং তাঁহার বাঙ্গালী অনুচরের জজকে ঘুষ দেওয়ার চেষ্টার কাহিনী বলা হইয়াছে। যে জজ ইঁহাদের লক্ষ্য তিনি ঘুষ নেন নাই এবং ইঁহারাও শেষ পর্যন্ত পিছাইয়া গিয়াছেন। সুতরাং মূল গল্পটি সফল হয় নাই। প্রারম্ভে গ্রন্থকার কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন, মাছ কখন জল খায় এবং রাজপুরুষ কখন ঘুষ নেয়, জানা যায় না। কিন্তু এই তত্ত্বই যদি গল্পের অভিপ্রেত বিষয়বস্তু হইয়া থাকে, তবে তাহা সার্থক হয় নাই। কারণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, স্বাধীনতা, দেশবিভাগ প্রভৃতি যুগান্তকারী ঘটনায় রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে যে তোলপাড় হইয়াছে তাহার ফলে কালোবাজার ফাঁপিয়া উঠিয়াছে এবং বিচারকসম্প্রদায়ও তাহার প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিবেন না, খানিকটা জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে তাহার শিকার হইবেন, ইহা অবিশ্বাস্য নয়। কিন্তু এই গল্পের বিচারক লোকনাথ পাল হুঁশিয়ার লোক, স্ত্রীর লোভ তাঁহার ধর্মবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। উৎকোচদাতাও তাঁহার অনুরোধ প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছেন এবং সানন্দে উৎকোচের অর্ধমূল্য ফেরত লইয়াছেন। কিন্তু এই গল্পে প্রাণ

সঞ্চার করিয়াছে ডাক-সম্পর্কের পিসেমশায় মোহিত সমাজদারের গায়ে পড়া সহৃদয়তা যাহা জলোচ্ছ্বাসের মত সকল বাধা ভাসাইয়া লইয়া যাওয়ার উপক্রম করিয়াছিল। শুধু সহৃদয়তার আতিশয্যই তেমন বিস্ময়কর নয়, যাহারা এইরূপ দালালি করে তাহারা এই জাতীয় বেহায়াপনা ও বাক্‌পটুতায়ও নৈপুণ্য অর্জন করিয়া থাকে। কিন্তু গল্পের শেষে অতর্কিতে যে তথ্যটি উদ্‌ঘাটিত হইল তাহা তাঁহার চরিত্রের সঙ্গে সুসঙ্গত হইলেও এইরূপ আবিষ্কারের জন্য গ্রন্থস্থ পাত্রপাত্রীরা এবং পাঠকবর্গ কেহই প্রস্তুত থাকিতে পারে না। তিনি যে ঘুষের উপর ঘুষ লইবেন ইহা স্বয়ং পাচাড়ীও বুঝিতে পারেন নাই। শেষের এই তুলির টানে মোহিতবাবুর চরিত্র পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে এবং গল্পটিও সজীব হইয়া উঠিয়াছে।

উপরে যে দুইটি গল্পের আলোচনা করা হইল 'নীলকণ্ঠ' তাহাদের অপেক্ষা ভাল। আজকাল সব জিনিসে ভেজাল—তেলে ভেজাল, তণ্ডুলে ভেজাল, মসলায় ভেজাল, ওষুধে ভেজাল এম্‌নি কত কি। এই তালিকাকেই দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর করিয়া পরশুরামের দুঃসাহসী উদ্ভাবনী শক্তি দুইটি কল্পনাবহির্ভূত বস্তুতে ভেজাল প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়াছে—বৌয়ে ভেজাল আর বিষে ভেজাল। গল্পের নায়ক নীলকণ্ঠ তরফদার ভেজাল বিষ গলাধঃকরণ করিয়া সুস্থ থাকায় সার্থকনামা হইলেন আর বন্ধুর সাহায্যে বৌয়ে ভেজালের দৌরাত্ম্য হইতে মুক্তি পাইলেন। নীলকণ্ঠ ছিটগ্রস্ত লোক, তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় কাটাইয়াছেন বাংলার বাহিরে মধ্যপ্রদেশের নিভৃত অপরিচিত সমাজে। সুতরাং বিবাহ ব্যাপারে তিনি আত্মীয়দের কবলে পড়িবেন ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। গ্রন্থকার এই পরিবেশ রচনা করিয়াছেন বৌয়ে ভেজাল অর্থাৎ ছেলেকে মেয়ে বলিয়া চালাইবার কাহিনীটিকে বিশ্বাসযোগ্য করিয়া তোলার জন্য। কিন্তু তাঁহার এই চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয় নাই। চক্ষুষ্মান্ ডাক্তার বঙ্কিম পাল তাঁহার বন্ধু এবং তাঁহারই গৃহে তিনি অতিথি। তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া হেবো 'নম নম' করিয়া একটা ছেলের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ সারিয়া ফেলিল এবং এই সূত্রে তিনশ টাকা আত্মসাৎ করিয়া পুরুষ বৌয়ের খোরপোষ বাবদ আরও পঞ্চাশ টাকা দাবি করিবে ইহা বিশ্বাসযোগ্য নয়। কিন্তু ডাক্তার বঙ্কিম পাল বন্ধুকে এক শিশি বিষ তৈরি করিয়া দিয়া আত্মহত্যা করিতে লেকে পাঠাইয়া দিলেন এবং সেই তীব্র বিষ গিলিয়া বন্ধু সুস্থ সবল থাকিয়া আবিষ্কার করিলেন

যে ভেজালের রাজ্যে কাহাকেও বিশ্বাস করা যায় না, পরম বন্ধুও বিষের পরিবর্তে শরবৎ তৈরি করিয়া বন্ধুকে আত্মহত্যার গণতান্ত্রিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন! ভজুমামার উপস্থিতিতে শেষের অংশ আরও বেশি উপভোগ্য হইয়াছে। হেবোর কাছে নীলকণ্ঠকে প্রতারণার সংবাদ পাইয়া তিনি সশরীরে কলিকাতায় আসিয়া আসর জমাইতে চাহিয়াছেন। হেবো অতটা সাহস পায় নাই। পরিসর খুব ছোট হইলেও ইঁহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, চট্‌পটে গতি এবং অদম্য আত্মবিশ্বাসের মধ্যে স্বয়ং স্যার জন ফলস্টাফের আদল আছে। হেবোর কাছে নীলকণ্ঠের বিবাহের ইতিহাস শুনিয়া উত্তম শিকারের সন্ধানে তিনি কলিকাতায় আসিয়া পড়িলেন, কিন্তু আসিয়াই একটু হতাশ হইলেন, কারণ শুনিতে পাইলেন যে, নীলকণ্ঠের মৃত্যু হইয়াছে। হেবোর বর্ণনানুসারে তিনি মর্গে লাশ সনাক্ত করিয়া গৃহস্বামী বঙ্কিম পালের বাড়িতে ছুটিয়া আসিলেন। তিনি সহজেই অপরিচিত লোকের মধ্যে নিজেকে মৃত বেওয়ারিশ নীলকণ্ঠের অকৃত্রিম মামা বলিয়া স্বীকৃতি পাইবেন। তাহা হইলে পরলোকগত ভাগ্নের পরিত্যক্ত সম্পত্তির দাবীদারও হইতে পারিবেন—বোধ হয় ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। শেষের দৃশ্যে তাঁহার প্রতিপক্ষ তিনজন—পূর্বরাত্রির ভেজাল বিষপানের সাক্ষী সুশীলবাবু, গৃহস্বামী ডাক্তার বঙ্কিম পাল আর একাধারে আসামী-ফরিয়াদী নীলকণ্ঠ নিজে। ইঁহাদের মনোভাবের বিভিন্নতা অপরূপ প্রহসনের সৃষ্টি করিয়াছে। নীলকণ্ঠ নানাভাবে বিপর্যস্ত হইয়া পূর্ব-রাত্রিতেই বিষপানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সুতরাং মরিবার মতলবটা ছাড়িয়া দিলেও মৃত্যুর বিভীষিকা এখনও তাঁহার মন হইতে বিদূরিত হয় নাই। কাজেই উৎকণ্ঠ আগ্রহেই তিনি ভজুমামার কাহিনী শুনিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'পুনর্জন্ম' প্রহসনের যাদবের মত ভাবিতেছিলেন তিনি জীবিত কি মৃত, বহুদর্শী বঙ্কিম পাল সমস্তই জানেন, কাজেই তিনি পুলিসে খবর দিয়া এই জুয়াচোরকে শায়েস্তা করিতে মনস্থ করিলেন আর সুশীলবাবু নির্বাক বিস্ময়ে ভজুমামার এই বেহায়াপনা পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। অপরিচিত শ্রোতাই নীলকণ্ঠ এই কথা শুনিয়া ভজুমামা কিছুমাত্র অপ্রতিভ হইলেন না এবং নীলকণ্ঠর উপর তাঁহার দাবী আরও বাড়াইয়া দিলেন। ভাগ্নের প্রাণরক্ষার জন্য কালীবাড়িতে পূজা দেওয়ার জন্য ভাগ্নের নিকট টাকা চাহিলেন, তাঁহার নিজের ভাগ্নের ব্যাপারে সুশীলবাবুকে নাক গলাইতে নিষেধ করিলেন এবং নিঃসম্পর্কিত

বঙ্কিম পালের বাড়ি হইতে তাঁহাকে নিজের হেফাজতে লইয়া যাইতে চাহিলেন। আর এই সমস্ত ব্যাপারের মধ্যে তাঁহার সতর্কতা একটুও শিথিল হয় নাই। বঙ্কিম পাল, সুশীলবাবু, দরওয়ান, পুলিস—সকলকে ফাঁকি দিয়া এই চটপটে লোকটি নিঃশব্দে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

পরশুরামের ব্যঙ্গবিদ্রূপ সবচেয়ে তীক্ষ্ণ, তীব্র অভিব্যক্তি পাইয়াছে 'ধনুমামার হাসি' গল্পে। এই হাসি বিকট, উৎকট; ইহার মধ্যে মাধুর্যের লেশমাত্র নাই। ভোলা ইহাকে শেয়ালের খ্যাঁক খ্যাঁক আওয়াজের সঙ্গে তুলনা করিয়াছে; মনে রাখিতে হইবে ইংরেজি সিনিক শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কুকুরসদৃশ। গল্পের নায়ক ধনুমামার কিশোর বয়সে যে অভিজ্ঞতা হইয়াছিল তাহা তাহাকে জোনাথান সুইফটের মত বিশ্বনিন্দুকে পরিণত করিয়াছিল। গ্রন্থকারের অভিপ্রেত ছিল কিনা বলিতে পারি না; সিনিক সুইফটের সঙ্গে হাবুলচন্দ্র ওরফে ধনুমামার বেশ সাদৃশ্য আছে। সুইফট স্কুলকলেজে বিশেষ লেখাপড়া করেন নাই; দুরন্ত অমনোযোগী ছেলেকে গ্রেসে পাস করাইয়া দিয়া ডাব্লিনের ট্রিনিটি কলেজ নিষ্কৃতি পায়। তারপর তিনি প্রখ্যাত বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ্ স্যার উইলিয়ম হ্যামিলটনের গৃহে পরিচারক—নামে সেক্রেটারি —রূপে প্রবেশ করেন। সেখানে তখনকার দিনের বড় বড় পলিটিসিয়ানদের আনাগোনা হইত। সুইফট ছিলেন ইঁহাদের মূর্খতা ও শঠতার নির্বাক সাক্ষী এবং এইখানে বড় রাজনৈতিক নেতাদের চরিত্র ও বুদ্ধির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে তাঁহার সহজাত বিশ্বনিন্দাবাদ পরিপুষ্ট হয়। তিনি এই সময় একটি মন্তব্য করিয়াছিলেন, 'কত কম জ্ঞানের দ্বারা জগৎ সংসার শাসিত হইতেছে।' এই সময় অর্থাৎ তিনি যখন হ্যামিলটনের পরিবারে আশ্রয় লয়েন, তখন তাঁহার বয়স একুশ। অনাথ হাবুলচন্দ্র বিশেষ লেখাপড়া শিখেন নাই; উনিশ বৎসর বয়সে পাঁচ টাকা বেতনে মস্ত কারবারী গয়াপ্রসাদ প্রয়াগদাস কোম্পানীর কর্ণধার বুদ্ধিচাঁদের খাস আরদালী হইয়া হাবাগোবার মত ম্যানেজারের ঘরের সামনে বসিয়া থাকিত এবং কোথায় কি হইতেছে শ্যেন দৃষ্টিতে দেখিতে পাইত। কিছুদিনের মধ্যেই সে বুঝিতে পারিল যে বুদ্ধিচাঁদ 'তুখর লোক' 'কিন্তু হাতটান আছে, ফার্মের টাকা সরিয়ে থাকেন, জুয়া খেলেন, নেশা করেন, অন্য দোষও আছে।'

অন্য দোষের কথা গ্রন্থকার অতি কৌশলে ইশারায় বর্ণনা দিয়াছেন, কিন্তু

সেই ইশারা প্রত্যক্ষ বর্ণনা হইতে বেশি তাৎপর্যময়। মালিক প্রয়াগদাস ব্যাতে পঙ্গু, বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ। আগের পক্ষের কয়েকটি সন্তান আছে, আর আছে দ্বিতীয় পক্ষের (নিঃসন্তান) স্ত্রী ; অনুমান করা যাইতে পারে যুবতী। পঙ্গু প্রয়াগদাসের কারবারের ভার ছিল খুড়তুতো ভাই বৃদ্ধিচাঁদের উপর ; তাঁহার বয়স তিরিশের নীচে এবং স্ত্রীবিয়োগের পর তিনি আর বিবাহ করেন নাই। ইহা হইতেই ভাবীজী অর্থাৎ পঙ্গু প্রয়াগদাসের দ্বিতীয় পক্ষের তরুণী স্ত্রী এবং অল্প বয়সের বিপত্নীক দেবরের গোপন সম্পর্কের আভাস পাওয়া যায়। পরে এই ইঙ্গিত আরও স্পষ্ট হয়, যদিও গ্রন্থকার এই অবৈধ সম্পর্ককে সুকৌশলে ব্যঞ্জনার সাহায্যেই প্রকাশ করিয়াছেন।

এই লব্ধপ্রতিষ্ঠ কারবারের সালতামামির দিন খদ্দেররা বছরের দেনা চুকাইয়া যায়। সেই দিন চেক ও খুচরা টাকা বাদ দিলে শুধু নোটেই লক্ষাধিক টাকা জমা পড়িল এবং বৃদ্ধিচাঁদ এই টাকা লইয়া রাত্রির গাড়িতে পলায়ন করিবার মনস্থ করিলেন। কিন্তু তাঁহার আসন্ন স্থান ত্যাগের কথা অফিসের কেহই জানিত না। অবশ্য মনে হয় ভাবীজী কিছুটা জানিতেন। যাওয়ার সময় হাবুলচন্দ্রকে তিনি বলিলেন যে বহরমপুরে তিনি ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিতে যাইতেছেন। পরের দিন সকালে এই কথা শুনিয়া অফিসের বড়বাবু মন্তব্য করিলেন, 'বহুত তাজ্জব কি বাত!' ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে শহরে হৈ হৈ কাণ্ড, পুলিস ও উকিলে অফিস ঘর ঘেরাও হইল। এই হৈচৈয়ের মধ্যে কেহই লক্ষ্য করিল না যে চোরের উপর বাটপাড়ি করিয়া হাবাগোবা হাবুলচন্দ্র নোটের বাণ্ডিল সরাইয়া ফেলিয়াছে এবং সেও অবসর বুঝিয়া চম্পট দিয়াছে। বৃদ্ধিচাঁদ, পুলিস, মালিক প্রয়াগদাস ও তাঁহার উকিলকে ফাঁকি দিয়া গা-ঢাকা দিয়া সে কলিকাতায় নিখোঁজ হইল।

আরও একটি জিনিস হাবুলচন্দ্র ছাড়া কেহ জানিত না। বৃদ্ধিচাঁদের অন্তর্ধানের একটু আগেই গাড়ি করিয়া ভাবীজী গোপনে তাঁহার সঙ্গে দেখা করেন। তখন রাত্রি এগারটার ট্রেনের সময় হইয়াছে। বৃদ্ধিচাঁদ একটু বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'আঃ, আসবার সময় পেলেন না ; এত রাত্রে টাকা চাইতে এসেছেন।' এই বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন এবং ইহাতেই লুঠের মাল হাবুলচন্দ্রের জিম্মায় চলিয়া আসিল। কিন্তু ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে

আর কেহ না জানুক ভাবীজী বুদ্ধিচাঁদের পলায়নের কথা জানিতেন এবং বুদ্ধিচাঁদ মুখে যাই বলুন, ভাবীজীকে বিদায় করিতে যাওয়ার সময় কিন্তু টাকা সঙ্গে করিয়া নিলেন না। সুতরাং ভাবীজীকে টাকা দিয়া বিদায় করার কথাটা শুধু হাবুলচন্দ্রকে ধোঁকা দেওয়া। ইঁহাদের মধ্যে অল্প সময়ের জন্য কি আলাপ-আলোচনা হইয়াছিল তাহার কোন আভাস নাই। তবে সন্ধিক্ষণে এই গোপন সাক্ষাৎকারের মধ্যে প্রৌঢ় পঙ্গু স্বামীর দ্বিতীয় পক্ষের যুবতী ভার্যা এবং অন্য দোষে দোষী বুদ্ধিচাঁদের সম্পর্ক প্রতীয়মান হইয়া উঠে। পরে বুদ্ধিচাঁদ ফেরার অবস্থায় হরিদ্বারে ধরা পড়েন এবং ভাবীজীর অনুরোধেই প্রয়াগদাস তাঁহার বিরুদ্ধে মামলা তুলিয়া নেন।

এই অল্পদিনের অভিজ্ঞতায় হাবুলচন্দ্র চোখ কান খাড়া রাখিয়া যাহা দেখিল ও শুনিল এবং নিজে করিল তাহাতে তাহার সহজাত বুদ্ধি শাণিত হইল, প্রচলিত বিশ্বাস চুরমার হইয়া গেল এবং ভীরুতা দুঃসাহসে পরিণত হইল। সততা, সতীত্ব, বিশ্বস্ততা, কৃতজ্ঞতা, পারিবারিক জীবনের বিশুদ্ধতা—এই সব আদর্শ যে কত মেকী, প্রলোভনের সম্মুখে কত সহজে ভাসিয়া যায়, ইহা দেখিয়া সে সিনিক বা অসূয়ক হইয়া উঠিল। হাবুলচন্দ্রের মধ্য হইতে ধনঞ্জয় দত্ত বাহির হইয়া আসিলেন। এই সব আদর্শে বুদ্ধিচাঁদও বিশ্বাস করিতেন না; এই সভ্য, সফল, ব্যবসায়ী এবং সংযমী তরুণ বিপত্নীক ব্রহ্মচারীর অন্তরালে পরস্বাপহারী, পরস্ত্রীলুব্ধ, কামুক জুয়াচোর দিন দিন 'বৃদ্ধি' পাইতেছিল। তাঁহার খ্যাঁকশেয়ালীর মত খ্যাঁক খ্যাঁক হাসি বিশ্বের প্রতি অশ্রদ্ধাই প্রকাশ করিত। ভাবীজীর সঙ্গে তাঁহার শেষ যে কি 'বখেরা' হইয়াছিল তাহা গ্রন্থকার ইচ্ছা করিয়াই স্পষ্ট করেন নাই। সুইফট যেমন স্টেলা ও ভ্যানেসা নাম্নী দুইটি রমণীকে ফাঁকি দিয়াছিলেন হয়ত ইনি ভাবীজীকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া নূতন পথের সন্ধানে বাহির হইতেছিলেন কিন্তু হাবুলচন্দ্রের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের কাছে এই অতি বুদ্ধিমান ব্যবসায়ী পরাস্ত হইয়া গেলেন।

ধনুমামা কিন্তু খাঁটি সিনিক বা প্রচলিত আদর্শে অবিশ্বাসী দার্শনিক হইলেন। দার্শনিক হইলেন বলিয়া জাগতিক শ্রীবৃদ্ধি সম্পর্কেও তাঁহার বিশ্বাস চলিয়া গেল এবং চোরের উপর বাটপাড়ি করিয়া যে ধন তিনি অর্জন করিয়াছিলেন তাহা নিজেও ভোগ করিলেন না অপরের ভোগেও আসিতে দিলেন না : প্রয়াগদাসকে ফেরত দেওয়ার কথা তাঁহার মনে আসিল না, কোন সৎকাজে ব্যয়ের কথাও

তিনি ভাবিলেন না, এই বিপুল ধনসম্পত্তি তিনি যক্ষের ভাণ্ডারের মত আগলাইয়া রাখিলেন অথচ সম্পূর্ণ অকেজো করিয়া দিলেন। ইঁহার জীবনের এই শেষ অধ্যায় সিনিসিজম্ বা বিশ্ব-অসূয়ারই পরিচয় দেয়। ভোলার মা নন্দরানী ইঁহার অতি দূর সম্পর্কের আত্মীয়া—তাঁহার পরলোকগতা স্ত্রীর ভাইয়ের দৌহিত্রী। তিনি বুড়োকে সেবা করিতে প্রলুব্ধ হইয়াছেন সহজে বুড়োর বিরাট ধনসম্পত্তি হস্তগত করার আশায়। মানুষের খারাপ দিকই যিনি দেখিয়াছেন তিনি নন্দরানীকে মিথ্যা প্রলোভন দেখাইতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই ; ভোলাকেও তিনি বলিয়াছেন, 'তোমার মাকে অনেক টাকা দিব, আমার খুব সেবা করছে কি না।' কিন্তু দিলেন মাত্র স্বোপার্জ্জিত দু'শ টাকা ; পারিশ্রমিক হিসাবে ইহা খুব কম নহে, কারণ ভোলার মা নিজে যাই বলুক গল্প আরম্ভ হওয়ার দশদিন আগে 'ধন্নুমামা' ভোলাদের বাড়িতে পদার্পণ করেন এবং ইহার সত দিন পর তিনি মারা যান। এই সতের দিনের খাওয়াদাওয়ার ও আনুষঙ্গিক দেখাশোনার পারিশ্রমিক হিসাবে ইহা যথেষ্ট। কিন্তু ভোলার মার লোভ ছিল অনেক, অনেক বেশি এবং ইহাকেই ব্যঙ্গ করিয়া তিনি লিখিয়া রাখিয়া গেলেন, 'ইহাই যথেষ্ট, স্ত্রীলোকের অধিক লোভ ভাল নহে।' স্মরণ রাখিতে হইবে এই বিশ্ববিদ্বেষী টাকা চুরি করিলেও, নিজে তাহা ভোগ করেন নাই। আশাভঙ্গের আধিক্যে ভোলার মা বলিয়া উঠিলেন, আমাকে না হয় ফাঁকি দিলি, দান ধ্যানের জন্যও তো রেখে যেতে পারতিস। কিন্তু অনুমান করি ধন্নুমামা ভাবিয়া থাকিবেন যে, দানধ্যান করিলেও সেই অর্থ তো বৃদ্ধিচাঁদ, ভাবীজী ও নন্দরানীদের মত লোকেদেরই ভোগে আসিত।

এইরূপ সংক্ষিপ্ত, সংহত, তীব্র বিদ্রূপে পূর্ণ গল্প যে কোন সাহিত্যে বিরল। ইহাতে কোথাও কোন অবান্তর কথা নাই। ইহার প্রত্যেকটি উক্তি তাৎপর্যপূর্ণ। প্রত্যেকটি ইঙ্গিত ব্যঞ্জনাময়। ধন্নুমামার হাসিতে কোথাও সহানুভূতির রেখা নাই।

পৌরাণিকী

(১)

সকল দেশেই কতকগুলি পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত থাকে। আমাদের দেশে এই জাতীয় কাহিনীর প্রচার ও প্রভাব খুব বেশি। এমন কি অতি আধুনিক কালে মহাত্মা গান্ধী যখন স্বরাজের জন্য সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন তখনও তাঁহার দৃষ্টি গেল পিছনের দিকে ; তিনি বলিলেন, ত্রেতা যুগের রামরাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ভারতবর্ষে বহু পরিবর্তন হইয়াছে, বহু বিপ্লবে ইহার ইতিহাস বিপর্যস্ত হইয়াছে ; বহু বিদেশী সভ্যতার অভ্যাগমে এই দেশ আন্দোলিত হইয়াছে, কিন্তু পৌরাণিক কাহিনীর সজীবতা হ্রাস পায় নাই। অথচ আধুনিক কালের মাপকাঠিতে পৌরাণিক কাহিনী বিচার করিলে অথবা আমাদের জীবনে পৌরাণিক কাহিনীকে আনিলে নানা অসঙ্গতির সম্মুখীন হইতে হইবে। পরশুরাম বাস্তববাদী, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন, যুক্তিনিষ্ঠ সাহিত্যিক। পৌরাণিক কাহিনীতে তাঁহার গভীর প্রবেশ ছিল। সুতরাং পৌরাণিক ও আধুনিকের সংমিশ্রণে যে বৈপরীত্যের বা অসঙ্গতির আস্বাদ পাওয়া যায়, দেবতা বা ঋষিদিগকে সাধারণ মানুষের মানদণ্ডে বিচার করিলে যে ভাবাবরোহ বা অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্সের উদ্ভব হয় তাহা তাঁহার প্রতিভাকে স্পন্দিত করিয়াছে। কোন কোন গল্পে পৌরাণিক কাহিনী বা চরিত্র অনেকটা অলংকরণের জন্য নির্বাচিত হইয়াছে ; আধুনিক কালের সঙ্গে অসঙ্গতি সেখানে মুখ্য বিষয়ের অন্তর্গত নয়—যেমন 'নির্মোক নৃত্য', 'তিলোত্তমা' প্রভৃতি। আবার কোথাও কোথাও পৌরাণিককে আধুনিক কালের মধ্যে আনিয়া তাহার মধ্যে অভিনব তাৎপর্যের সন্ধান করা হইয়াছে,—যেমন 'ভরতের ঝুমঝুমি'। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে বাস্তবিক কোন পার্থক্য নাই ; কারণ উভয়কেই সাহিত্যের সর্বজনীন মানদণ্ড স্বীকার করিতে হইবে, বিশেষকে অতিক্রম করিয়া শাশ্বতভাবে আধুনিক বা শাশ্বতভাবে পৌরাণিক হইতে হইবে। তবু আলোচনার সুবিধার জন্য বর্তমান অধ্যায়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর গল্পের অর্থাৎ যেখানে পৌরাণিক কাহিনী বা চরিত্রের উপর আধুনিকতার আলোক আক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহাদের কথাই বলা হইবে।

এই শ্রেণীর গল্পের একটা বিপদ আছে। গ্রন্থকার পৌরাণিক গল্পের প্রকৃত তাৎপর্য আবিষ্কার করিতে চাহেন। সুতরাং তিনি নিজের বক্তব্য বা মরালকে প্রাধান্য দেন এবং সেই কারণে সৃষ্টি অপেক্ষা বক্তব্য পুরোভাগে আসিয়া যায় অর্থাৎ এই সকল গল্প কাহিনীর আকারে লিখিত প্রবন্ধ হইয়া দাঁড়ায়। এই প্রসঙ্গে 'রামরাজ্য' রচনাটির কথা বলা যাইতে পারে। পরশুরাম নিজেই ইহাকে গল্প না বলিয়া 'গল্প-কল্প' নামক নূতন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। তিনি ইহার মধ্যে রামরাজ্যের সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন। সেই সংজ্ঞার মূল্য যাহাই থাকুক ইহার মধ্যে কোন কাহিনী নাই এবং কোন চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠে নাই। প্রাচীন ধরনের এবং আধুনিক ধরনের দুই স্বদেশীর পার্থক্য ও সংঘর্ষের যে চিত্র আঁকিবার চেষ্টা হইয়াছে, তাহাও খুব ভাসা ভাসা রকমের। বরং মূল বক্তব্যের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত একটি রেখার টানে সৃজনী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। মিডিয়ামের মারফতে পরলোকগত কোন প্রেতাত্মাকে অন্ধকার ঘরে আহ্বান করিয়া আনিয়া স্ত্রী ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে প্রেতচক্রের অধিবেশন করা সদ্য-অবসরপ্রাপ্ত জেলাজজ সুবোধ রায়ের সখ। এই অধিবেশনে উপস্থিত থাকেন জজ সাহেব, তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী এবং অপর চারজন সভ্য। সাধারণতঃ এই জাতীয় প্রেতচক্রের একটা নিয়ম থাকে যে সভ্যরা অন্ধকার ঘরে হাতধরাধরি করিয়া টেবিলের চারিধারে বসিয়া থাকেন। কিন্তু অন্য পুরুষ, বিশেষ করিয়া তরুণ সভ্য ভুজঙ্গ ভঞ্জ, সুবোধবাবুর অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক স্ত্রীর হাত ধরিয়া থাকিবে ইহা সুবোধবাবুর মনঃপূত ছিল না। এই জন্য তিনি ভূতনাথকে মিডিয়াম নির্বাচন করিলেন, কারণ ভূতনাথের এমন আশ্চর্য ক্ষমতা যে সে যেখানে মিডিয়াম হয় সেখানে হাতধরাধরির দরকার হয় না এবং অন্ধকার না হইলেও চলে। ইহা ছাড়া এই রচনায় আর যাহা কিছু আছে তাহা প্রবন্ধাকারে লিখিলেই চলিত।

অন্য কতকগুলি গল্পও এই জাতীয় অর্থাৎ গল্পাকারে লিখিত হইলেও তাহারা বাস্তবিকপক্ষে প্রবন্ধ; তাহাদের মধ্যে আর্টের সজীবতা নাই। 'বালখিল্যগণের উৎপত্তি'র কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। 'ভীমগীতা', 'পঞ্চপ্রিয়া পাঞ্চালী', 'তৃতীয় দ্যূতসভা' প্রভৃতিও এই শ্রেণীর রচনা। দুর্যোধন ও দুঃশাসন পাণ্ডবদের উপর যে অত্যাচার করিয়াছিলেন তাহাই অর্জুনের যুযুৎসাকে জাগ্রত করিবার পক্ষে যথেষ্ট। এই নিতান্ত মানবিক কারণের দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ

অর্জুনকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারিতেন। অষ্টাদশপর্বে পরিব্যাপ্ত গীতার দর্শন-ব্যাখ্যা একেবারেই অবান্তর। কেহ কেহ বলেন মহাভারতে গীতা প্রক্ষিপ্ত; ভীমের মুখ দিয়া গ্রন্থকার যেন গীতার অনাবশ্যকতা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন। ভীম দার্শনিক নহেন, কিন্তু তাঁহার কমনসেন্স আছে। 'ভীমগীতা'ও গল্প-কল্প আকারে লিখিত প্রবন্ধ। 'পঞ্চপ্রিয়া পাঞ্চালী' ও 'তৃতীয় দ্যূতসভা'ও মহাভারতের কাহিনী বিষয়ক রচনা এবং ইহাদের মধ্যেও কোনটিই সার্থক গল্প হয় নাই। প্রথমটিতে মহাভারতবর্ণিত দ্যূতক্রীড়ার সঙ্গে আর একটি দ্যূতক্রীড়া যোগ করিয়া দিয়া গল্পকার রণনীতি সম্পর্কে বিতর্কের মধ্য দিয়া যুধিষ্ঠির এবং বলরামের চরিত্রচিত্রণ করিয়াছেন। মহাভারতে কথিত আছে যে, শকুনি শঠতা অবলম্বন করিয়া যুধিষ্ঠিরকে অক্ষক্রীড়ায় পরাস্ত করিয়াছিলেন। সেই সূত্র ধরিয়া পরশুরাম দেখাইয়াছেন যে, শঠতার কৌশল শকুনি নিজে উদ্ভাবন করেন নাই; তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মৎকুনি তাঁহাকে শিখাইয়াছিলেন, কিন্তু দ্যূতক্রীড়ায় সাফল্য লাভ করার পর মামা-ভাগ্নে মৎকুনিকে 'গজভুক্তকপিত্থবৎ' বর্জন করিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের প্রাক্কালে মৎকুনি যুধিষ্ঠিরকে আরও শক্তিধর পাশা উপহার দিয়া তৃতীয় দ্যূতসভার আয়োজন করিলেন। এইবার যুধিষ্ঠিরের জয় হইল, কিন্তু মৎকুনি-প্রযুক্ত শঠতাও ধরা পড়িয়া গেল। তখন তের বৎসর পূর্বের দ্যূতক্রীড়ার কপটতার স্বরূপও প্রকাশ পাইল। এইবার দ্যূতযুদ্ধ হইতে তর্কযুদ্ধ শুরু হইল এবং কাহিনীপ্রধান গল্প হইতে আমরা আইডিয়াপ্রধান গল্পে উপনীত হইলাম। কিন্তু তাহাতেও কোন নূতন আলোক পাওয়া গেল না। মধ্যস্থ বলরাম বলিলেন যে, কূট পাশকের ব্যবহার দ্যূতক্রীড়ায় বিধিসম্মত; সুতরাং যুধিষ্ঠিরের এবারকার জয় শকুনির পূর্বেকার জয়ের মতই পরাজিত পক্ষের শিরোধার্য। যুধিষ্ঠির মধ্যস্থের রায় না মানিয়া এক অবান্তর শাস্ত্র-বাক্য আওড়াইলেন; অবান্তর, কারণ তাহা তের বৎসর পূর্বেকার দ্যূতক্রীড়া সম্পর্কেও প্রযোজ্য। সুতরাং পাণ্ডবদের হৃতরাজ্য যে তাঁহাদের প্রাপ্য তাহা প্রমাণিত হইল। কিন্তু শান্তিপ্রিয় যুধিষ্ঠির তখন অক্ষক্রীড়ায় তাঁহার বিরক্তি প্রকাশ করিয়া প্রতিপক্ষকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। আমরা যেখানে ছিলাম সেখানেই ফিরিয়া আসিলাম। এই গল্পে কোন মাধুর্য নাই, আইডিয়ার দিক্ হইতেও ইহা অভিনবত্ব দাবি করিতে পারে না।

'পঞ্চপ্রিয়া পাঞ্চালী' গল্পেও কোন আইডিয়া নাই, কাহিনীও একটু উদ্ভট রকমের। সভামধ্যে দ্রৌপদী অপমানিতা হইয়াছিলেন; তিনি সীতার মত শান্ত-স্বভাবাও নহেন। কথিত আছে যে, দ্যূতক্রীড়ায় প্রলুব্ধ হইয়া যুধিষ্ঠির যেভাবে রাজ্য হারাইয়া বনবাসের কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি ধর্মরাজকে তিরস্কার করিয়াছেন এবং পাণ্ডবদের প্রধান সহায় যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের কাছেও অভিযোগ করিয়াছেন। এই মূল কাহিনী ভিত্তি করিয়া পরশুরাম 'পঞ্চপ্রিয়া পাঞ্চালী' গল্পটি রচনা করিয়াছেন। দ্রৌপদীকে তিনি আধুনিক কালের অভিমানিনী নারীরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, যেন তিনি রায় বাহাদুর বংশলোচনবাবুর স্ত্রী মানিনীর উন্নততর সংস্করণ। চার মাস বনবাসে থাকিবার পরও পাঞ্চালী রাজ্যনাশের, স্বীয় অপমানের দুঃখ ভুলিতে না পারিয়া পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গেই কথা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন এবং সেই রোষের জন্য পাণ্ডবরা বিশেষ মনস্তাপে আছেন। পরে কৌশল করিয়া চতুরচূড়ামণি যদুপতি কৃষ্ণ পঞ্চপ্রিয়া কৃষ্ণার মানভঞ্জন করিলেন। কিন্তু আমরা ইহাও জানি বংশলোচন-মানিনীর মত পঞ্চপতি ও দ্রৌপদীর মধ্যকার প্রীতির শৃঙ্খলও মাঝে মাঝে মেরামত করিতে হইত। এই গল্পের প্লটে অলৌকিক ঘটনা না থাকিলেও আকস্মিক বিপদ্পাতের সম্ভাবনার অনুপ্রবেশের দ্বারা চমৎকার উৎপাদন করা হইয়াছে, কিন্তু তাহা বৈশিষ্ট্যহীন। দ্রৌপদী পঞ্চপতিকে যে পৃথক পৃথক লেকচার দিয়াছেন তাহার মধ্যেও বিশেষ বৈচিত্র্য নাই। শুধু অর্জুনের শেষের মন্তব্যে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকট হইয়াছে। দেখা গেল, যদুপতি আর সকলকে ঠকাইতে পারিলেও অর্জুনকে ঠকাইতে পারেন নাই। ইহাই নীরস গল্পের একমাত্র সরস অংশ।

পৌরাণিক কালের যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে আধুনিক কালের চিন্তাধারার অপেক্ষাকৃত সুষ্ঠু সমন্বয় হইয়াছে 'গন্ধমাদন বৈঠক' গল্পে। প্রবচনে আছে, অশ্বত্থামা, মাতুল কৃপাচার্য, বলি, ব্যাস, হনুমান, বিভীষণ এবং ভার্গব পরশুরাম—এই সাতজন চিরায়ু। ইঁহারা সুপ্রাচীন কাল হইতে আজ পর্যন্ত যাহা কিছু ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে সব কিছুরই সাক্ষী। আধুনিক কালের যুদ্ধ এমন ভয়ংকর হইতেছে যে মানবজাতির ধ্বংসের আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। সেই কারণে অস্ত্র সীমিত করার এবং এই উদ্দেশ্য মীমাংসার দ্বারা সকল সমস্যা সমাধান করিবার জন্য বহু চেষ্টা হইতেছে; একাধিক সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু খুব সফলতা লাভ করা যায় নাই। কেহ অহিংস সংগ্রামের কথা বলিয়াছেন, কেহ মহাভারতের বাণী

উদ্ধৃত করিয়া ধর্মযুদ্ধের কথা বলিতেছেন, কিন্তু মুশকিল এই যে যুদ্ধ লাগিলে প্রত্যেক যুযুধান দলই বলে যে, সে নিজে পাণ্ডবদের মত ন্যায়ের জন্য যুদ্ধ করিতেছে এবং প্রতিপক্ষ দুর্যোধনের মত আগ্রাসী। মহাভারতের দুর্যোধনের অন্ততঃ কিঞ্চিৎ চক্ষুলজ্জা ছিল ; তিনি ধর্মযুদ্ধের ভান করেন নাই। যখন পৃথিবী-ব্যাপী শান্তি-আলোচনা চলিতেছে আবার কোথাও না কোথাও রোজই শান্তি বিঘ্নিত হইতেছে, তখন যাঁহাদের মরিবার সম্ভাবনা নাই তাঁহারা এই বিষয়ে কি মনে করিতে পারেন এই আলোচনা তর্কপ্রধান কাহিনীর উপযুক্ত প্লট বটে। সুতরাং 'গন্ধমাদন বৈঠক' গল্পে পরিকল্পনার অভিনবত্ব আছে, ইহা মানিতেই হইবে। বৈঠক কোন পাকাপাকি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে নাই এবং গ্রন্থকার তর্ক দিয়া গল্পটি ভরিয়া দিলেও তর্ককে প্রাধান্য দেন নাই। তর্ক একটা মাধ্যম মাত্র যাহার সাহায্যে তিনি এই সকল চিরজীবীদের বৈশিষ্ট্য আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং অনেকাংশে সফলও হইয়াছেন। এই চরিত্র-চিত্রণে পৌরাণিকতা ও আধুনিকতার সুন্দর সমন্বয় হইয়াছে। কৃপাচার্য মহাভারতে গৌণ চরিত্র ; তাঁহার উপরে অমরত্বের গৌরব কেন চাপিল বোঝা ভার। গ্রন্থকার তাঁহাকে বৈঠকে হাজির করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাকে পূর্ণাঙ্গ চরিত্র করিয়া আঁকিতে চেষ্টা করেন নাই। রামায়ণে বিভীষণ ধর্মাত্মা, শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তি, কারণ তিনি সতী নারীর অপহরণের বিরুদ্ধে আপত্তি করিয়া পাপাত্মা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু আধুনিক কালে, বিশেষ করিয়া জাতীয়তাবাদের যুগে, ঘরভেদী বিভীষণ দুর্নামের ভাগী হইয়াছেন। এই গ্লানিতেই আধুনিক কালের বিতর্কে তিনি বড় একটা যোগ দেন নাই— এই ঔদাসীন্যের মধ্যে লজ্জাও আছে এবং তাঁহার প্রতি যে অবিচার করা হইয়া থাকে তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও আছে। মহাভারতে সবচেয়ে নৃশংস কাজ করিয়াছিলেন অশ্বত্থামা ; মনে হয় সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাঁহাকে চিন্তাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে এবং গ্রীক্ কিংবদন্তী ও সাহিত্যে অনুরূপ পাপের জন্য ধাবমান Fury বা ঐশী জিঘাংসার প্রতিমূর্তিদের কবল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য রাজকুমার ওরেস্টিস যেমন নানা দেশ পরিক্রমণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন অশ্বত্থামাকেও সেইরূপ করিতে হইবে। বাহিরের শান্তি যেন মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে অন্তরেও দগ্ধ করিতেছে। দৈত্যরাজ বলী ঔদ্ধত্যের জন্য বিষ্ণু কর্তৃক পাতালে প্রেরিত হইয়াছিলেন, এই অপ্রত্যাশিত শাস্তিতে তাঁহার

মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তিনি এখন শ্রীহরির নামকীর্তন ছাড়া আর কিছু ভাবিতে পারেন না।

বাকী রহিলেন জামদগ্নি পরশুরাম, পবনন্দন হনুমান আর বেদব্যাস। ইঁহারাই তর্ক করিয়াছেন, কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি জায়গা জুড়িলেও তর্ক এখানে গৌণ; প্রধান আকর্ষণ চরিত্রসৃষ্টি। বেদব্যাস ছিলেন ঋষি ও কবি; কালের বিবর্তনে তিনি হইয়াছেন দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক, কিন্তু তাঁহার চরিত্রের পরিবর্তন হয় নাই। তিনি পুরাকালের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ দেখিয়াছেন, পরবর্তী কালের বহু ধ্বংসলীলারও তিনি সাক্ষী। তিনি শান্তিপূর্ণ বিবর্তনে বিশ্বাসী; কোনপ্রকার যুদ্ধেই তাঁহার আস্থা নাই। পরশুরামও জ্ঞানী লোক, কিন্তু তিনি ক্রোধী, তিনি একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছেন। ব্যাসের ধৈর্য তাঁহার নাই; সুতরাং তিনি দ্বাবিংশতিবার সংহারলীলায় প্রবৃত্ত হইতে চাহেন। হনুমানও সমরপ্রিয়; কিন্তু পূর্বেও তিনি অস্ত্রের তোয়াক্কা করেন নাই; সুতরাং এখনকার দিনের অস্ত্রসজ্জা বা অস্ত্র সীমিত করার আলোচনা—কোনটাতেই তাঁহার বিশ্বাস নাই। তিনি বাহুবলে বিশ্বাসী এবং সেইজন্য মল্লযুদ্ধকেই প্রকৃষ্ট সমাধান বলিয়া মনে করেন। কিন্তু সমান সমান মল্ল পাওয়া ভার; গ্রন্থকার আধুনিক ক্রীড়াজগতের হ্যাণ্ডিক্যাপের উল্লেখ করিয়া গল্পটির হাস্যরসাত্মকতার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। আধুনিক কালের শান্তি আলোচনার মতই এই চিরঞ্জীবদের বৈঠকও কোনও স্থির সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পঁহুছিতে পারিল না।

(২)

আমাদের দেশের পৌরাণিক কিংবদন্তীতে পৃথিবীর ইতিহাসকে চার যুগে ভাগ করা হইয়াছে—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শন বলে আদিম প্রাণকোষ হইতে ক্রমে আধুনিক কালের উন্নতমস্তিষ্ক মানুষে জীবনের বিবর্তন বা অভিব্যক্তি হইয়াছে এবং আজিকার মানুষ অতিমানবে পরিণতির প্রতীক্ষায় আছে। আবার ইহাও অংশত মানুষের ধর্ম যে সে মনে করে অতীতে সব কিছুই ভাল ছিল, এখন আমরা দিন দিন সেই স্বর্ণযুগ হইতে অবনতির দিকে নামিয়া যাইতেছি। ব্যক্তিজীবনে যেমন আমরা শৈশবের সুখের দিন স্মরণ করি; তেমনি সমষ্টির ইতিহাসেও অতীতের পুণ্যদিনের কথা বলি

ও সেই সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আকুলতা অনুভব করি। পরশুরাম এই পিছুটান লইয়া এখানে-ওখানে কৌতুক করিয়াছেন। ত্রিকালজ্ঞ নারদমুনি সমবেত ঋষিকুলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সত্যযুগে পুণ্য চতুষ্পাদ ছিল, ত্রেতাযুগে তাহা ত্রিপাদ হইল ; তাঁহারা ইহা লক্ষ্য করেন নাই কেন এবং এই অধোগতির কোন সমাধান চিন্তা করেন নাই কেন ? আধুনিক কালের গৃহিণীদের মতই জাবালি-ঋষির পত্নী হিংগলিনীও অন্যান্য অভিযোগের মধ্যে এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন যে, সত্যযুগের তুলনায় ত্রেতাযুগে জিনিসপত্র দুর্মূল্য হইয়া পড়িয়াছে।

মানুষ সব কালেই মানুষ। অথচ বিভিন্ন যুগের মধ্যে কত না প্রভেদ ! দেবরাজ ইন্দ্রের এক দিন কলিযুগের মানুষের এক বৎসরের সমান, আবার যে কোন যুগের মানুষের তুলনায় দেবতা মানুষ সকলের স্রষ্টা ব্রহ্মার কাল অনেক অনেক দীর্ঘ, তাঁহার এক ঘণ্টা দ্বাপর যুগের অর্থাৎ তৃতীয় যুগের ৩৬ কোটি বৎসরের সমান। এই পার্থক্য ভুলিয়া গেলে যে কি বিপর্যয় হয় তাহাই 'রেবতীর পতিলাভ' গল্পের বিষয়। সত্যযুগ আর যে বিষয়েই শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করুক, সেই যুগের যুবতীরা কলিযুগের মেয়েদের মতই বরনির্বাচনে খুঁতখুঁতে ছিল। সুতরাং সত্যযুগেও পিতারা কন্যাদায়ে বিব্রত হইতেন। রৈবত রাজার কন্যা রেবতীর বিবাহের বয়স হইয়াছে, কিন্তু কোন বরই তাঁহার পছন্দ হয় না। তারপর দেবর্ষি নারদ রৈবতের সমস্যার সমাধান করিবার জন্য পিতাপুত্রীকে ব্রহ্মার কাছে লইয়া গেলেন এবং ব্রহ্মা দ্বারকারাজ্যের জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র বলরামকে পাত্র নির্বাচন করিয়া দিলে ইঁহাদিগকে মর্ত্যলোকে লইয়া আসিলেন। পুষ্পকরথে এই যাতায়াতে ও ব্রহ্মলোকে স্বল্পকাল অবস্থানে ইঁহাদের আধ ঘণ্টা সময় লাগিয়াছে, কিন্তু রাজা ও রাজপুত্রীর খেয়াল হয় নাই যে ইহার মধ্যেই ১৮ কোটি বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে, সত্যযুগ ও ত্রেতাযুগ অতিক্রম করিয়া মানুষ দ্বাপরযুগে পহুঁছিয়াছে এবং অনেক খর্বকায় হইয়া গিয়াছে। সত্যযুগের উনিশ হাত লম্বা রেবতী দ্বাপরযুগের চার হাত লম্বা স্বামী বলরামের সঙ্গে কেমন করিয়া মিলিত হইবে ? এখানেও সুইফটের প্রভাবের আভাস আছে। এই মিলন যেন অতিকায় ব্রবডিংন্যাগ গৃহিণীর গৃহে অতি খর্ব গালিভারের আগমন ! খানিকটা অলৌকিক উপায়ে রেবতীকে ছোট করিয়া লওয়া হইল এবং তিনি বলরামের মানানসই পত্নী হইলেন। এই গল্পের কোথাও কৃতিত্বের কোন পরিচয়

নাই। শুধু মৌলিক আইডিয়া—প্রাচীন ও নবীনের উদ্ভট সম্মিশ্রণ—অভিনব। ইহা পরশুরামের প্রতিভার আভাস দেয়, পরিচয় দেয় না।

'অগস্ত্যদ্বার' গল্পে পরশুরাম অনেক ব্যবধান অতিক্রম করিয়া তিনটি বিভিন্ন সময়কে একত্র করিয়া এক গল্প ফাঁদিয়াছেন। প্রথমে অগস্ত্য ও বিন্ধ্যের সংলাপ ও অগস্ত্যের চাতুরী। ইহা হইতেই 'অগস্ত্যযাত্রা' প্রবচনের সৃষ্টি এবং সেই প্রবচন আজও চালু রহিয়াছে। এই অগস্ত্যযাত্রার সঙ্গে একটি লেজুড় যুক্ত হইয়াছে। বিভ্রান্ত বিন্ধ্যপর্বত অগস্ত্য কর্তৃক প্রতারিত হইয়া এবং স্বীয় উচ্চাভিলাষে বাধা পাইয়া একটা অভিশাপ দেয়। অগস্ত্যদ্বার দিয়া যাহারা পরবর্তীকালে মুখোমুখি হইয়া যাতায়াত করিবে তাহাদের বুদ্ধিভ্রংশ হইবে। ইহা শুনিয়া অগস্ত্যমুনি অভিশাপটাকে লঘু করিয়া দেন। ইহা হইল সত্যযুগের কথা। কলিযুগে হিন্দুরাজত্ব কালে কলিঙ্গরাজ ও বিদর্ভরাজ একই সময়ে দুই দিক হইতে সসৈন্যে অগস্ত্যদ্বারে প্রবেশ করেন এবং তাঁহাদেরও বুদ্ধিভ্রংশ হয়। তাঁহাদের সমস্যা সমাধান করিতে যাইয়া তাঁহাদের বয়স্যরা যে ব্যবস্থা করিলেন তাহার মধ্যে একেবারে হাল আমলের লুপ লাইনের বন্দোবস্ত প্রবেশ করিয়াছে। এইভাবে পরশুরাম তিনটি বিভিন্ন কালের সম্মিশ্রণ করিয়া এই গল্পটি রচনা করিয়াছেন।

এই সম্মিশ্রণ পরশুরামের উদ্ভাবনী প্রতিভার সাক্ষ্য দেয়। তাহা হইলেও গল্পের কাহিনীর, অগ্রগতি বা প্রধান চরিত্রগুলির রূপায়ণে কোন কৌশলের বা সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় নাই। কিন্তু ইহার পরিসমাপ্তিতে, অগস্ত্যের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে বুদ্ধিভ্রংশের অপনোদনের যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহার মধ্যে প্রতিভার স্বাক্ষর রহিয়াছে। পরশুরামের সৃষ্টির একটা স্মরণীয় লক্ষণ পার্শ্বচরিত্রের মধ্য দিয়া জীবনের মাধুর্য, রহস্য ও কৌতুকময়তার উদ্ঘাটন। এই ক্ষমতার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় বিদর্ভরাজমহিষীর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে। বুদ্ধিভ্রষ্ট বিদর্ভরাজ ও কলিঙ্গরাজ তাঁহাদের সমস্যা সমাধান করিবার জন্য রাজ্য বিনিময় করিয়া একে অপরের সিংহাসন গ্রহণ করিলেন। তাহার অর্থ—রাজসিংহাসন, সৈন্যসামন্ত, পট্টমহিষী প্রভৃতি সবই হাত বদল করিল। কলিঙ্গরাজ কনকবর্মা বিদর্ভে প্রবেশ করিয়া বিদর্ভরাজমহিষী বিংশতিকলাকে পত্নীত্বে বরণ করিয়া সম্ভাষণ করিতেই, বিংশতিকলা—ইনি কনকবর্মার শ্যালিকাও বটে—একজন সশস্ত্র রাজপুরুষকে আদেশ দিলেন, 'এই ধৃষ্ট নির্বোধ

রাজা আর তার সহচরকে কারাগারে নিক্ষেপ কর। এদের শয়নের জন্য কিছু খড় আর ভোজনের জন্য প্রত্যেককে এক সরা ছাতু আর এক ভাঁড় জল দিও।' ইহার সঙ্গে যে চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়র ব্যবস্থা করিলেন তাহা আরও উপাদেয়। অপর প্রান্তে তাঁহার ভগিনী এবং তাঁহারই মত সুরসিকা কম্বুকঙ্কনাও বিদর্ভরাজের জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা করায় উভয় রাজার বুদ্ধিভ্রংশ স্বল্পকালের মধ্যেই বিদূরিত হইল এবং যে যাঁহার রাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন। সব ভাল, যার শেষ ভাল!

ত্রেতাযুগের বিষয় লইয়া পরশুরাম একাধিক গল্প রচনা করিয়াছেন। বর্তমান অধ্যায়ে সেই সব উপাখ্যানেরই আলোচনা করিতেছি যাহাদের মধ্যে পৌরাণিক যুগ কোন না কোন উপায়ে আধুনিক যুগে নামিয়া আসিয়াছে। এই সম্মিশ্রণই ইহাদের সরসতার আধার। এইরূপ একটি কাহিনী 'চিরঞ্জীব', যাহার নায়ক লংকুস্বামী; একটু বিচার করিলেই বোঝা যাইবে ইনি প্রকৃতপক্ষে লংকাস্বামী বিভীষণ, সপ্ত চিরজীবীদের অন্যতম। তিনি ত্রেতাযুগে জন্মিয়াছিলেন, আজও বাঁচিয়া আছেন এবং আধুনিক বাষ্পীয় যানে ধাক্কাধাক্কি করিয়া চলাফেরা করেন। ত্রেতাযুগের কাল লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে; কোন একটি মত গ্রহণ করিয়া পরশুরাম হিসাব করিয়া ঠিক করিয়াছেন বিভীষণের বয়স পাঁচ হাজার পাঁচশো পঞ্চান্ন। এইরূপ একটি লোককে আমাদের মধ্যে আনিয়া ফেলিলে খুব বেখাপ্পা দেখায়। কিন্তু পৌরাণিক কাহিনী সত্য হইলে ইহা মানিতেই হইবে এবং ট্রেনযাত্রার ভিড়ের মধ্যে হরেক রকমের লোকের মধ্যে তিনি মোটেই বেমানান হয়েন নাই। আর তাঁহার বয়সও প্রকাশ পাইয়াছে, অতর্কিতে একটি কৌতুককর তুলনার মধ্য দিয়া। যে সমাজে বিধবা বিবাহের প্রচলন আছে, সেই সমাজে নারীপুরুষের বারংবার এবং বেশি বয়সে বিবাহ অনেকটা গা-সহা হইয়া থাকিবে। আমাদের দেশে মেয়েদের অল্প বয়সে বিবাহ হইত এবং বিধবাদের দ্বিতীয়বার বিবাহের পথ বন্ধ ছিল কিন্তু পুরুষের বিবাহে অবাধ স্বাধীনতা ছিল। সেই কারণে বিধবার ব্রহ্মচর্য যেমন শ্রদ্ধা ও করুণার উদ্রেক করিত সেইরূপ পুরুষের বারবার বিবাহের এবং বৃদ্ধ বিপত্নীকের (তরুণী) ভার্যা গ্রহণের চেষ্টা কৌতুকের সৃষ্টি করিত। হয়ত এই কারণেই 'ভীমরথী' শব্দ 'ভীমরতি'তে রূপান্তরিত হইয়াছে অর্থাৎ যে বুদ্ধিভ্রংশে অপচিতশক্তি বৃদ্ধ নিজেকে ভীমের সমকক্ষ মনে করে এবং রতি

ভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন হয় তাহারই নাম ভীমরতি। এই গল্পে ট্রেনের যাত্রীদের মধ্যে ছিলেন হরিহর হালদার যিনি চতুর্থ পত্নী বিয়োগের পর পুনরায় বিবাহ করিতে চান এবং সেইজন্য বয়স যথাসম্ভব কমাইয়া বলেন এবং নিজের শক্তি-সামর্থ্যের বানানো গল্প প্রচার করেন, কিন্তু তাঁহার বিবাহোদ্যমের প্রধান পরিপন্থী হইল তাঁহার শ্যালক যে ফাঁস করিয়া দিল যে, হালদার মহাশয় অনেকদিন আশি পার হইয়া গিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহার বিবাহের আকাঙ্ক্ষা বুদ্ধিভ্রংশ ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু তৎক্ষণাৎ দেখা গেল যে, সহযাত্রী লংকুস্বামীর কাছে তিনি কচিখোকা, কারণ লংকুস্বামীর বয়স পাঁচ হাজার পাঁচশত পঞ্চান্ন বছর এবং তিনি ১:৯ বার বিবাহ করিয়াছেন। এই অতর্কিত আবিষ্কারই গল্পের সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় অংশ। অন্য কোথাও তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য নাই। সামগ্রিক বিচারে বলা যাইতে পারে, পৌরাণিক কাহিনীকে প্রত্যক্ষবাদী যুক্তিবিদের দৃষ্টিতে দেখিলে যে কৌতুককর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এই গল্পকল্পটি তাহারই আভাস দেয়।

বিভীষণের আমলের আর একটি গল্প উল্লেখযোগ্য—'স্মৃতিকথা'। তবে এই গল্পে বিভীষণ নিজে উপস্থিত হয়েন নাই; এখানে বিভীষণের কন্যার কাছে বিভীষণের ভগিনী শূর্পণখা ওরফে শুক্তিনখা তাঁহার নাক-কান-কাটার গল্প বলিতেছেন। এই সম্ভাব্য স্মৃতিকথা রচনা করিয়াছে একজন আধুনিক লেখক; সুতরাং ত্রেতাযুগের রাক্ষস, মুনি-ঋষি ও দেবতার অবতার রামচন্দ্রের কাহিনীতে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রবেশ করিয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে দুই-একটি রেখার টানে পার্শ্বচরিত্রকে সজীবতা দান করিতে পরশুরামের তুলনা পাওয়া দুষ্কর। এই গল্পে ব্যবহারজীব সম্প্রদায়ের চরিত্রের একটি দিক এক কথায় পরিস্ফুট হইয়াছে। প্রথম সম্ভাষণেই উকিল নরেন সেন বলিলেন, 'ওহে, আমার একটা বিল এখনও শোধ কর নি, টাকাটা কালকের মধ্যেই পাঠিয়ে দিও।' মাতাল দাশু মল্লিকের চিত্রটি এত সংক্ষিপ্ত নয়, কিন্তু তাহাও খুব হৃদয়গ্রাহী। শূর্পণখার জীবন-কাহিনীতে রাক্ষসোচিত বিশালতা ও হিংস্রতা আবার আধুনিক, সভ্য, যুবতী-জনোচিত কোমলতা মেঘ ও রৌদ্রের মত আনাগোনা করিয়াছে। তাঁহার প্রথম স্বামীর মৃত্যুর যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহা রাক্ষসের জীবনেই মানানসই। পরাক্রান্ত রাক্ষসরাজ রাবণ যুদ্ধের সময় প্রমত্ত হইয়া শরক্ষেপণ করিতেন এবং একবার দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া শূর্পণখার স্বামীকেই মারিয়া ফেলিলেন।

একান্ত বাধ্য ও অনুরক্ত স্বামীর মৃত্যুতে শূর্পণখার শোকচ্ছ্বোস সাধারণ রমণীতেও সম্ভব আবার রাবণের সান্ত্বনা ও আশ্বাস রাক্ষসরাজেরই উপযুক্ত। শুক্তিনখা নাম গ্রহণ করিয়া তিনি পতি অন্বেষণে দণ্ডকারণ্যে স্বামী-মৃগয়ায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। ঋষি মুদ্গলের সঙ্গে তাঁহার প্রণয়সম্ভাষণে মানবিক ও আসুরিক আচরণের সমন্বয় দেখা যায়। মুদ্গল রাক্ষসীর সাহচর্যের সম্ভাবনায় ভীত হইলে তিনি যে আশ্বাস দিলেন তাহার মধ্যেও মধুর ও ভয়ানকের কৌতুককর সম্মেলন দেখা যায়। তিনি অপূর্ব মনোহরণ রূপেই সর্বদা স্বামিসঙ্গ করিবেন; শুধু রাত্রির অন্ধকারে এই ভীরু স্বামীর পাশে ভয়ঙ্করী রাক্ষসীরূপে শয়ন করিবেন, কারণ তাহা না হইলে তাঁহার ভাল ঘুম হইবে না। অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রিতে একমাত্র শয্যাসঙ্গিনী রাক্ষসীর পাশে নিরীহ স্বামীর নিদ্রা কেমন হইবে তাহা তিনি চিন্তা করেন নাই। তারপর নবদূর্বাদলশ্যাম রামের মনোমোহন মূর্তি দেখিয়া তাঁহার যে চিত্তবিভ্রম হইল তাহার বর্ণনা পাঠককে ভয়ানক রাক্ষস-জগৎ হইতে সুকুমার রোমান্টিক জগতে উত্তীর্ণ করিয়া দেয় আবার সঙ্গে সঙ্গেই কমনীয়তার প্রতিমূর্তি রামের হস্তে শূর্পণখার সাংঘাতিক লাঞ্ছনা, যাহার স্মরণেই তাঁহার পতন ও মূর্ছা হইল, তাহা আমাদের চিত্তেও শিহরণ সঞ্চার করে। আর সমগ্র নাটকের অন্তরালে রহিয়াছে বিচক্ষণ মহর্ষি কুলথর ছলনা; রাক্ষসনন্দিনী ইহার বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে পারেন নাই। তিনিই কৌশলে শূর্পণখার দৃষ্টি রামের প্রতি নিবদ্ধ করিয়া স্বীয় শিষ্য মুদ্গলকে রক্ষা করিলেন।

আরও অনেক গল্পে পরশুরাম পৌরাণিক বিষয়কে সরসতা দান করিয়াছেন। মুনি ঋষি সম্পর্কিত দুইটি গল্পের আলোচনা করিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। এই দুইটি গল্প—'কর্দমমেখলা' ও 'ভরতের ঝুমঝুমি'। ইহাদের নায়ক যথাক্রমে প্রথিতযশা মহামুনি বিশ্বামিত্র ও ব্রহ্মর্ষি দুর্বাসা। কিন্তু এখানে এই দুই মহাতেজা ঋষি হাসির খোরাক হইয়াছেন; সেইজন্য ইঁহাদিগকে নায়ক বলা হয়ত সঙ্গত হইবে না। বিশ্বামিত্র ও তাঁহার তপস্যা সম্পর্কে যুক্তিবাদী পরশুরামের যে কোন শ্রদ্ধা ছিল না তাহা অন্যান্য গল্পে অল্পস্বল্প উল্লেখ হইতেই বোঝা যায়। এই পরাক্রমশালী মুনি ষড় রিপুর প্রত্যেকটিরই দাস। ইহার সবচেয়ে বড় পরাজয় 'মহেন্দ্রের দূত' অপ্সরা মেনকার কাছে আত্মবিক্রয়। এই কামান্ধ ঋষির সঙ্গে সংস্রবের ফলে মেনকা গর্ভবতী হইলে তিনি লজ্জায় ও ক্রোধে (গ্রন্থকারের মতে নিজের পদস্খলন অপেক্ষা মোহিনী মেনকার প্রতি তাঁহার ক্রোধ হইয়াছিল বেশি)

পলায়ন করিলেন ; নিজের সন্তানের আর খোঁজখবর করিলেন না। পৌরাণিক কিংবদন্তীতে দেখিতে পাওয়া যায় যে মর্ত্যলোকে সন্তান প্রসব করিলেও অপ্সরারা সন্তান পালন করেন না, স্বর্গলোকে চলিয়া যান। রাজা পুরূরবা মহেন্দ্রের আজ্ঞায় উর্বশীর গর্ভজাত পুত্রকে যৌবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া উর্বশীর সাহচর্য লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে দেখি মেনকা শকুন্তলাকে ভুলিয়া যান নাই। দুষ্মন্ত কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইলে স্ত্রীলোকবেশিনী এক জ্যোতির্ময়ী মূর্তি শকুন্তলাকে লইয়া উধ্বর্লোকে চলিয়া গেলেন। অনুমান করা যাইতে পারে এই 'স্ত্রীসংস্থানং জ্যোতিরেকং' মেনকা কর্তৃক প্রেরিত এবং নাটকের শেষ অঙ্কে দেখিতে পাই যে শকুন্তলা যেখানে আশ্রয় পাইয়াছিলেন দুহিতৃবৎসলা মাতা মেনকা সেইখানেও পরিচর্যার জন্য অবস্থান করিতেছেন। কিন্তু মর্ত্যের মানুষ হইয়াও পিতা ও কন্যার সাক্ষাৎ হইয়াছিল বা বিশ্বামিত্র শকুন্তলার কোন সংবাদ লইয়াছেন এমন কথা কোন পৌরাণিক সাহিত্যে উল্লিখিত হয় নাই।

পরশুরাম এই অভাব পূরণ করিয়াছেন 'কর্দমমেখলা' গল্পে। মেনকার রূপমোহ ভাঙিয়া গেলে ক্রোধোন্মত্ত বিশ্বামিত্র গর্ভবতী মেনকাকে নিজের অসংযমের জন্য দায়ী করিয়া প্রস্থানোদ্যত হইলেন। মেনকা তাঁহাকে পিতার কর্তব্য স্মরণ করাইয়া দিলেন এবং ইহাও বলিয়া দিলেন স্বর্গের নিয়মানুসারেই অপ্সরারা সন্তান জন্ম দেন বটে, কিন্তু প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন না ; ক্রুদ্ধ হইয়া মুনি বলিলেন, 'পাপিষ্ঠা দূর হও এখান থেকে, তোমার গর্ভস্থ পাপও তোমার সঙ্গে দূর হয়ে যাক।' মদমত্ত মুনি নিজের অসংযমের বা পাপের কথা একবারও ভাবিলেন না। কিন্তু পরশুরামের মেনকা তাঁহাকে রেহাই দিলেন না। স্বর্গের অলৌকিক শক্তিসম্পন্না অপ্সরা সরোবরের কাদার তাল পাকাইয়া তাহা পলায়নপর ঋষিকে লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া মারিলেন এবং ইহা সাপের মত এই অবিবেকী ঋষির কটিদেশে জড়াইয়া রহিল। মেনকার ভুবন-মোহন রূপ তাঁহার তপস্যার যতটা বিঘ্ন করিয়াছিল তাহা অপেক্ষা এই নোংরা কর্দমমেখলা অনেক বেশি উৎপাত সৃষ্টি করিল এবং এই অভিশাপ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য বিশ্বপরিক্রমা করিয়াও তিনি সোয়াস্তি পাইলেন না। তারপর চার-পাঁচ বৎসর উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরিয়া কণ্বমুনির আশ্রমে আসিয়া শকুন্তলাকে দেখিয়া যেন নূতন জগতের সন্ধান পাইলেন। তখন শুধু শকুন্তলাকে পাইবার

জন্যই তিনি নূতন রাজ্য জয় করিতে চাহিলেন। যাহাতে শকুন্তলার মাতার স্থান শূন্য না থাকে সেইজন্য তিনি গৌতমীকে বিবাহ করিয়া গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করিতেও চাহিলেন। এই প্রলাপোক্তির জন্য গৌতমী তাঁহাকে যথোচিত ভৎর্সনা করিলেন এবং তাঁহার নবোন্মাদনা-প্রণোদিত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। কিন্তু সেই মানবিক স্নেহের প্রবর্তনায় তিনি যে মেনকার 'গর্ভস্থ পাপ'কে কোলে তুলিয়াছিলেন তাহার ফলেই তাঁহার নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল এবং কর্দম-মেখলা কটিদেশ হইতে খসিয়া গেল। ইহা বিশ্বামিত্র কাহিনীতে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। তবু ইহাকে শ্রেষ্ঠ গল্প বলিয়া স্বীকার করা যায় না, কারণ কাহিনীর moral বা উপদেশ চরিত্র ও প্লটকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। যে কাব্য উদ্দেশ্য চাপাইয়া দিতে চায় তাহা আমাদের অনুরাগ আকর্ষণ করিতে পারে না।

'ভরতের ঝুমঝুমি' গল্পেও মেনকার সাক্ষাৎ পাই, এইখানেও শকুন্তলার উল্লেখ আছে এবং এইখানেও ঋষির প্রায়শ্চির্ত ও তাঁহার মুক্তিই গল্পের বিষয়। এই ঋষি বিশ্বামিত্রের মত 'অর্বাচীন' বা 'হ্যাংলা' নহেন ; ইনি ব্রহ্মর্ষি, ব্রহ্মলোক-নিবাসী মহামুনি দুর্বাসা যাঁহার অভিশাপের ভয়ে ত্রিভুবন কম্পমান। এই কাহিনীতে কিন্তু তিনি নিজেই অভিশপ্ত। এই অভিশাপ বা দণ্ডাজ্ঞা বহন করিয়া আনিয়াছেন মেনকা এবং ইহার উৎস স্বয়ং মহাদেব। অপ্সরা মেনকার প্রতি প্রলয়ের দেবতা মহাদেবের একটু স্নেহ ছিল কারণ মহাদেবের শাশুড়ী অর্থাৎ হিমালয়ের পত্নীর নামও মেনকা। মহাদেবতা ও মহামুনিদের মধ্যেও গল্পকার পরশুরাম সাধারণ মানবিক দুর্বলতা আরোপ করিয়া কৌতুকরসের উপযুক্ত মধুর পরিবেশ রচনা করিয়াছেন। ক্রুদ্ধ দুর্বাসা যে শকুন্তলার প্রতি তাঁহার অভিশাপকে লঘু করিয়া দিয়াছিলেন তাহার কারণ শকুন্তলার যে সখী তাঁহাকে কাতর অনুনয় করিয়াছিল, তাহার ও দুর্বাসার মায়ের নাম এক— অনসূয়া। এই গল্পে দুষ্যন্ত-শকুন্তলা-ভরতের ত্রেতাযুগ হইতে আমরা কলিযুগে বিংশশতাব্দীতে দেশবিভাগোত্তর ভারতবর্ষে আসিয়া পহুঁছিয়াছি। গল্পের সূত্রপাত ও পরিণতির মধ্যে বহু লক্ষ বৎসরের ব্যবধান, কিন্তু গল্পকারের প্রতিভাবলে সেই ব্যবধান আমরা ভুলিয়া না গেলেও এইজন্য কোন অসামঞ্জস্য বোধ করি না। ইহার একটি কারণ দুর্বাসার অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব। প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই বলিয়া তিনি ছন্নছাড়ার মত যুগ যুগ

ধরিয়া ব্রহ্মাণ্ড পরিক্রমা করিতেছেন, অভিশাপ দিয়া তিনি আর দেবমানবের সংকট সৃষ্টি করিতে পারেন না, বরং নিজেই সংকটে পড়িয়াছেন। কিন্তু এই সংকটের মধ্যেও মেঘের আড়াল হইতে সূর্যরশ্মির মত তাঁহার ব্রহ্মতেজ উঁকিঝুঁকি দিতেছে। নির্বোধ চাকর সাধারণ ভিখারী সন্ন্যাসীভ্রমে তাঁহাকে অপমান করিতে পারে, কিন্তু টহলরামের প্রভুরা দিব্য বিভায় অভিভূত হইয়া ভৃত্যের মত তাঁহার আদেশ পালন করিতে উদ্যত হইয়াছেন এবং তিনিও নিঃসঙ্কোচে অনেক উচ্চস্তরের লোক হিসাবেই তাঁহাদিগকে আদেশ করিয়াছেন, ভৎর্সনা করিয়াছেন। এই গল্পে পুরাতন ও আধুনিকের অপূর্ব সমন্বয় হইয়াছে। কলিকালে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের পরে হরিদ্বারের এক ধর্মশালায় দুইজন বাঙালী তীর্থযাত্রীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন—ব্রহ্মর্ষি দুর্বাসা। তাঁহাকে নির্দেশ দিয়াছেন পিতা অত্রি যিনি নিজে ব্রহ্মার মানসপুত্রদের অন্যতম। অত্রির ঔরসে মহাদেবের অংশে দুর্বাসার জন্ম। এই জন্যই এই ক্রোধী মহামুনি অপর কোন দেবতাকে গ্রাহ্য না করিলেও মহাদেবকে ভয় করেন। ব্রহ্মর্ষির বংশমর্যাদা, ব্রহ্মতেজ যত মহনীয়ই হউক, পরিধানের বসন খুব নোংরা বলিয়াই ইঁহার নাম দুর্বাসা। তারপর সেই একই বসনে ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলিকালের কয়েক সহস্র বৎসর অতিক্রম করিয়া তিনি যখন ধর্মশালায় উপস্থিত হইলেন, তখন পরনের গেরুয়া কাপড় এবং কাঁধের কম্বল অত্যন্ত ময়লা এবং শুধু যে জটায় আর দাড়িতে ধূলি জমিয়াছে তাহা নহে, গায়েও ছারপোকা বিচরণ করিতেছে। পুলিন আধুনিক কায়দায় সাবান ও ডি ডি টি স্প্রে করার প্রস্তাব করিতেই, 'স্বে মহিম্নি প্রতিষ্ঠিতঃ' মহামুনি উত্তর দিলেন, 'খবরদার, ওসব করতে যেয়ো না। গুটিকতক অসহায় প্রাণী যদি আমার গাত্রে, বস্ত্রে আর জটায় আশ্রয় নিয়ে থাকে তো থাকুক না। তুমি তাদের তাড়াবার কে?' তেজ স্তিমিত হইলেও এই উক্তি দুর্বাসারই উপযুক্ত।

অন্যান্য ঘটনায়ও কথোপকথনের মধ্যেও হৃতশক্তি ও অনপনেয় তেজের সমাবেশের পরিচয় পাওয়া যায়। পুলিন হরিদ্বারে আগন্তুক সন্ন্যাসীর মুখে বাংলা কথা শুনিয়া পরিচয়-জিজ্ঞাসু হইলে, তিনি উত্তর দিলেন, 'সে খোঁজে তোমার দরকার কি, আমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে নাকি?' ইহার পর তিনি 'ব্রহ্মর্ষি' এই পরিচয় দিলে পুলিন প্রশ্ন করিল, 'নামটি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?' অমনি উত্তর হইল, 'বোবা যখন নও, তখন না পারবে কেন।...... আমি হচ্ছি

মহামুনি দুর্বাসা।' ভোজনান্তে তিনি আধুনিক কালের সিগারেট খাইতে লাগিলেন এবং পুলিন ও গল্পকার তাঁহার মত মহামানবের কাছে ধূমপান করিতে ইতস্তত: করায় তিনি মন্তব্য করিলেন, 'ভণ্ডামি করো না, আমার সামনে একরাশ লুচি গিলতে বাধল না, আর যত লজ্জা ধোঁয়ায়! নাও, নাও, টানতে আরম্ভ কর।' দুর্বাসা-মেনকা সম্ভাষণেও উভয়ের ব্যক্তিত্ব এবং প্রাচীন-আধুনিকের অপরূপ সম্মিশ্রণ দেখা যায়। মেনকা অনন্তযৌবনা অপ্সরা, মুনিগণ যার পদে ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল। বিশেষতঃ তাঁহার প্রতি মহাদেবের স্নেহ আছে। সুতরাং তিনি মহামুনি দুর্বাসার কাছে উপস্থিত হইলেন আধুনিক নর্তকীর ভঙ্গিতে, শুধু মুখে টুথব্রাশের জায়গায় সনাতন নিমের দাঁতন। দুর্বাসাও তাঁহাকে জানাইয়া দিলেন তিনি বিশ্বামিত্র নহেন, তাঁহার কাছে অপ্সরার ছলাকলায় কিছু হইবে না। কিন্তু ইহাও দেখা গেল যে তিনি অপ্সরার রূপে কিঞ্চিৎ পরিবৃত্তধৈর্য হইয়াছিলেন এবং মেনকাকে তাঁহার ঔরসে পুত্রদান করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি 'কামমোহিত' হয়েন নাই। মেনকা তাঁহার দাক্ষিণ্য প্রত্যাখ্যান করিলে, তিনি অতি কষ্টে ক্রোধ সংবরণ করিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা……আমি অপাত্রে দান করি না।' কিন্তু তিনি মেনকার অনন্তযৌবনের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা যে কোন কবির লোভনীয়। পুলিন মেনকার বয়স জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিলেন, 'অপ্সরার আবার বয়স কি? জ্যোৎস্না বিদ্যুৎ রামধনু—এদের বয়স আছে নাকি?' তাঁহার সামাজিক ভব্যতা-জ্ঞান কিন্তু মেনকার তাচ্ছিল্য-কেই সমর্থন করে। তিনি মেনকার পক্ষ হইয়া মেয়ের বাড়িতে তত্ত্ব লইয়া গেলেন নিকটস্থ বন হইতে একটি সুপুষ্ট ওল আর সেরখানেক বড় বড় তিন্তিরী —বুনো ওল আর বাঘা তেঁতুল! এইভাবে অম্লমধুরে মিশিয়া এই গল্পের অপরূপ রস সৃষ্টি করিয়াছে।

এই গল্পের পরিসমাপ্তিও খুব কৌতুককর এবং তাহার ইঙ্গিত ইহার নামকরণেই পাওয়া যায়। কোথায় দেবাদিদেব মহাদেব, স্বর্গের অপ্সরা, ব্রহ্মর্ষি দুর্বাসা, ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠাতা ভরত আর কোথায় আধুনিক যুগের মনোহারি দোকানের খেলনা ঝুমঝুমি! আর যে সংকট ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের বহুলাংশ অতিক্রম করিয়া দুর্বাসা মোচন করিতে পারেন নাই, তাহা আকস্মিক ভাবেই সমাধান করিয়া দিল এক বালক তাহার পোষা ইঁদুরছানা খুঁজিতে

যাইয়া এবং এই অসম্ভব সম্ভব হইল যেহেতু সরল বালক অত্রিপুত্র মহর্ষি দুর্বাসাকে কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করিয়া তাঁহার দাড়ি উপড়াইয়া ফেলিয়া তন্মধ্যে নিজের পলাতক ইদুঁর ও দুর্বাসার হারানো ঝুমঝুমি একসঙ্গে আবিষ্কার করিল। কিন্তু এখন তো ভরতের সাম্রাজ্য দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে। তাই সংকটমোচনের জন্য তিনিই সেই ত্রেতাযুগের খেলনাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া একাংশ দিল্লীতে ও একাংশ করাচীতে দেওয়ার জন্য প্রস্থান করিলেন। মহৎ হইতে তুচ্ছে অবতরণ, হাস্যরসের শ্রেষ্ঠ উপাদান। এই অবরোহের এইরূপ দৃষ্টান্ত বিরল।

এই গল্পে আর একটি রূপকব্যঞ্জনা আছে তাহাও উপেক্ষণীয় নহে। যুগ যুগ পরে দুর্বাসা যখন মীমাংসায় পহুঁছিলেন তখন ভরত বহুদিন বিগত হইয়াছেন এবং ন্যায়বিচার করিতে যাইয়া তাহাকে খেলনাটিকেই ভাঙিতে হইল, ঝুমঝুমি আর ঝুমঝুম করিবে না। ইংরেজরাজ ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত করিয়া চলিয়া গিয়াছেন কিন্তু রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহার আইন-সম্ভার যাহা বিপুল, ব্যাপক, জটিল এবং কালক্ষয়ী। এই আইনের দলিলদস্তাবেজ নজিরের প্রাবল্যে এবং আইনব্যবসায়ীদের কৌশলে মামলা আরম্ভ হয় বটে, কিন্তু যখন তাহার নিষ্পত্তি হয়, যদি কখনও নিষ্পত্তি হয়ই, তখন দেখা যায় বাদী ও বিবাদীরা বহুকাল অন্তর্হিত হইয়াছেন এবং যে সম্পত্তি লইয়া মামলা আরম্ভ হইয়াছিল তাহা সূক্ষ্ম ন্যায়বিচারের ফলে মেনকাপ্রদত্ত ঝুমঝুমির অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে!

কাল্পনিকী

(১)

সাহিত্যের কোন শ্রেণীকেই 'কাল্পনিকী' বলিয়া নির্দেশ করিলে বিভ্রান্তির উদ্ভব হইতে পারে, কারণ কবিপ্রতিভার সকল রকমের সৃষ্টিই তো কল্পনা-প্রসূত! কিন্তু সকল সৃষ্টির মধ্যেই এই মৌলিক ঐক্য থাকিলেও বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্য অনুসারে কতকগুলি রচনাকে অন্যান্য রচনা অপেক্ষা বেশি খেয়ালী বলিয়া মনে হয় যেহেতু এই সমস্ত রচনার সঙ্গে বাস্তব জগতের সংস্রব খুব ক্ষীণ। অবশ্য কবির কল্পনা যত খেয়ালীই হউক বাস্তব জীবনই তাহার উৎস এবং লক্ষ্য। তাহা হইলেও সুকুমার রায়ের 'হযবরল' আর বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' এক শ্রেণীর কাহিনী নয়; 'নীলদর্পণ' আর 'কমলে কামিনী'র বিষয়বস্তু এক ধরনের নয়। কল্পনার বলে পরশুরাম বিভীষণকে বিংশশতাব্দীতে ট্রেনযাত্রী করিয়াছেন, দুর্বাসাকে হরিদ্বারে লুচি পেড়া সংযোগে ভূরিভোজন করাইয়া তাঁহার কাছে সিগারেটের টিন আগাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু পৌরাণিক কাহিনীও আমাদের ঐতিহ্যের অঙ্গ এবং সেই হিসাবে ইহারাও বাস্তবভিত্তিক।

পরশুরামের এমন কতকগুলি গল্প আছে যেখানে তিনি রসের উৎস স্থাপন করিয়াছেন সাধারণ জীবনের অভিজ্ঞতার অতীত জগতে। প্রথমে, আলোচনা করা যাইতে পারে বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প-কল্প 'গা-মানুষ জাতির কথা' এবং 'মাঙ্গলিক' ও 'গগন-চটি' গল্পের। ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইটি সাহিত্য হিসাবে সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই। অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রের দ্বারা পৃথিবী ধ্বংস হইয়া যাওয়ার পর ইঁদুর বা তজ্জাতীয় যে দুই-একটি প্রাণী কোনক্রমে বাঁচিয়া গিয়াছে তাহাদের বংশ হইতে উদ্ভূত এবং মহাজাগতিক গামারশ্মির দ্বারা পরিপুষ্ট মানুষের কথা বলা হইয়াছে প্রথমটিতে এবং দ্বিতীয়টিতে মঙ্গলগ্রহ হইতে অভ্যাগত উৎকৃষ্টতর কোন জীব আসিয়া পৃথিবীর মানুষকে লেকচার দিয়াছে। আণবিক, পারমাণবিক বোমার প্রয়োগে সমগ্র প্রাণিজগৎ ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে। এই আতঙ্ক এখন শুধু সুদূর কল্পনা নয়, বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনা এবং হিরোশিমা ইহার আংশিক অভিজ্ঞতাও দান করিয়াছে। মঙ্গল গ্রহ পৃথিবীর

নিকটবর্তী গ্রহ ; ইহা সূর্যের খুব কাছেও নয় আবার সূর্য হইতে খুব দূরবর্তীও নয়। ইহাতে সেই পরিবেশ থাকিতে পারে যাহা জীবসৃষ্টির অনুকূল ; এইরূপ কল্পনা পূর্বে বৈজ্ঞানিকরা করিয়াছেন এবং আধুনিক কালে এই বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণাও হইয়াছে ; যদিও সেই গবেষণা এখন পর্যন্ত কোন সম্ভাব্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে নাই। পরশুরামের এই দুইটি রচনা অংশতঃ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের লক্ষণাক্রান্ত আবার অংশতঃ ইহারা কল্পনাবিলাসও বটে। কিন্তু প্রবন্ধে যে যুক্তিপ্রমাণ থাকে তাহা এখানে নাই এবং গা-মানুষ বা মাঙ্গলিকের বক্তৃতায় কোথাও রসের স্পর্শ নাই।

'গগন-চটি' গল্পটি এই শ্রেণীতে পড়ে ; তাহাও খোশখেয়ালী কল্পনার অভিব্যক্তি এবং তাহাও বিজ্ঞানাভিত্তিক প্রবন্ধের মতই। কিন্তু এই গল্পটি আদ্যন্ত রসে পরিপূর্ণ, কারণ ইহার মধ্য দিয়া মনুষ্যচরিত্রের রহস্য ও বৈচিত্র্য পরিস্ফুট হইয়াছে এবং প্রত্যাশিত ও অপ্রত্যাশিতের অপরূপ সমন্বয় হইয়াছে। ধূমকেতুর উদয় দৈনন্দিন ব্যাপার না হইলেও একেবারে অপ্রত্যাশিত নয়। ১৯১১ সালে বিরাট এক ধূমকেতুর উদয় হইয়াছিল এবং মনে করা যায় নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সে আবার দেখা দিবে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা গণিতের হিসাব কষিয়া এবং দূরবীন দিয়া প্রত্যক্ষ করিয়া বহু আকাশচারী গ্রহজাতীয় বস্তু আবিষ্কার করিয়াছেন যাহা দেখিতে ছোট হইলেও আকারে বিশাল। ইহাদের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা হইয়া থাকিলেও আবার অনেক কিছু জানা যায় নাই। কাজেই যতই জ্ঞান বাড়িতেছে ততই রহস্য আরও গভীর হইতেছে এবং পৃথিবী মহাকাশে একটি ক্ষুদে গ্রহ মাত্র এই ভয়ঙ্কর সত্য প্রমাণিত হওয়ায় বিজ্ঞান এই ক্ষেত্রে মানুষের ক্ষমতা অপেক্ষা তাহার অসহায়তার ধারণাই পরিপুষ্ট করিয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছে যে সূর্য বিশাল নভোমণ্ডলে বহু নক্ষত্রের একটি ; আমাদের কাছে আছে বলিয়াই তাহাকে আমরা বড় করিয়া দেখি। ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে সূর্যের চতুর্দিকে যে সকল গ্রহ এই পর্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা ছাড়াও অনেক অ্যাস্টেরয়েড বা গ্রহাণু চলাচল করিতেছে যাহাদের গতিবিধি সম্পর্কে আমরা ওয়াকিবহাল নই।

আগেকার দিনের পণ্ডিতেরা এখনকার মত বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করিতে পারেন নাই এবং তাঁহাদের কাছে দূরবীন প্রভৃতি আধুনিক যন্ত্রপাতিও

ছিল না। আমাদের দেশে যে সকল পণ্ডিত এই বিষয় আলোচনা করিতেন তাঁহাদের মনে একটা বদ্ধমূল সংস্কার ছিল যে গ্রহতারারা দেবতা অথবা দেবোপম শক্তি, এবং মানুষের ভাগ্য অনেকটা ইঁহাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সেই শাস্ত্রকে বলা হইত জ্যোতিষ এবং এখনও এই বিদ্যার যথেষ্ট প্রচলন আছে —এই দেশে তো বটেই, পশ্চিম দেশেও। তাহা হইলেও আধুনিক বিজ্ঞানীরা নক্ষত্র গ্রহ প্রভৃতিকে জড়পিণ্ড বলিয়াই মনে করেন এবং তাহারা মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে, এই বিশ্বাসকে আধুনিক বিজ্ঞান উপহাস করিয়া উড়াইয়া দেয়। কিন্তু এই বিজ্ঞানও কতকগুলি সাংঘাতিক সম্ভাবনার আভাস দেয়, যাহা মানুষকে আতঙ্কিত করে। জড় জগতের সব কিছুই অমোঘ নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, কিন্তু ক্ষুদ্র পৃথিবীর ক্ষুদ্র মানুষ বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের কতটুকু জানে বা জানিতে পারিবে? সুতরাং এই বিশাল জগতের নিয়মের মধ্যে মানুষের কাছে অনেক কিছুই আকস্মিক বলিয়া মনে হইবে, অনেক কিছু অনুমানের দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে হইবে। একটা মত আছে যে একদা একটা বিরাট নক্ষত্র কোন এক সময়ে সূর্যের কাছাকাছি আসিয়া সূর্যদেহে যে আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার ফলে সূর্যের কতকগুলি অংশ বিক্ষিপ্ত হইয়া যাওয়ায় পৃথিবীসমেত গ্রহ-কুলের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। সেই নক্ষত্রটি কি, কেন আসিয়াছিল, কোথায় গেল এই সব কিছুই জানি না। বিজ্ঞানের আধিদৈবিক জ্ঞান যেখানে এত কম সেখানে আধ্যাত্মিক অতিবিজ্ঞানের প্রবেশ অনিবার্য এবং এইজন্যই জ্যোতি-র্বিজ্ঞান বা আধুনিক অ্যাস্ট্রনমি জ্যোতিষ বা প্রাচীন অ্যাস্ট্রলজিকে স্থানচ্যুত করিতে পারে নাই। বরং অনেক সময় এই দুই শাস্ত্র খুব কাছাকাছি আসিয়া যায়।

এই সান্নিধ্য এবং তাহার কৌতুককর পরিণতিই পরশুরামের গল্প 'গগন-চটি'র বিষয়। পৃথিবীর জন্ম কবে হইয়াছিল, কিভাবে হইয়াছিল তাহা বিতর্কের বিষয়; পরশুরাম নিজেও 'বিরিঞ্চিবাবা'য় প্রাচীন কিংবদন্তীর উপর বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিয়াছেন। তবে বিরিঞ্চিবাবা নিছক ধাপ্পাবাজ, সুতরাং সে যে কৌতুক-হাস্যের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা খুব লঘু প্রহসন। 'গগন-চটি'তে পরশুরামের ব্যঙ্গের পরিধি খুব ব্যাপক এবং তাঁহার অন্তর্দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা অনন্যসাধারণ। আকাশে এক নূতন জ্যোতিষ্ক দেখিয়া নানা লোকের মনে নানা প্রতিক্রিয়া হইল। পর্দানশীন রমজানি বিবি আকাশে 'জুল জুল' করা কাটারিসদৃশ একটা

পদার্থ দেখিয়া বিস্ময়ে সচকিত হইল, স্বামী আবু বকর দর্জি সহজভাবে উত্তর দিল, ইহার আকার পয়জারের মত এবং নিশ্চয়ই ইহা জমিদার মল্লিকবাবুদের শখের ব্যাপার; তাঁহারা আকাশে ফানুস উড়াইয়া থাকিবেন। কিন্তু যখন দেখা গেল ইহার চন্দ্র সূর্যের মত উদয়াস্ত আছে, তখন অনুমান করা গেল ইহা কোন জ্যোতিষ্ক হইবে এবং নিরক্ষর দর্জির আন্দাজ একেবারে ভ্রান্ত। প্রখ্যাত জ্যোতিষীরা এবারে আসরে নামিলেন এবং তাঁহাদের মত হইল ইহা রাহু বা কেতু। উভয়ই দুষ্ট গ্রহ; সুতরাং গ্রহশান্তির আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা করিতে হইবে। আধুনিক কালের অ-বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞ ব্যক্তিরা যে যাঁহার মত দিলেন এবং এই সব মতের মধ্য দিয়া ভদ্রসমাজের নানা স্তরের বৈচিত্র্যের পরিচয় প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদের জ্ঞান সূক্ষ্ম, পরিচ্ছন্ন, গণনা অভ্রান্ত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল তাঁহাদের জ্ঞান অপেক্ষা অশিক্ষিত আবু বকর মিঞার অনুমান সত্যতর; কারণ ইহা ফানুস ছাড়া কিছু নহে, তবে ফানুসটা মল্লিক-বাবুদের নহে, মহাজগতের। যে ফানুসের মত উড়িয়া আকাশে উঠিয়াছিল, সে ফানুসের মতই অদৃশ্য হইয়া গেল। শুধু মানুষকে ভয় দেখাইয়া একটু মজা করিয়া চলিয়া গেল।

বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া এবং অাঁক কষিয়া প্রমাণ করিয়া দিলেন যে চটির আকারবিশিষ্ট যে বস্তু আকাশে উঠিয়াছে তাহা বস্তুতঃ একটি গ্রহাণু বা অ্যাস্টেরয়েড। অনতিবিলম্বে অভ্রান্ত নিয়মানুসারে চন্দ্রের সঙ্গে পৃথিবীর ধাক্কা খাইয়া এই দুই জ্যোতিষ্ক পৃথিবীর উপর হুড়মুড় খাইয়া পড়িবে এবং পৃথিবীর ধ্বংস অনিবার্য। তখন সকলেই পরকালের চিন্তায় মগ্ন হইয়া পড়িল, আধুনিক অ্যাস্ট্রনমি প্রাচীন অ্যাস্ট্রলজির কাছাকাছি আসিয়া গেল, ধর্মযাজকেরা নিজ নিজ ধর্মমতানুসারে পাপের জন্য অনুতাপ এবং ভগবানের কাছে প্রার্থনার নির্দেশ দিলেন এবং সবাই দ্বেষ ভুলিয়া বিশ্বমৈত্রীতে আত্মনিয়োগ করিল। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা একাধিকবার পৃথিবীর অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের কথা বলিয়া আসিতেছেন। যে কোন দিন যে কোন মুহূর্তে সতত সঞ্চরণশীল কোন মহাজাগতিক রশ্মি পৃথিবীকে স্পর্শ করিলে পৃথিবী ধূলিমুষ্টিতে পরিণত হইবে আর তাহা না হইলেও যে সূর্যদেহ হইতে পৃথিবী যথাযোগ্য পরিমাণ আলো ও তাপ পাইতেছে তাহাই তো ধীরে ধীরে নিস্তেজ হইয়া আসিতেছে। একদিন মুমূর্ষু সূর্য আর তাপ ও আলো দিতে পারিবে না এবং তাহারও আগে সংকোচনের ফলে সূর্য পৃথিবীকে

আগের মত আকর্ষণ করিতে পারিবে না। সুতরাং পৃথিবীর ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

'গগন-চটি' গল্পে পরশুরাম যে সম্ভাব্যতার খুব প্রাণবন্ত বর্ণনা দিয়াছেন তাহাও উড়াইয়া দেওয়া যায় না। নভোমণ্ডলে ছোট বড় এত জ্যোতিষ্ক আনাগোনা করিতেছে এবং তাহাদের সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এত অসম্পূর্ণ যে, ইহাদের কোন একটি উৎক্ষিপ্ত হইয়া আসিয়া পৃথিবীকে পিষিয়া ফেলিতে পারে, ইহা বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত থিওরির সঙ্গে বেমানান হইবে না। এইরূপ সম্ভাবনায় মানুষের মনে যে বিচিত্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল তাহাই সাহিত্যের মুখ্য আকর্ষণ। সামগ্রিক ধ্বংসের মুখোমুখি হইয়াও মানুষ দম্ভ ধাপ্পাবাজি আত্মপ্রচার সত্যগোপন প্রভৃতি দুর্বলতা পরিত্যাগ করিতে পারে না। ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় শংকরাচার্যের উত্তরাধিকারীর সুদীর্ঘ পুস্তিকা প্রচারে; সেই পুস্তকের ক ও খ তফসীলে তিনি যে তুচ্ছাতিতুচ্ছ পাপের তালিকা দিয়াছেন তাহা পড়িয়া সন্দেহ হয় যে তিনি যত বলিতেছেন তাহা অপেক্ষা লুকাইতেছেন অনেক বেশি। অপর দিকে প্রলয়ের প্রাক্কালে বিশ্বমৈত্রীতে পাকিস্তানও সম্মতি জানাইল, লেকিন আগে কাশ্মীর চাই। কমিউনিস্টরা বস্তুবাদী, কিন্তু আসন্ন ধ্বংসের মুখে তাঁহারাও একটা রফা করিলেন; ভারতের কমিউনিস্ট প্রজাবৃন্দের জন্য রাষ্ট্রপতি যাহাতে গয়ায় পিণ্ডদানের বন্দোবস্ত করেন সোভিয়েট রাশিয়া এইরূপ অনুরোধ করিলেন। যাঁহারা ধর্মবিশ্বাসী তাঁহারা ঈশ্বরের কাছে সদলবলে তাঁহাদের প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। প্রার্থনার বিনিময়ে পরকালে শান্তি ও ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ ইঁহাদের কাম্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের হরবল্লভ কিন্তু এই সকল ধর্মপ্রাণ লোকদের অপেক্ষা বেশি ব্যবসায়-বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। ঝড়ের বেগে দেবীরাণীর বজরা কাত হইল এবং সব লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল। হরবল্লভ ভাবিলেন, 'নৌকোখানা ডুবিয়া গিয়াছে, আমরা সকলে মরিয়া গিয়াছি, এখন আর দুর্গানাম জপিয়া কি হইবে।' হরবল্লভের অপেক্ষাও পাকাবুদ্ধির পরিচয় দিলেন হাটখোলার ভুবনেশ্বরী দেবী। তাঁহার যুক্তি সরল, সহজ, আত্মবিশ্বাস অটল। বৈজ্ঞানিকেরা যে কোটি কোটি বৎসরান্তে পৃথিবীর অবশ্যম্ভাবী বিলোপের অথবা এখনই আকস্মিক কোন আলোড়নে তাহার ধ্বংসের কথা আলোচনা করেন অথবা ধর্মযাজক বা অন্য সবাই মনুষ্যজাতির নিশ্চিহ্ন হওয়ার সম্ভাবনায় শিহরিয়া উঠেন—ইহা তাঁহার কাছে

বোকামি বা প্রলাপোক্তি। মনুষ্যজাতির পক্ষ হইয়া ভগবানের কাছে প্রার্থনা নিরর্থক, কারণ মনুষ্যজাতি না থাকিলে ভগবান নিজেই বেকার হইয়া পড়িবেন, মানুষ না থাকিলে তাঁহার লীলাও বন্ধ হইয়া যাইবে; মানুষ মরিয়া গেলে ভগবানের বাঁচিয়া থাকায় লাভ কি? রবীন্দ্রনাথই তো বলিয়াছেন, 'আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে।' গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, 'হয়তো ভুবনেশ্বরীর কথায় ত্রিভুবনেশ্বরের একটু চক্ষুলজ্জা হল।' যে কারণেই হউক, গগন-চটি কিছুদিনের মধ্যেই অদৃশ্য হইয়া গেল। কিন্তু কবি গোল্ডস্মিথ-বর্ণিত গ্রাম্য স্কুল-মাস্টারের মত বিজ্ঞানীরা হটিয়া গেলেও তর্ক করিতে ছাড়েন না। অথবা পরশুরামের বিরিঞ্চিবাবার মত ভাঙিলেও মচকান না। সুতরাং তাঁহারা একযোগে জানাইয়া দিলেন, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস আর নেপচুন এই চারটি প্রকাণ্ড গ্রহের সঙ্গে এক রেখায় আসার ফলে তুলনায় ক্ষুদ্র উপগ্রহ গগন-চটির পিছনে টান পড়ায় সে দ্রুতবেগে সরিয়া গিয়াছে। এই সুলিখিত, সুগঠিত, বক্রোক্তিপূর্ণ রচনাটি বৈজ্ঞানিক বাহাদুরির উপর কৌতুকহাস্যের রশ্মি বিকিরণ করিয়াছে এবং একজন সাধারণ রমণীর সহজ ধর্মবিশ্বাসের মধ্য দিয়া যাজক সম্প্রদায়ের জারিজুরিকে লজ্জা দিয়াছে। বিজ্ঞানীরা এত সূক্ষ্ম হিসাব করিতে পারেন কিন্তু যে অমোঘ নিয়মে গগন-চটি পিছনে সরিয়া গেল সেই আঁক কষিতে পারেন নাই!

(২)

ইহকাল এবং পরকালের বা একই কালের মধ্যে বিভিন্ন যুগের সম্মিশ্রণে যে সাদৃশ্য ও বৈপরীত্য দেখা যায় তাহা একাধিক গল্পে হাস্যরসের খোরাক যোগাইয়াছে। পুরোভাগে রাখিতে হইবে 'তিন বিধাতা'—গল্প-কল্প, যেখানে কালের অধীশ্বর তিন বিধাতা—হিন্দুদের প্রজাপতি ব্রহ্মা, ইহুদী ও খৃষ্টানদের জেহোবা বা গড এবং ইসলামের আল্লার প্রতিনিধি পীর সাহেব একত্র হইয়াছেন। এখানেও কে প্রধান ইহা লইয়া কিছু বিতর্ক উঠিয়াছে এবং কালের সমস্যাও উঠিয়াছে কারণ এইসব ক্ষেত্রে প্রাচীনত্বই প্রাধান্যের মাপকাঠি হইয়া থাকে। তবু সেই সমস্যা আপসে মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু দেখা গেল শয়তানের অভ্যাগমে তিন বিধাতাই পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন। লেখক বোধ হয় বলিতে

চাহেন যে, সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরকে মানিলে অমঙ্গলের উপস্থিতির কোন সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না এবং সেই দিক দিয়া সকল ধর্মই অসম্পূর্ণ। ইহা অংশতঃ প্রবন্ধ এবং অংশতঃ গল্প। গল্পের মধ্যে সবচেয়ে মুখরোচক ব্যাপার পীর সাহেবের সোজা প্রশ্ন : চার দিকে চার মুখ লইয়া ব্রহ্মা ঘুমান কেমন করিয়া? ইহার পরে ব্রহ্মা যে স্বীকারোক্তি করিয়াছেন তাহাও স্মরণীয়। দেবতা মানুষ সৃষ্টি করেন আবার দেবতারাও মানুষেরই সৃষ্টি।

আর একটি গল্প কল্প এই পর্যায়ের রচনার পুরোভাগে আলোচিত হইতে পারে। এই রচনায় অটলবাবু জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে অন্তিম শয্যায় শয়ান হইয়া পরকালের চিন্তা করিয়াছেন। জীবিতকালে অটলবাবু নাস্তিক ছিলেন, কিন্তু মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছিয়া তাঁহার মনে হইল পরকাল থাকিতেও পারে এবং সেইখানে তাঁহার পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ প্রভৃতির সঙ্গে দেখা হইতে পারে। কিন্তু তিনি আধুনিক কালের লোক, আধুনিক কালের বৈজ্ঞানিক চিন্তা তাঁহার পরলোকসঞ্চারী কল্পনাকে ঝাপসা করিয়া ফেলিল। মৃত্যুর পর তাঁহার প্রয়াত গুরুজনদিগকে প্রণাম করিতে হইবে। কিন্তু আত্মা যদি অবিনশ্বর হয় তাহা হইলে তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইবে তাঁহার পিতা, তস্য পিতা, তস্য পিতা, তস্য পিতা, তস্য পিতা—এমনি করিয়া আদিমতম মানুষ, তারপর মানুষের পূর্বপুরুষ পশু, সরীসৃপ, কৃমি, কীট কীটাণু পর্যন্ত। সবাই তাঁহার জ্ঞাতি ও আত্মীয়। যিনি ইহকালে জনকয়েক আত্মীয়স্বজনের সান্নিধ্য পরিহার করিতে চাহিতেন তিনি পরলোকে এই অগণিত আত্মীয়ের অরণ্যে কি করিবেন? এই জাতীয় দুশ্চিন্তার দ্বারা কণ্টকিত অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তারপর কোথায় গেলেন, স্বর্গে? না, নরকে? না, ত্রিশঙ্কুর মত শূন্যলোকে? তাহা অটলবাবুই জানেন। অথবা হয়ত তিনিও জানেন না। বিভিন্ন চিন্তাধারার এই জাতীয় সম্মিশ্রণ এবং এই জাতীয় সুদূরপ্রসারী গাণিতিক অনুসন্ধিৎসা পরশুরামের সৃষ্টির একটি মূলসূত্র। তাহাই এই গল্প-কল্পের তাৎপর্য।

মৃত্যুর পর কিছু আছে কি না, থাকিলে কোথায় গিয়া কাহার কাছে উপস্থিত হইবেন এই সকল কথা ভাবিয়া নাস্তিক অটলবাবু অন্তিম শয্যায় দিশাহারা হইয়া চক্ষু বুজিয়াছিলেন। তিনি কোথায় গিয়াছিলেন হয়ত মৃত্যুর পরেও তাহা নিজেই জানিতে পারেন নাই। পরকালের অনিশ্চয়তা সম্পর্কে ভীতি ও

উদ্বেগ থাকিলেও ইহলোকের প্রতি তাঁহার বিশেষ কোন আসক্তি ছিল বলিয়া মনে হয় না। রাঘবপুর গ্রামের সমাজপতি কাশীনাথ সার্বভৌমের পরিণতি অন্য রকমের। তিনি ধর্মবিশ্বাসী আচারপরায়ণ লোক; শতায়ু হইয়া মাত্র পঞ্চাশ বৎসর নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন এবং তারপর একশত বৎসর স্বর্গসুখ উপভোগ করিয়া পুণ্যফল শেষ করিয়া স্বেচ্ছায় নিজ বংশেই তাঁহার একাদশ সংখ্যক বংশধর চক্রধর মুখুজ্যের ঘরে অবতীর্ণ হইলেন। যমরাজের কৃপায় তাঁহাকে নয় মাস গর্ভবাস করিতে হইল না, শৈশব অতিক্রম করিতে হইল না; একেবারে পঁচিশ-তিরিশ বৎসরের যুবক অবস্থায় বাড়িতে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সংস্কার, আচার, ধর্মবিশ্বাস সবই কিন্তু অক্ষুণ্ণ রহিয়া গেল। দেড়শ বছরের ব্যবধানে এই সব বিষয়ে যে ঘোর পরিবর্তন আসিয়াছে তাহার সম্পর্কে তাঁহার কোন চৈতন্য নাই। সুতরাং প্রতিপদে তিনি ঠোক্কর খাইতে লাগিলেন। যমরাজ ইহা আন্দাজ করিয়াছিলেন; তাই পূর্ব হইতেই এই পরিস্থিতি হইতে নিষ্ক্রমণের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। কাশীনাথ সেই উপায়েই বর্তমানের ম্লেচ্ছাচারগ্রস্ত পাপসংসার হইতে বিদায় লইয়া যমলোকে প্রয়াণ করিলেন। দেড়শ বছরের ব্যবধানে আচার বিচার ও সামাজিক ব্যবহারে যে ব্যবধান হইয়াছে তাহার ফলে উদ্ভূত সংঘাতের চিত্র খুব মামুলি ধরনের। এই গল্পের পরিকল্পনা যে সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে গ্রন্থকার তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই।

কাশীনাথ সার্বভৌম বর লইয়াছিলেন মৃত্যুর পর যমরাজার নিকট হইতে এবং সেই বর লইয়া তিনি পুনরায় নিজ গৃহে অর্থাৎ একাদশ সংখ্যক বংশধরের গৃহে আবির্ভূত হইয়াছিলেন—তাঁহার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করিতে। রাজা দশকরণ জীবিত অবস্থায়ই স্বয়ং ব্রহ্মার বর লইয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন—দশ গুণ ভোগ করিবার আকাঙ্ক্ষায় দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দশ গুণ করিয়া লইলেন। কিন্তু সুবিধা হইল না। মন একই থাকিয়া গেল। দশটি রসনার দশ রকম আস্বাদ, কুড়িটি চোখের কুড়ি রকমের দৃষ্টি এমন তালগোল পাকাইয়া দিল যে দশকরণ অতিশয় বিপর্যস্ত বোধ করিয়া পুনরায় ব্রহ্মাকে স্মরণ করিলেন। এবার আবদার করিলেন যে দশ গুণ দৈহিক শক্তি ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জন্য দশটি মন দিতে হইবে; তাহা না হইলে বিপুল ও বিচিত্র শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করা যায় না। ব্রহ্মা এবারও সায় দিলেন। কিন্তু দশকরণের সমস্যার কোন সমাধান হইল না।

প্রথম বরের ফলে নানা অনুভূতির সমাহারে কেন্দ্রস্থ মন আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। এবারকার বরের ফল হইল বিপরীত ; দশটি মন দশ দিকে চলিতে চাহে এবং ইহাদের বৈচিত্র্যে ও বিরুদ্ধতায় দশকরণ বিভ্রান্ত হইয়া আবার ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। এবার তাঁহার প্রার্থনা—বিধাতা যে বর দিয়াছিলেন তাহা ফিরাইয়া নেন। তিনি যেমন ছিলেন তেমন হইতে চাহিলেন। ব্রহ্মা এবারও বলিলেন, তথাস্তু। দশকরণ পুনরায় দশকরণ হইলেন। কিন্তু রাজ্যে আর ফিরিয়া গেলেন না। তাঁহার রাজ্যও রহিল না, স্ত্রীপুত্র কেহই কাছে থাকিলেন না। তাঁহার ব্যক্তিগত স্বার্থ বলিয়া কিছু রহিল না ; কাজেই তিনি সাধারণ মানুষ হিসাবে সকলের সঙ্গে মিশিয়া গেলেন ; পরের কাজই তাঁহার কাজ, অন্যের সুখদুঃখই তাঁহার সুখদুঃখ। এইবার তিনি স্বস্তি পাইলেন এবং ব্যাপক ভোগের আসক্তি তৃপ্ত হইল কারণ ভোগের শক্তিও বাড়িয়া গেল। ইহাকেই বলা যাইতে পারে, ভূমৈব সুখম্। আপনার তরে আসে নাই কেহ ধরণী পরে প্রত্যেকে আমরা পরের তরে—এই কবিবাক্য তাঁহার জীবনে সার্থক হইল। এখানে নীতিকথা এত প্রকট যে ইহাকে ঠিক গল্প বলা যায় কি না সন্দেহ। সাহিত্যের দিক হইতে শুধু একটি পরিবর্তন লক্ষণীয়। ঐশ্বর্য ক্ষমতা ও সাংসারিক ভোগ-সুখে আকণ্ঠ নিমগ্ন থাকিয়া দশকরণ হাঁপাইয়া উঠিয়াছিলেন ; তবু অগ্নিতে ঘৃতাহুতির মত ভোগের আধিক্য শুধু অধিকতর ভোগের আকাঙ্ক্ষাই জাগ্রত করিয়াছিল। সেইজন্যই তিনি এক দেহে দশ দেহের পরিতৃপ্তি চাহিয়াছিলেন, এক মনের পরিবর্তে দশ মন দিয়া উপলব্ধির জন্য লালায়িত হইয়াছিলেন। তখন তিনি অস্বাস্থ বোধ করিয়াছেন এবং বার বার ব্রহ্মাকে উত্ত্যক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন তিনি অপরের মধ্যে নিজেকে বিলাইয়া দিয়াছেন, তখন দীর্ঘ পাচ বৎসরে ব্রহ্মার কথা ভাবিবার ফুরসুৎও তাঁহার ছিল না। বরং ব্রহ্মাই উপ-যাচক হইয়া তাঁহার খোঁজ করিতে আসিয়াছেন। তাঁহার এই রূপান্তর সাহিত্য-গুণোপেত।

কাশীনাথ সার্বভৌম মৃত্যুর দেড়শত বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করিয়া আধুনিক কালের সঙ্গে নিজেকে মানাইয়া লইতে না পারিয়া যমালয়ে ফিরিয়া গেলেন। 'কাশীনাথের জন্মান্তর' গল্পের সঙ্গে 'ধুস্তুরী মায়া'র বেশ মিল আছে। উভয় গল্পই রূপকথার সামিল ; উভয়ত কালের ব্যবধান ঘুচাইয়া ফেলিবার চেষ্টা য়াছে আবার উভয় গল্পের নায়কই আধুনিকা মহিলার কবল হইতে মুক্তি

পাইবার জন্য পূর্ব জায়গায় ফিরিয়া গিয়াছেন। আর একটি বিষয়েও এই দুই গল্পে মিল আছে, উভয়ত্র নায়ক নায়িকাকে টাকার লোভ দেখাইয়াছেন এবং টাকার লোভেই নায়িকারা—গন্ধেশ্বরী ও স্পন্দচ্ছন্দা—বিবাহের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছেন। কবি গ্রে (Gray) বলিয়াছেন :

What female heart can gold despise ?
What cat's averse to fish ?

উভয়ের বক্তব্য বিষয় এক হইলেও গল্প হিসাবে 'ধুস্তুরী মায়া' 'কাশীনাথের জন্মান্তর' অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। 'ধুস্তুরী মায়া'য় উদ্ধব (উমেশ) পালের সঙ্গে স্পন্দচ্ছন্দার বৈপরীত্যের খুব উজ্জ্বল চিত্র আঁকা হইয়াছে এবং ইহাদের প্রস্তাবিত মিলনের বিপর্যয়ও খুব স্বাভাবিক অথচ একেবারে আকস্মিক। আচারে, রুচিতে কাশীনাথ ও তাহার ভাবী পত্নীতে খুব বেশি পার্থক্য নাই; কাশীনাথ নিজের টাকা হাতছাড়া করিতে চাহেন না এবং বিগতযৌবনা গন্ধেশ্বরীর বিবাহের ব্যাপারে একমাত্র লক্ষ্য কাশীনাথের টাকা। উদ্ধব ও স্পন্দচ্ছন্দার সর্ববিষয়েই পার্থক্য। পাত্রের অনেক টাকা, তাহা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত আছে, আর পাত্রীর নামের চটক আছে, আচারে ব্যবহারে পালিশ আছে, মার্জিত রুচি ও শিক্ষাদীক্ষার ঠমক আছে, কিন্তু আসলে সবই শূন্যগর্ভ। ফোর্থ ক্লাস পর্যন্ত পড়া বর উদ্ধব পাল প্রথমেই স্পন্দচ্ছন্দা নাম উচ্চারণ করিতে না পারায় ইহাকে পদ্মরাণীতে পরিবর্তিত করিয়া তথাকথিত রাজকুমারীকে উপহাসাস্পদ করিয়া ফেলিলেন এবং ইহাও দেখা গেল যে বাহিরে যতই বড়াই করুন, কোন একটি পরীক্ষাও তিনি পাস করেন নাই। তারপর, উদ্ধব রঙের ব্যবসায় করিয়া লক্ষপতি হইয়াছেন, রঙের খুঁটিনাটি সবই তাঁহার নখাগ্রে। সুতরাং পদ্মরাণীর রঙের জৌলুস যে প্রায় সবটাই কৃত্রিম তাহা তিনি সহজেই ধরিয়া ফেলিলেন এবং ইহাও বলিলেন যে, রঙের মিশ্রণে তাঁহার মত বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিলে তাঁহার ভাবী পত্নী আরও একটু উজ্জ্বল দেখাইতে পারিতেন। রাজকুমারীর ঐশ্বর্যও যে প্রায় কাল্পনিক তাহাও সহজেই ধরা পড়িল; তবে লক্ষপতি বর ভাবী গৃহিণীর অর্থের তোয়াক্কা করেন না। কিন্তু আর একটি বিষয়ে এই পাকা ব্যবসায়ী ব্যবসায়ের কৌশল অবলম্বন করিয়া এই আধুনিক বিলাসিনীকে একেবারে নাজেহাল করিয়া ফেলিলেন। বয়স কমাইয়া বলা মেয়েদের মজ্জাগত দুর্বলতা। What Every Woman Knows নাটকে জেমস ব্যারি এই দুর্বলতা লইয়া

খুব সূক্ষ্ম রসিকতা করিয়াছেন। পরশুরামের উদ্ধবের স্থূল হস্তাবলেপ কম চমকপ্রদ নয়। বিগতযৌবনা অনূঢ়া স্পন্দচ্ছন্দা খুব হাতে রাখিয়া নিজের বয়স বলিলেন বাইশ ; দরাদরিতে সিদ্ধহস্ত উদ্ধব এই আধুনিক ঘৃতাচীর বয়স নির্ধারণ করিলেন বিয়াল্লিশ। স্পন্দচ্ছন্দা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলে পাকা ব্যবসায়ী অমনি বাইশ আর বিয়াল্লিশের মাঝামাঝি বত্রিশে নামিলেন এবং স্পন্দচ্ছন্দা তাহা বিনা আপত্তিতে মানিয়া লইলেন। ব্যারির অনুকরণ করিয়া বলিতে পারি, স্পন্দচ্ছন্দার বয়স অন্ততঃ তেত্রিশ !

এই গল্পের পরিণতি যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি স্বভাবানুগ। সে আমলের বাবা অল্প বয়সে স্কুল ছাড়াইয়া বিবাহ দিয়া উদ্ধবকে ব্যবসায়ে লাগাইয়া দিয়াছিলেন এবং বালিকা বধূ ঘরে আনিয়াছিলেন। উদ্ধব ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়াছেন, স্ত্রীর সেবাযত্নে ও গৃহিণীপনার নৈপুণ্যে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটাইয়াছেন ; কিন্তু আধুনিক কালের কালচার ফ্যাসান এবং উদ্ভিন্নযৌবন পুরুষ ও উদ্ভিন্নযৌবনা কুমারীর প্রেমের আদান-প্রদান দেখিয়া মনে আক্ষেপ জন্মিয়াছে কি যেন হারাইয়াছেন। সেই আক্ষেপের বশেই তিনি অলৌকিক প্রক্রিয়ায় তারুণ্য অর্জন করিয়া মাগিতব্যা স্পন্দচ্ছন্দা চৌধুরাণীর দ্বারস্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁহার সেবাপরায়ণা বহুকালের সতীলক্ষ্মী জীবনসঙ্গিনীর নামে কটূক্তি শুনিয়া ধৈর্য হারাইয়া ফেলিলেন এবং ধরা পড়িয়া যাওয়ায় এই অদ্ভুত কোর্টশিপের সেইখানেই অবসান হইল। এইরূপ আকস্মিক যবনিকা পতনে তাঁহার কোন ক্ষোভও নাই, প্রকৃতপক্ষে ইহা তেমন আকস্মিকও নয়, কারণ কোর্টশিপের মধ্যেই তিনি মনে মনে অনুভব করিতেছিলেন তাঁহার গন্তময় দাম্পত্য জীবনের কাছে এই নূতন প্রেম একেবারেই মেকি। কাজেই তিনি স্বচ্ছন্দচিত্তে পুরাতন জীবনে ফিরিয়া গেলেন।

স্পন্দচ্ছন্দা ও তাঁহার দূরসম্পর্কিত ব্যারিস্টার দাদা বা প্রণয়ী মকর রায়ের কিন্তু কোন লাভই হইল না। তাঁহারা নিছক টাকার লোভে এই অভিযানে অগ্রসর হইয়াছিলেন। মকর রায় বলিয়াছিলেন কাঁচ পোকা নৃত্য করে না, কিন্তু আরশোলা ধরিবার সময় নৃত্য করে। আরশোলার কবল হইতে সাময়িক ভাবে পলায়ন করিলেও মকর রায় মনে করিয়াছিলেন কোর্টের মাধ্যমে বিনা ক্লেশে লক্ষ টাকা পাওয়া যাইবে। কিন্তু ব্যাজমার কারসাজিতে তাহাও বিফল হইয়া গেল। বাস্তব জীবনে এই জাতীয় কাঁচ পোকা-নৃত্য হামেশাই দেখা যায় ;

কখনও শিকার ফসকাইয়া যায় আবার কখনও নৃত্য সফলও হয়। রূপকথা বাস্তবজীবনের সত্যকেই জমকালো রূপ দিয়া থাকে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি গল্পও আসিয়া পড়ে কারণ সেইখানেও বিভিন্ন কালের বৈপরীত্যই কমেডির উৎস। এই গল্পটির নাম 'জয়রাম জয়ন্তী'; জয়রামের শতায়ুপূর্তি ইহার বিষয়। এই গল্পটির মধ্যে রূপকথার কোনও স্পর্শ নাই। আজকালকার দিনের মানুষের আয়ু বাড়িয়া গিয়াছে। জীবিতকালেই জন্মশতবার্ষিক উৎসব পালন এখন আর অসম্ভব ঘটনা বলিয়া কেহ উড়াইয়া দিতে পারিবে না। জয়রাম খুবই সাধারণ লোক; ইংরেজ রাজত্ব থাকাকালে সিমসন স্মিথ কোম্পানীতে চল্লিশ বছর কাজ করিয়াছিলেন, শেষের বিশ বছর ছিলেন সেখানকার বড়বাবু। পেনসন লইয়া বাড়িতেই বসবাস করিতেছেন এবং শত বৎসর পূর্ণ করিয়াছেন। সেই শত বৎসর পূর্তির উৎসবই গল্পের উপলক্ষ্য। তবে এখন আর ইংরেজ রাজত্ব নাই, আগেকার ভারত সাম্রাজ্য পর্যন্ত দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে। জয়রামের চরিত্রের মধ্যে হাস্যরসের উৎস বিভিন্ন কালের সম্মিশ্রণ। তাঁহার বয়স একশত হইয়াছে, কানে কম শোনেন এবং বয়সের তুলনায় মোটামুটি সুস্থ থাকিলেও জরার অবক্ষয় এড়াইতে পারেন নাই, কিন্তু সুস্থ সবল মানুষের আকাঙ্ক্ষা অটুট রহিয়া গিয়াছে। হজমের শক্তি কমিয়া গিয়াছে, কিন্তু খাওয়ার লোভ পুরোদস্তুর আছে এবং নাতবৌ শিবানী সুকৌশলে তাঁহার এই দুর্দান্ত লোভকে ফাঁকি দিয়া পোষ মানাইয়া রাখে। তিনি তিনবার বিপত্নীক হইয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন এবং শতবর্ষ সমাপ্ত করিয়াছেন, কিন্তু এখনও চতুর্থবার দার পরিগ্রহের উৎসাহ যায় নাই। তিনি ইহাও জানেন যে স্ত্রীলোকের প্রধান প্রলোভন অর্থ ও গহনা; শুধু ভুলিয়া গিয়াছেন যে আর একটি বস্তুর আকর্ষণ তদধিক এবং তাহার নাম যৌবন। শতায়ু পুরুষ ও অনূঢ়া যুবতীর মধ্যে প্রস্তাব ও প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়া এই ভীমরতির উপহাস্যতা পরিস্ফুট হইয়াছে। জয়রাম লতিকা খাস্তগীরকে বলিলেন, 'এই লট্‌কী, তোকে পঞ্চাশ ভরি গোট দেব, দুহাতে *দশ-দশ* গাছা চুড়ি দিব, এই বাড়িখানা তোকে দিব, বিয়ে করতে রাজি আছিস?' লতিকা নার্স উত্তর দিল, 'আহা আগে বলেন নি কেন কত্তাবাবু, আর একজনকে যে কথা দিয়ে ফেলেছি। আপনি দেখুন না, যদি বুঝিয়ে সুঝিয়ে কি ভয় দেখিয়ে লোকটাকে ভাগাতে পারেন।'

গার্হস্থ্য জীবন হইতে বৃহত্তর সমাজজীবনের দিকে দৃষ্টি দিলেও দেখি

জয়রামের স্মৃতিতে বিভিন্ন যুগ, বিভিন্ন ব্যবস্থা মিশিয়া গিয়া এক অদ্ভুত খিচুড়ি পাকাইয়াছে। মার্কিন লেখক ওয়াশিংটন আর্ভিং-পরিকল্পিত রিপ ভ্যান উইংকিল চরিত্র সাহিত্যের অন্যতম চিরস্মরণীয় চিত্র। এই নিরীহ মানুষটি আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রাক্কালে একটা পানীয় উদরস্থ করিয়া গভীর নিদ্রায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। বেচারী দেশের বড় বড় ব্যাপারের কোন খোঁজ রাখিত না, তাহার একটানা নিদ্রাটাও চলিল পুরো বিশ বৎসর এবং এই অবসরে তাহার নিদ্রাভঙ্গের অব্যবহিতপূর্ব জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে আমেরিকা ইংরেজ রাজত্বের কবল হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছে। রিপ ইহার কোন খবরই রাখিত না; জাগিয়া উঠিয়া চারদিকের হৈ-হুল্লোড়, বিপ্লবীদের জয়ধ্বনি দেখিয়া ও শুনিয়া সে ঘাবড়াইয়া গেল। কিছুই না বুঝিতে পারিয়া, এই শান্ত লোকটি আত্মরক্ষার জন্য নিজেকে তদানীন্তন ব্রিটিশ রাজের —স্বাধীন আমেরিকার প্রধান প্রতিপক্ষ তৃতীয় জর্জের—একান্ত ভক্ত প্রজা বলিয়া পরিচয় দিয়া ফ্যাসাদের সৃষ্টি করিল। জয়রাম বিশ বৎসর ঘুমাইয়া কাটাইয়া দেন নাই, তিনি সমসাময়িক সংবাদাদি না রাখেন এমনও নহে, কিন্তু তিনি সিপাহীদের সংগ্রামের সময়ে জন্মিয়া থাকিবেন এবং মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে 'প্রাতঃস্মরণীয়া' রূপে জ্ঞান করিতে শিখিয়া সাহেবি কোম্পানীর সাহেবদের সেলাম দিয়াই কর্মজীবন কাটাইয়াছেন। সুতরাং স্বাধীন ভারতেও তিনি নিজেকে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ভক্ত প্রজারূপে পরিচিত করিতে চাহেন; তারপর যখন খেয়াল হইল যে ভিক্টোরিয়া অনেক কাল গত হইয়াছেন তখন তিনি রাণী এলিজাবেথ টু'র প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিলেন। এইভাবে তাঁহার স্মৃতিতে পিতামহ স্যার চার্লস সিমসন ও নাতি হ্যারি সিমসন এক দেহে লীন হইয়া গিয়াছেন। অবশ্য তিনি ইহাও জানেন যে ইংরেজরা চলিয়া গিয়াছেন, ভারতের প্রধান শাসনকর্তা জহরলাল নেহরু এবং দেশীয় লোকের শাসনে ভারতবর্ষের অধোগতি হইতেছে। তিনি ইংরেজদের শুভানুধ্যায়ী এবং ইংরেজ জাতির ভবিষ্যৎ লইয়া উদ্বিগ্ন। তিনি এই সকল বিষয়ে অনেক আজগুবি মন্তব্য ও উদ্ভট প্রস্তাব নিক্ষেপ করিয়াছেন। সামগ্রিকভাবে দেখিতে গেলে, এই গল্পে যে হাস্যরস সঞ্চারিত হইয়াছে তাহার মূলে রহিয়াছে বিভিন্ন যুগের ভাবধারার সম্মিশ্রণ ও বৈপরীত্য।

আরও কতকগুলি গল্পে পরশুরামের বন্ধনহীন কল্পনা তুচ্ছ বাস্তব ঘটনাকে

অতিক্রম করিয়া অবাধে সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কয়েকটির আলোচনা করিলেই তাঁহার প্রতিভার বৈশিষ্ট্য বোঝা যাইবে এবং কোথায় ও কেন তাঁহার সৃষ্টি সীমিত সাফল্য লাভ করিয়াছে তাহারও আভাস পাওয়া যাইতে পারে। দুই-একটি গল্প শুধু মুখরোচক কাহিনী। পড়িয়া মনে হয়, এমন হইলে বেশ হইত ; এইসব ক্ষেত্রে গভীর কোন সত্যের কোন উপলব্ধি হয় না। উদাহরণ স্বরূপ 'আতার পায়েস' গল্পের উল্লেখ করা যাইতে পারে। কয়েকটি ছেলে ছুটিতে বেড়াইতে যাইয়া কোন এক :খালি বাড়িতে ঢুকিয়া কয়েকটি পেয়ারা তুলিতেছিল, এমন সময় গৃহস্বামী প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং চুরি করার জন্য তিরস্কার করিলেন। গৃহিণী কিন্তু তাহাদিগকে আতার পায়েস দিয়া আপ্যায়ন করিলেন। তারপর বাড়ি ফিরিয়া ছেলেরা দেখিতে পাইল, যে অনুপস্থিত গৃহস্বামী ও গৃহিণী তাহাদিগকে চোর ধরিয়াছিলেন, তাঁহারাই ছেলেদের অনুপস্থিতিতে ছেলেদের বাড়ি হইতে আতা অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন এবং সেই চোরাই মাল দিয়াই ছেলেদিগকে আপ্যায়ন করিয়াছিলেন।

ইহার পর অন্য রকমের একটি কাহিনীর উল্লেখ করা যাইতে পারে। হোমারের ওডেসীতে সার্সের আখ্যানে লিখিত আছে মোহিনী সার্সে মানুষকে শূকরে পরিণত করিতেন—এই সার্সে দেবীপদবাচ্যা। মিল্‌টন কোমাস-নাট্য-কাব্যে বলিয়াছেন :

(Who knows not Circe
The daughter of the Sun ? Whose charmed Cup
Whoever tasted, lost his upright shape,
And downward fell into a groveling Swine.)

আমাদের দেশেও প্রবাদ ছিল কামরূপ-কামাখ্যার ভৈরবীরা মোহজাল বিস্তার করিয়া মানুষকে ভেড়ায় রূপান্তরিত করেন। এই প্রবাদকে অবলম্বন করিয়া পরশুরাম 'কামরূপিণী' গল্পে এক practical joke-এর বর্ণনা দিয়াছেন। গল্প বলিতেছেন শীতুমামা, আসামের এক মহিলা মায়াবিনী ও তাঁহার মেয়ে মোহিনী সম্পর্কে। যতদূর দেখা যায় ইঁহারা সুরূপা কিন্তু নাকটা একটু মঙ্গোলীয় ধরনের। একটা পিকনিকের ব্যবস্থা হইয়াছে, ইঁহারা সেখানে অনেক খাবার—বেশির ভাগ মটন বা ভেড়ার মাংস—লইয়া উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু মোহিনীর স্বামী সুকোমল

গুপ্ত অনুপস্থিত। স্ত্রী মোহিনী তাচ্ছিল্যের সহিত এই অনুপস্থিতির কারণ এই ভাবে উড়াইয়া দিলেন, 'সুকোমল? তার কথা আর বলবেন না, পুওর ফেলো। কোথায় উধাও হয়েছে কিছুই জানি না।' এই মন্তব্যে তাঁহার মা যা যোগ করিলেন তাহাতে ব্যাপারটা আরও ঘোরালো হইয়া উঠিল। শীতুমামা কৌশলে যে ইঙ্গিত করিলেন তাহাতে 'কামরূপ-কামিখ্যে'র এই দুই মহিলা নিজেদের স্বামীদের ভেড়া বানাইয়াছিলেন এবং কে বলিবে, যে 'পবিত্র ভেড়ার মাংসে তৈরী' চপ কাটলেট প্রভৃতি মা ও মেয়ে চড়িভাতিতে পরিবেশন করিতে আনিয়াছেন তাহা ভেড়ায় রূপান্তরিত সুকোমল গুপ্তের মাংস কিনা! এই সম্ভাবনায় মেয়েরা পলায়ন করিল আর শীতুমামা নিবিষ্ট মনে প্রচুর পরিমাণে পেট ভরিয়া মাংস আহার করিলেন। ইহা বীভৎসরস ও হাস্যরস মিশ্রিত কাহিনী মাত্র; ইহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ আর্টের লক্ষণ নাই।

'শিবলাল' গল্পটিও উঁচুদরের নয়। তবে সেখানে আমাদের আটপৌরে বাস্তব এবং অতীত ইতিহাস ও কিংবদন্তীর মিশ্রণের সুযোগ পাইয়া গ্রন্থকারের কল্পনা অবাধে পক্ষবিস্তার করিতে পারিয়াছে। যখন কলিকাতা জনবহুল শহর হইলেও এখনকার মত জনাকীর্ণ হয় নাই, তখনও রাস্তায় ছোট বড় ষাঁড় স্বচ্ছন্দে ঘুরিয়া বেড়াইত এবং মাঝে মাঝে ষাঁড়ের লড়াইও দেখা যাইত। অনেক সময় কোন কোন ষাঁড় একটা পাড়ার অধিবাসী হইয়া পড়িত এবং যেহেতু ষাঁড় দেবাদিদেব মহাদেবের বাহন, পাড়ার লোকেরা তাহাদের প্রতি দাক্ষিণ্যও দেখাইত। আর কোন কোন ষাঁড় ছিল মুক্ত স্বচ্ছন্দচারী জীব; তাহারা কোন এক পাড়ায় আবদ্ধ থাকিত না। নগরীর এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত আস্তানা স্থাপন করিত।

এখন হইতে পঞ্চাশ-ষাট বৎসর আগেও হামেশাই যে সকল ষাঁড় রাস্তায় দেখা যাইত এবং মাঝে মাঝে যাহাদের গুঁতাগুঁতি বা লড়াই দেখিয়া রাস্তায় ভিড় জমিয়া যাইত সেই সময়ের কোন ছোট্ট ঘটনাকে অবলম্বন করিয়াই পরশুরামের কল্পনা মুক্তপক্ষ হইয়া 'শিবলাল' গল্পটি উদ্ভাবন করিয়াছে। আমহার্স্ট স্ট্রীট-বাদুড়বাগান পাড়ায় লোহারাম-নামক একটি তরুণ ষাঁড় সুপরিচিত ছিল; শিবের বাহন বলিয়া ষাঁড় হিন্দুদের কাছে অবধ্য, নমস্য জীব। পাড়ার লোহাওয়ালারা তাহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত এবং তাহার ভরণপোষণে সাহায্য করে। সেই পাড়ায় এক বৃহদাকার প্রবীণ ষাঁড় কোথা হইতে আসিয়া হাজির

হইল এবং প্রবীণে-তরুণে ঠেলাঠেলি যুদ্ধ লাগিয়া গেল। সেই যুদ্ধ দেখিতে এত লোক-সমাগম হইল যে,—তখনকার দিনে অচিন্তনীয়—ঘণ্টাখানেকের জন্য ট্র্যাফিক-জ্যাম হইয়া গেল। ঘণ্টাখানেক লড়াইয়ের পরে লোহারাম পৃষ্ঠভঙ্গ দিল এবং প্রবল জয়ধ্বনির মধ্যে জেতা শিবলালজী পাড়ার দুইটি খাবারের দোকানে ঢুকিয়া তাহাদের ভাণ্ডার নিঃশেষ করিয়া আপন মনে চলিয়া গেল। এই শিবলাল আকারে বিরাট, বয়সে প্রাচীন, শক্তিতে অজেয়। পরশুরামের কল্পনা ইহার সম্পর্কে যে জনশ্রুতি রচনা করিয়াছে তাহা বিস্ময়কর এবং কোলরিজের প্রাচীন নাবিকবর্ণিত কাহিনীর মত অসম্ভব হইলেও অবিশ্বাস্য নয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে লোহারামের সঙ্গে লড়াইয়ের সাক্ষী হরদয়ালবাবু ইহার সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার পিতামহ ইঁহাকে কাশীতে দেখিয়াছিলেন আর পিতামহের পিতামহের সঙ্গে ইঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল হরিদ্বারে। তাহার আগে যে শিবলাল কোথায় ছিলেন তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা না গেলেও ইনি যে সুপারবিস্ট (super-beast) তাহা নানা তথ্য হইতে সহজেই অনুমান করা যায়। একবার ঝাঁঝার জঙ্গলে এক বাঘের সঙ্গে ইঁহার যুদ্ধ বাধে। পরে সেই জঙ্গলে এক বাঘের মৃতদেহ পাওয়া যায়। ইঁহার দেহের আকার ও আয়তনও পুরাণবর্ণিত মহোক্ষের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় এবং ইঁহার অন্যান্য কীর্তিকলাপও মহোক্ষেরই অনুরূপ। মহেঞ্জদড় ও হরপ্পায় খনন করিয়া যে সকল শীলমোহর পাওয়া গিয়াছে,তাহাদের মধ্যে বৃষের মূর্তি আছে এবং সেই সকল মূর্তির সঙ্গে শিবলালজীর চেহারার খুব মিল আছে। মনে করা যাইতে পারে যে, সেই প্রাচীনকালেও সৈন্ধব জাতিরা শিবের উপাসক ছিলেন এবং সেইজন্য শিবের বাহন ষাঁড়কেও পূজার্হ বলিয়া মনে করিতেন। কে বলিবে যে এই শিবলাল সেই সৈন্ধবজাতিদেরই সমসাময়িক এবং বিভীষণের মত 'চিরঞ্জীব' কিনা? এইভাবে বাস্তব ভিত্তির উপর কল্পনা একটির পর একটি ঘটনা যোজনা করিয়া এক অপূর্ব কাহিনী রচনা করিয়াছে?

দুইটি আজগুবি কাল্পনিক গল্প নাটকাকারে লিখিত—'মহাবিদ্যা' ও 'উলট-পুরাণ'। ইহাদের দ্বিতীয়টি ('উলটপুরাণ') এক সময়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, কিন্তু ইহাদের কোনটির মধ্যে উচ্চাঙ্গের সৃজনীপ্রতিভার পরিচয় নাই। আমাদের দেশে একটা প্রবচন আছে—চুরিবিদ্যা বড় বিদ্যা যদি ধরা না পড়ে। 'মহাবিদ্যা' গল্পটি এই প্রবচনেরই সম্প্রসারণ। রাজা, নবাব, জমিদার, সাংবাদিক,

রাজনীতিক, দেশী ও বিদেশী বণিক, মজুর—সব শ্রেণীর লোকই অপরকে ফাঁকি দিয়া সহজে কাজ গুছাইতে চায়। ইঁহাদের মান মর্যাদা, বুদ্ধির কৌশল, পরোপচিকীর্ষা, ক্রিয়াকলাপ—সবই এই এক উদ্দেশ্যে নিয়োজিত—সবাই গেঁড়াতলার সর্দার গাট্টালালের জাতভাই। সেইজন্য সকলেই মহাবিদ্যা অর্থাৎ চুরিবিদ্যার স্কুলের ছাত্র এবং এই বিদ্যার প্রচারক হইলেন 'জগদ্গুরু'। জীবন-সংগ্রামে পশ্চিম অর্থাৎ ইউরোপ ও আমেরিকা জয়ী হইয়াছে—এই কথা ঘোষণা করিয়া রবীন্দ্রনাথ একদিন মৌচাকে ঢিল মারিয়াছিলেন। 'মহাবিদ্যা' রচনায় পরশুরাম এই তথ্যটিরই স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে চাহিয়াছেন। তিনি দেখাইতে চাহিয়াছেন, মহাবিদ্যা প্র্যাক্‌টিশ করিতে হইলে কতকগুলি থিওরির প্রয়োজন। অপর সকল বিদ্যা—বিজ্ঞান, অর্থনীতি, শিল্পসংগঠন প্রভৃতি—আয়ত্ত করিয়া তাহাদিগকে মহাবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। মহাবিদ্বান অপরের চক্ষে ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ করিলেও নিজে লক্ষ্য সম্পর্কে সদা সচেতন থাকিবেন অর্থাৎ অপরকে প্রবঞ্চনা করিলেও আত্মপ্রবঞ্চনা করিবেন না এবং যাহা কিছু করিতেছেন তাহা জগতের হিতের জন্য করিতেছেন এই মুখোশটি বজায় রাখিতে হইবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এই কথাগুলি যে সকল চরিত্রের মাধ্যমে প্রচার করা হইয়াছে তাহারা কেহই প্রাণবন্ত হইয়া উঠে নাই; তাহাদের কথোপকথনেও কোন নাটকীয় সংঘাত বা শাণিত বুদ্ধির উজ্জ্বলতা নাই। ইহা প্রবন্ধও নয় নাটক বা গল্পও নয়—ছদ্মসাহিত্য।

ইংরেজ রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে পর আধুনিক শিল্পসমৃদ্ধির দৌলতে, ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে, যন্ত্রজালের সুকৌশল বিস্তারের ফলে ইংরেজদের প্রভুত্ব ভারতবাসীদের জীবনে রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া যায়। যে অশিক্ষিত, নিরন্ন গ্রামবাসী কিছুই বুঝে না সেও ইহা জানিত যে সাহেবরা শ্রেষ্ঠ জাত এবং অর্ধ-শিক্ষিত ও শিক্ষিতদের মধ্যে সাহেবিয়ানার বহুল প্রচলন হয়। আবার প্রথম হইতেই ইংরেজদের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহও ধ্বনিত হইতে থাকে এবং নানা রকম আন্দোলন গড়িয়া উঠিতে থাকে। সাহেবিয়ানা যেমন একটা ফ্যাশন হইয়া উঠে আবার সাহেবিয়ানার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও একটা অন্য ধরনের ফ্যাশন হিসাবে সীমিত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ইংরেজ শুধু যে ভারতবর্ষেই তাহার প্রভুত্ব বিস্তার করে তাহা নহে, সমগ্র পৃথিবী ব্যাপিয়া তাহার আধিপত্য স্থাপিত হয় এবং তারস্বরে বলা হইতে থাকে যে ইংরেজ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না।

এখন অবশ্য ইংরেজের সেই প্রভুত্ব নাই। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও ইংরেজের প্রভুত্বলোপের কথা স্বপ্ন বলিয়াই লোকে মনে করিত এবং সংবাদপত্রে সমালোচনা বা সভাসমিতিতে প্রতিবাদ অনেকটা কৌতুকাবহ বলিয়া মনে হইত। আবার উৎকট সাহেবিয়ানাও অন্য সকল নকলনবিশীর মতই হাস্যাস্পদ বলিয়াই উপেক্ষিত হইত। এই উভয় প্রকারের উপহাস্যতাই পরশুরামের 'উলটপুরাণ' নাট্যকাহিনীর বিষয়। যখন ইংরেজ বিশ্ববিজয়ী, তখন তিনি কল্পনা করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ ইংল্যাণ্ড জয় করিয়াছে, সাহেবরা ভারতবাসীদের অনুকরণ করিতেছে, মেমরা শাড়ি পরিয়া খোঁপা বাঁধিতেছে এবং ইহা লইয়া একে অপরের সঙ্গে রেষারেষি করিতেছে, ছেলেমেয়েরা শুদ্ধ বাংলা উচ্চারণের জন্য মাথা ঘামাইতেছে, প্রভু ভারত সরকার প্রদত্ত উপাধির জন্য সাহেবরা লালায়িত হইতেছে, একদল পোশাকী দেশপ্রেমিক স্বায়ত্তশাসন দাবী করিতেছে এবং শাসকশ্রেণীর অনুচিকীর্ষার বিরুদ্ধে জিগির তুলিতেছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

যখন এই গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় তখন তাহার অভিনব অসম্ভাব্যতা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করিয়াছিলেন, ইহা 'পরিকল্পনার মৌলিকতায় উজ্জ্বল—topsy turvydom বা বর্তমান অবস্থার সম্পূর্ণ বৈপরীত্যমূলক চিত্রের জন্য উপভোগ্য।' কিন্তু সেই অবস্থা এখন আর 'বর্তমান' নয়; যে চিত্রগুলির মধ্য দিয়া এই অভিনব পরিকল্পনা রূপায়িত হইয়াছে, তাহাদের কোন নিজস্ব দীপ্তি নাই এবং সেই কারণেই ইহার রস ফিকে হইয়া গিয়াছে। এখন এই গল্পটি পড়িলে জনৈক ইংরেজ সাহিত্য-সমালোচকের একটি তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি মনে পড়ে, যে সাংবাদিকতা টিকে থাকে তাহা সাহিত্য আর যে সাহিত্য টিকে থাকে না তাহা সাংবাদিকতা। 'উলট-পুরাণ' এই শেষের শ্রেণীর রচনা—ইহা সাহিত্যনামধেয় হইলেও মূলতঃ সাংবাদিকতা।

এই নাট্যকাহিনীর একটি টুকরা পরিকল্পনা প্রকাশের সময়ও পরিহাসের উপকরণ যোগাইয়াছিল এবং এখনও তাহা ম্লান হয় নাই। তাহা হইল সেই আমলের দুর্দান্ত ইংরেজ-সার্জেণ্টের জায়গায় ভারত গভর্ণমেণ্টের উড়িয়া পুলিসের সাহায্যে ইংল্যাণ্ডের প্রজাদের দমনের কথা। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, জনবহুল এই বিরাট উপমহাদেশে বিভিন্ন জাতি বা প্রদেশবাসীদের সম্পর্কে নানা কিংবদন্তী, নানা অপবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে এবং ইহা লইয়া হাস্য-

পরিহাস, ব্যঙ্গবিদ্রূপ করা হইয়া থাকে। অবশ্য সীমা অতিক্রম করিলে এই জাতীয় পরিহাস সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে পরিণত হয়। পরশুরামের এই শ্রেণীর রসিকতার প্রধান গুণ এই যে ইহা শুধু লঘু স্পর্শ করিয়া থামিয়া যায়, কোথাও বাড়াবাড়ি করে না। ইহার দ্বিতীয় গুণ সর্বব্যাপী নিরপেক্ষতা। উৎকল-বাসীদের সম্পর্কে জনরব এই যে তাহারা অপেক্ষাকৃত ভীরু ও পলায়নতৎপর; সেইজন্যই পরশুরাম দোর্দণ্ডপ্রতাপ ইংরেজ সার্জেণ্টদের স্থানে তাহাদিগকে দাঁড় করাইয়াছেন। বাঙালী বুদ্ধি-অভিমানী জাতি; কাজেই এঁচড়ে পাকা, অপরিণত বালকের যখন প্রয়োজন হইয়াছে তখন পরশুরাম এক বাঙালী স্কুলের ছাত্রকে নির্বাচন করিয়াছেন। ধনী ব্যারিস্টার পি. সি. মল্লিকের একমাত্র সন্তান রম্ভার বহু সম্প্রদায়ের বহু প্রণয়ী ছিল। একে একে সবাই কাটিয়া পড়িল; ধৈর্য ধরিয়া শেষ পর্যন্ত থাকিয়া গেল চারজন অথবা সাড়ে তিনজন, কারণ চতুর্থটি স্কুলের ছাত্র এবং তাহাকে আধা মানুষ বলা যাইতে পারে। সে বয়োজ্যেষ্ঠা রম্ভার একনিষ্ঠ প্রেমিক, কিন্তু ল সা. গু. গ. সা. গু অঙ্কও কষিতে শিখে নাই। রম্ভা তাহাকে ধমক দিয়া পরীক্ষার পড়া করিতে পাঠাইয়া দিল; সে বর্ষীয়ান প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রতি কটমট করিয়া তাকাইয়া প্রতিযোগিতা হইতে সরিয়া যাইতে বাধ্য হইল। 'শিবলাল' গল্পে বক্তা হরদয়ালবাবুর মতে, 'মহোক্ষ' শিবলাল কোন বিশেষ দেশের বা বিশেষ কালের জীব নহেন; ঘটনাচক্রে তিনি আমহার্স্ট স্ট্রীট পাড়ায় ওখানকার (বিহারী) কালোয়ারদের প্রতিপালিত ষাঁড় লোহারামের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। শিবলাল কসমোপলিটান। যুদ্ধান্তে তিনি বাঙালী ও হিন্দুস্থানী উভয়শ্রেণীর মিষ্টির দোকানের মালিকের সমস্ত ভাণ্ডার নিঃশেষে উদরস্থ করিলেন। কালোয়াররা তাহাদের আশ্রিত নও-জোয়ান লোহারামের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল। পক্ষ থাকিলেই প্রতিপক্ষ থাকিবে, বাঙ্গালী ছোকরারা বলিল, শিবলালের জয় নিশ্চিত। এই সহজ, সরল, কোন উদ্দেশ্যের দ্বারা অপ্রণোদিত 'বাঙ্গালী' শব্দটি শুনিয়া পাড়ার গান্ধী-টুপি আর লম্বাকোট পরা এক (বিহারী?) ভদ্রলোক ভাঙা বাংলায় বলিয়া উঠিলেন, 'এ হরদয়ালবাবু, এর ভিতর প্রাদেশিকতা আনবেন না। এ লড়াই বিহার ও বঙ্গালের মধ্যে হচ্ছে না।' এই স্পর্শকাতরতার দ্বারাই এই গান্ধীভক্ত স্বীয় প্রাদেশিকতার পরিচয় দিলেন। যতীশ মিত্তিরের কালো শ্রীহীন শ্যালিকা শ্যামা বা তমিস্রা নাগকে বিডন স্ট্রীট পাড়ার বজ্জাত ছেলেরা ও স্কটিশ চর্চ

কলেজেরআই এস্‌সি ক্লাসের সহাধ্যায়ীরা 'দাঁড়কাগ' বলিয়া ডাকিত এবং পরে সে ভাল কাজ পাইয়া বিহারে গণেশমুণ্ডায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেও এই প্রসিদ্ধি তাহার যায় নাই, কারণ ওখানে সে 'কৌআ দিদি' নামে পরিচিত হইল। মাঝখানে সে বি-এস্‌-সি ও এম্‌-এস্‌-সি পড়িয়াছিল মাদ্রাজে; কিন্তু সেখানে কেহ তাহাকে লক্ষ্য করিত না বা খেপাইত না। এই বর্ণনা শেক্সপীয়রের নাটকের একটা সরস উক্তি স্মরণ করাইয়া দেয়। ভাঁড় কবরখনককে জিজ্ঞাসা করা হইল, বিকৃতমস্তিষ্ক যুবরাজ হ্যাম্‌লেটকে ইংল্যাণ্ডে পাঠানো হইল কেন? সে নির্বিকারভাবে উত্তর দিল, ওখানে তাহার অসুখ সারিয়া যাইতে পারে। না সারিলেও কোন ইতরবিশেষ হইবে না, কারণ ওখানে তাহার রোগ কাহারও নজরেই পড়িবে না!

(৩)

এই অধ্যায়ে যে সমস্ত গল্প আলোচিত হইল, এক দিক দিয়া বিচার করিলে তন্মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'ভূশণ্ডির মাঠে'। যে কল্পনাবলে কবি ও শিল্পী সৃষ্টি করেন তাহাকে আমাদের শাস্ত্রে বলা হয় প্রতিভা অথবা অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমা শক্তি। কিন্তু আকাশকুসুম শশশৃঙ্গও তো অপূর্ব বস্তু, সেই জাতীয় কল্পনা সাহিত্যপদবাচ্য হইবে না। ইউরোপীয় নন্দনতত্ত্ব এইজন্য দুই রকমের কল্পনার মধ্যে ভেদরেখা টানিতে চেষ্টা করিয়াছে। এক দিকে রহিয়াছে খোশখেয়ালী বন্ধনহীন স্বতঃস্ফূর্ত কল্পনা (Fancy) যাহা যদৃচ্ছ সঞ্চরণ করিয়া বেড়ায়। ইহাকে অহিফেনসেবীর অর্ধজাগ্রত স্বপ্নের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে; ইহার সুন্দর নমুনা বঙ্কিমচন্দ্র দিয়াছেন জমিদার কৃষ্ণকান্তের মাধ্যমে। উইল সহি করিয়া রাত্রি আটটার সময় আফিমের নেশায় কৃষ্ণকান্ত 'খেয়াল দেখিতেছিলেন' ..... 'ব্রহ্মার বেটা বিষ্ণু আসিয়া বৃষভারূঢ় মহাদেবের কাছে এক কৌটা আফিম কর্জ লইয়া এই দলিল (অর্থাৎ তাঁহার উইল) লিখিয়া দিয়া, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বন্ধক রাখিয়াছেন—মহাদেব গাঁজার ঝোঁকে ফোরক্লোজ করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন।' ইহা বিশৃঙ্খল খোশখেয়াল বা ফ্যান্সি। কিন্তু অহিফেনসেবী কোল্‌রিজ যে Kubla Khan কাব্য লিখিয়াছেন তাহা স্বপ্নলব্ধ এবং আপাতবিশৃঙ্খল হইলেও তাহার মধ্যে এমন একটা সুরসঙ্গতি আছে এবং এলোমেলো চিত্রের মধ্যে এমন

একটা সংসক্তি আছে যাহাকে আমরা অকুতোভয়ে সত্য বলিয়া গ্রহণ করি। কবির যে শক্তির দ্বারা এই সংহতি, সংসক্তি ও সুসঙ্গতি রচিত হইয়াছে তাহারই নাম Imagination বা সৃজনীপ্রতিভা।

'ভূশণ্ডির মাঠে' গল্পে পরশুরাম যে কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহাকে একই সঙ্গে Fancy ও Imagination অথবা ইহাদের সমাহার বলা যাইতে পারে। ইহার কারবার ভূত, প্রেত প্রভৃতি অলৌকিক বস্তু লইয়া; অথচ ইহাদিগকে একেবারে অবাস্তব বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না, কারণ যুগে যুগে মানুষ ইহাতে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে। ইহারা অপ্রত্যক্ষ বলিয়া ইহাদিগকে নস্যাৎ করা যায় না, জীবনের এবং জড়প্রকৃতির কতটুকু আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি? আমার পিতামহকে আমি দেখি নাই, নিউট্রন বা ইলেকট্রনকে কেহ কখনও প্রত্যক্ষ করে নাই। সেইজন্য ইহারা মিথ্যা হইয়া যাইতেছে না। এমন কি অপ্রত্যক্ষ মহাকাশচারীদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করেন ভূপৃষ্ঠে আসীন বৈজ্ঞানিকেরা তাঁহাদের অমোঘ গাণিতিক সূত্রের দ্বারা।

সুতরাং ভূত, প্রেত অপ্রত্যক্ষ বলিয়াই অগ্রাহ্য এমন কথা বলা যায় না। আর সমস্ত ধর্মশাস্ত্রই নির্ভর করে সম্ভাব্য বিশ্বাসের উপর আবার আন্দাজ বা hypothesis না হইলে প্রমাণ সম্ভব হয় না। আমাদের দেশে হিন্দু বা বৌদ্ধদের বদ্ধমূল সংস্কার আছে যে মৃত্যুর পর আবার জন্ম হয়। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তৃতীয় পাণ্ডবকে বলিয়াছেন, হে অর্জুন, আমার ও তোমার বহুবার জন্ম হইয়াছে। বৌদ্ধধর্মের অন্যতম প্রামাণ্য গ্রন্থ হইল জাতক কাহিনীমালা যাহার মধ্যে ভগবান বুদ্ধের ৫৫০ পূর্বজন্মের কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এইসব বিশ্বাস প্রাচীন ভারত বা এশিয়াবাসীদের মধ্যেই যে সীমাবদ্ধ এমন কথা বলা যায় না। আধুনিক বিজ্ঞানীরা যেমন একদিকে মহাকাশযান চালনা করিতেছেন এবং চন্দ্রগ্রহে মানুষ পাঠাইতেছেন, তেমনি জন্মান্তর সম্বন্ধে প্রামাণ্য তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া নূতন শাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন; ইহার নাম দিয়াছেন para-psychology বা অনুমনস্তত্ত্ব। এই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত কম চমকপ্রদ নয়; ইহার সঙ্গে পরিচয় হইলে হ্যাম্‌লেটের সেই বিখ্যাত উক্তি মনে পড়ে:

There are more things in heaven and earth, Horatio,
Than are dreamt of in your philosophy.

পূর্বেই বলা হইয়াছে, (অনেকটা হোরেশিওর মতই) পরশুরাম বাস্তববাদী,

যুক্তিনিষ্ঠ, নাস্তিকঘেঁষা সাহিত্যিক। তদুপরি তিনি গাণিতিক ও বৈজ্ঞানিক। তিনি যে অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা বা অ-লৌকিক রসসৃষ্টি করিয়াছেন তাহার ভিত্তি লৌকিক বিশ্বাস, বাস্তব অভিজ্ঞতা; তাহার উপায়ও বৈজ্ঞানিক ও গাণিতিক যুক্তি ও গণনা এবং এই পার্থিব পথেই তাঁহার কল্পনা ঊর্ধ্বগগনে পক্ষ-বিস্তার করিয়াছে। জন্মান্তরে বিশ্বাস আমাদের দেশে সাধারণ ধর্মবিশ্বাসের অঙ্গীভূত এবং একটু আগেই বলিয়াছি আধুনিক দর্শন-বিজ্ঞানও ইহাকে একেবারে উড়াইয়া দিতে পারে নাই। কিন্তু অন্য অনেক বিষয়ের মত এই বিষয়েও আমাদের জ্ঞান খুব সীমিত। মানুষ মৃত্যুর পর পরই জীর্ণবাস পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করার মত নূতন জন্ম গ্রহণ নাও করিতে পারে, কিছুকাল বিদেহী প্রাণ বা আত্মাকে অপেক্ষাও করিতে হইতে পারে। এই-খানেই ভূত প্রেত যক্ষ প্রভৃতির অস্তিত্বের সম্ভাবনা আসিয়া পড়ে।

এই দুইটি অপ্রমাণিত লৌকিক তথ্যকে ভিত্তি করিয়াই পরশুরামের কল্পনা পক্ষবিস্তার করিয়া 'ভূশণ্ডির মাঠে' গল্পটি সৃষ্টি করিয়াছে। প্রথমতঃ, জন্মান্তর আছে, আমরা পূর্বে একাধিকবার জন্মিয়াছি এবং পরেও একাধিকবার জন্মিব। দ্বিতীয়তঃ, দুই জন্মের মধ্যবর্তী সময়ে আমরা প্রেতলোকে বাস করি; কেহ ব্রহ্মদৈত্য, কেহ যক্ষ, কেহ পিশাচ, কেহ শুধু প্রেত, কেহ ডাকিনী, কেহ শাকচুন্নী, কেহ পেত্নী। ইহার উপর পরশুরাম কোন অলৌকিক রশ্মি নিক্ষেপ করেন নাই। শুধু বীজগণিতের পারমুটেশন ও কম্বিনেশন নিয়ম প্রয়োগ করিলে যে বিচিত্র সম্ভাবনার উদয় হয় তাহার বর্ণনা দিয়াছেন। এই জাতীয় সংঘটন ও মিল বাস্তব জীবনেও দেখা যায় এবং বিজ্ঞানীরাও স্বীকার করেন। অসীম আকাশে অগণিত নক্ষত্র ও তাহাদের গ্রহপুঞ্জ সঞ্চরণ করিতেছে। যে যাহার নিয়মে আপন পথে চলিতেছে, দূরে সরিয়া যাইতেছে, কাছে আসিতেছে, কখনও কখনও একই সংঘটনের পুনরাবৃত্তি দেখা যাইতেছে এবং দেখিয়া সন্দেহ হয় যে এই পুনরাবৃত্তি আকস্মিক। বাস্তবজীবনেও দেখি দুই বন্ধু পাশাপাশি থাকিয়া যে যাহার পথে চলিয়া গিয়াছে আবার পূর্ব-প্রস্তুতি না থাকিলেও এক জায়গায় আসিয়া মিলিত হইয়াছে।

ভূশণ্ডির মাঠে তিনটি প্রেতের মিলন হইয়াছে—এক নম্বর, ব্রহ্মদৈত্য শিবু ভট্টাচার্য; দুই নম্বর, কেলেভূত যে পূর্বে চাঁপদানী মিলে কুলি ছিল; তিন নম্বর, যক্ষ নদের চাঁদ বসু মল্লিক। প্রথম দুইজন অতি সাধারণ নিরীহ লোক; কেলে-

ভূতের (কারিয়া পিরেতের) জীবিতাশ্রমের নাম পর্যন্ত গ্রন্থকার করেন নাই ; তৃতীয় ও প্রাচীনতম হইলেন 'যক্ষ' নাদু মল্লিক যিনি দোর্দণ্ডপ্রতাপ দারোগা হইলেও ভারতের মহাকবি কালিদাসের নামও শোনেন নাই। এই সব ভূতেরা সূক্ষ্মশরীরে বাস করিতেছে, একজন তালগাছে, একজন বেলগাছের মাথায়, আর একজন ইঁটের পাঁজার নীচে। কিন্তু সূক্ষ্মশরীরে বসবাস করিলেও ইহারা স্থূলদেহীর পঞ্চেন্দ্রিয় চালনা করিতে পারে—তামাক খায়, গঙ্গাস্নান করে, প্রেতসুলভ নাকিসুরে গানবাজনা করে ; পেত্নীরা গোবরগোলা জল দিয়া পথঘাট বিশুদ্ধ রাখে বা ঝাঁটা হাতে লইয়া ঘরবাড়ি পরিচ্ছন্ন করে অথবা পলো দিয়া মাছ ধরে। শুধু তাই নয়, যে জৈবিক নিয়মে বা হৃদয়ের আবেগে পৃথিবীতে নরনারী মিলিত হয় তাহার আকর্ষণ এখানেও আছে। এই যে তিনটি পুরুষ প্রেতাত্মা ভূশণ্ডির মাঠে মিলিত হইয়াছে, ইহাদের পার্থিব আশ্রমে অনেক বৈষম্য থাকিলেও একটি বিষয়ে মিল ছিল। ইহাদের পারিবারিক জীবনে শান্তি ছিল না। ইহাদের পত্নীরা বন্ধ্যা, অতিশয় মুখরা এবং দুইজনের স্ত্রী আবার স্বামীকে ঝাঁটাপেটা করিয়াছে। সেই মনস্তাপেই ইহারা সংসারবিমুখ হইয়াছে। নাদু মল্লিক সখের যাত্রাদল গড়িয়া তুলিয়া, গানবাজনা করিয়া শান্তি খুঁজিতেন। 'কারিয়া পিরেত' স্ত্রীর অত্যাচারে অন্য নারীতে একটু আসক্ত হইয়াছিল এবং তাহারই ফলশ্রুতি হইল তাহার গৃহত্যাগ। কলিকাতায় আসার পর সে স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদ পাইয়াছিল, কিন্তু আর দারপরিগ্রহ করে নাই। নিরীহ শিবু স্ত্রীর বাক্যবাণ নীরবে সহ্য করিত ; তবু বোধ হয় সেই জ্বালায়ই সেও অন্য কাহারও প্রতি অনুরাগ-দৃষ্টি দিয়া থাকিবে এবং এবার স্ত্রী নিত্যকালী গালি ছাড়িয়া ঝাঁটা ধরিলে, সে গৃহত্যাগ করিয়া নিত্যর মৃত্যুকামনা করিয়া কালীঘাটে পূজা দিয়া নিজেই কলেরায় প্রাণত্যাগ করিল। পূর্বস্মৃতিতে বৈচিত্র্য ও ঐক্যের সমন্বয় এবং প্রেতলোকে পার্থিব ও ভৌতিক লক্ষণের সামঞ্জস্য ইহাদের কাহিনীকে সজীবতা দান করিয়াছে।

এই জন্মে যে মানবদেহ ধারণ করিয়াছে পরজন্মেও যদি সে মানুষই হয়—তাহাই সম্ভব—তাহা হইলে মধ্যবর্তী ভৌতিক অবস্থায়ও ইহাদের দেহে ও মনে অন্যান্য প্রবৃত্তির মত প্রেমপ্রবৃত্তি বা কামবাসনাও জাগ্রত হইবে ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। এইজন্যই বোধ হয় পরশুরাম তিন পুরুষ-প্রেতের পূর্বকাহিনীর বিশদ বর্ণনা দিয়াছেন। এই বর্ণনাগুলির স্বতন্ত্র মাধুর্য ছাড়াও একটা সার্থকতা

এই যে ইহা দুই জগতের মধ্যে সহজ, সুগম সেতু রচনা করিয়া দিয়াছে। সুদূর ছায়াপথে যে অগণিত গ্রহ নক্ষত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তাহারা কখনও কখনও কাছাকাছি আসিয়া যাইতে পারে; সৌরমণ্ডলেও দেখা যায় কোন কোন ধূমকেতু কিছুকালের ব্যবধানে একই জায়গায় ফিরিয়া আসে। নিরবধি কালে যে জন্মমৃত্যুর চক্র আবর্তিত ও পুনরাবর্তিত হইতেছে তাহার মধ্যে কোন এক সময়ে জন্মমৃত্যুর মোহানায় অর্থাৎ প্রেতলোকে একই নারীর সঙ্গে তিন জন্মের তিন স্বামীর সাক্ষাৎ হওয়া বিচিত্র নয় এবং ঘটনাচক্রে সেইখানে কোন এক স্বামীর পূর্ববর্তী দুই জন্মের স্ত্রীর অভ্যাগম আরও একটু অপ্রত্যাশিত হইলেও একেবারে অসম্ভব নয়। গণিতের অব্যর্থ নিয়মেই এইরূপ সমবায় (combination) ও বিন্যাস (permutation) হইতে পারে। আর কালিদাস বর্ণিত রম্য বস্তু ও মধুর শব্দ ছাড়াই শুধু নরনারীর সম্মিলনেই জন্মান্তরীণ সংস্কার বলেই শিবুর 'ব্রহ্মদৈত্য' সত্তা ও নিত্যকালীর ডাইনী সত্তা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইল। তারপর শিবুর পূর্বজন্মের দুই স্ত্রী ও নিত্যকালীর পূর্বজন্মের দুই স্বামী কাছে থাকায় যে সোরগোল বাধিবে এবং অপূর্ব ও অপ্রতিবিধেয় সমস্যার সৃষ্টি হইবে তাহাও অনুমান করা যাইতে পারে। এই সকল পরস্পরবিরোধী লক্ষণের সমন্বয় এই প্রহসনকে অপরূপ বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। ইহা আজগুবি, অচিন্তনীয়, ভূতুড়ে কাহিনী। কিন্তু ইহা বাস্তবভিত্তিক এবং ইহার প্রতি পদক্ষেপ গণিতের ও বিজ্ঞানের অমোঘ নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই গল্পটি পড়িলে অ্যারিস্টটলের সংজ্ঞা বিশেষ করিয়া মনে পড়ে—কাব্য অর্থাৎ সাহিত্য সম্ভাব্যেরই অনুকরণ করে।

রোমান্স ও রসিকতা

(১)

পরশুরামের মত বাস্তবে বদ্ধদৃষ্টি, যুক্তিনিষ্ঠ, ক্লাসিকধর্মী ব্যঙ্গপ্রিয় সাহিত্যিক যে রোমান্স লইয়া ঠাট্টাবিদ্রূপ করিবেন ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। তাঁহার অধিকাংশ রচনায় রোমান্স প্রবেশ করিয়াছে এবং হাস্যরসের খোরাক যোগাইয়াছে। ব্যঙ্গরসিকের দৃষ্টিভঙ্গি ও রচনাশৈলী বিচার করিবার পূর্বে, রোমান্স বা রোমান্টিক মনোবৃত্তির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে দুই-এক কথা বলা দরকার। রোমান্স শব্দটি বহুবিতর্কিত। কেহ কেহ বলেন রোমান্স বলিয়া কোন ভাব বা পদার্থই নাই; সুতরাং ইহার কোন সংজ্ঞা সম্ভবে না। কিন্তু এই সব সমালোচকের সমালোচনা সত্ত্বেও রোমান্স উবিয়া যায় নাই। আমরা সময়ে অসময়ে বস্তুর কোন একটি লক্ষণ বা মনের কোন একটি ভাবকে প্রকাশ করিবার জন্য অন্য শব্দের অভাবে রোমান্স শব্দটি ব্যবহার করিয়া থাকি। ইহাই রোমান্সের অস্তিত্বের অন্যতম প্রমাণ।

আমাদের শিক্ষক অধ্যাপক জেমস্ উইলিয়াম হোম বলিতেন রোমান্সের সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে এমন কাব্য বা কাব্যাংশের নাম করা যায় যাহা নিঃসংশয়িতরূপে রোমান্টিক। নিজের যুক্তির সমর্থনে অধ্যাপক হোম কবি কীট্সের বিখ্যাত Ode to A Nightingale. কবিতার নিম্নলিখিত পংক্তি কয়টির উল্লেখ করিতেন :

The same that oft-times hath
Charm'd magic casements, opening on the foam
Of perilous seas in fairy lands forlorn.

বাড়ির কাছে যে নাইটেঙ্গেল পাখী গান করিতেছিল কল্পনাবলে কবি তাহাকে সীমিত বর্তমান ও স্থূল পৃথিবী হইতে দূরে, বহুদূরে নিরালা পরীর দেশে লইয়া গিয়াছেন। সেইখানে বিপদসঙ্কুল সাগরের তরঙ্গমালা শুভ্র ফেনের কিরীট মাথায় করিয়া কোন দ্বীপকে ঘিরিয়া আছে। সেই দ্বীপের বদ্ধদুয়ার দুর্গের ইন্দ্রজালপূত গবাক্ষ এই পাখীর কূজনে খুলিয়া যায়। এইরূপ সমৃদ্ধ, সংযত,

প্রতি শব্দে তাৎপর্যাপূর্ণ বর্ণনা যে কোন সাহিত্যে বিরল। অথচ ঐশ্বর্য্যবান বর্ণনা অপেক্ষা অকথিত, আক্ষিপ্ত বা আভাসিত ব্যঞ্জনা আরও বেশী রসপূর্ণ। ইন্দ্রজালে আচ্ছন্ন এই পরিত্যক্ত দেশে উর্মিমুখর সমুদ্রের তীরে বা মধ্যস্থ দ্বীপের দুর্গে যে সাগরিকা নায়িকা অপেক্ষা করিতেছেন পাপিয়ার তানের ইন্দ্রজালে গবাক্ষ উন্মুক্ত হইলে তিনি সেই বীর নায়কের সাক্ষাৎ পাইবেন যিনি সমস্ত বিপদ তুচ্ছ করিয়া তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্র পার হইয়া আসিয়া তাহাকে এইভাবে আবাহন করিবে :

'মকরচূড় মুকুটখানি পরি ললাট 'পরে
ধনুকবাণ ধরি দখিন করে,
দাঁড়ানু রাজবেশী,—
কহিনু, "আমি এসেছি পরদেশী।" '

পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করিলে কীট্সের 'Ode to A Nightingale' ও রবীন্দ্রনাথের 'সাগরিকা'র মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখা যাইবে। কিন্তু উভয় কবিতাই রোমাণ্টিক, কারণ উভয় কবিতায়ই প্রকৃতির সৌন্দর্য ও অতিপ্রাকৃত ইন্দ্রজাল নরনারীর প্রেমকে ঐশ্বর্য দান করিয়াছে এবং উভয়ত্র—বিশেষ করিয়া কীট্সের কবিতায়—যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অপ্রকাশিত, অপ্রকাশ্য রহস্যকে আক্ষিপ্ত করিতেছে।

পরশুরাম কিন্তু এই সকল কিছুই মানেন না। তাঁহার অন্যতম প্রতিনিধি কেদার চাটুজ্যে মনে করেন আজকাল দুস্তর তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রের পরিবর্তে এক পেয়ালা গরম চা-ই প্রেমের যোগ্যতর উদ্দীপক। তিনি বলিয়াছেন : 'আজকাল চায়ের কল্যাণে বাংলা দেশে ভাবের বন্যা এসেছে.—ঘরে ঘরে চা, ঘরে ঘরে প্রেম। সেকালে কবিদের বিস্তর বায়নাক্কা ছিল,—উপবন রে, চাঁদ রে, মলয় রে, কোকিল রে, তবে পঞ্চশর ছুট্‌বে। এখন কোনও ঝঞ্ঝাট নেই,—চাই শুধু দুটো হাতল-ভাঙা বাটি, একটি ছেঁড়া অয়েল ক্লথ, একটা কেরোসিন কাঠের টেবিল, দু'ধারে দুই তরুণ-তরুণী, আর মধ্যিখানে ধূমায়মান কেতলি'। কেদার চাটুজ্যে মহাশয় অতি বিচক্ষণ লোক। তাঁহার চেয়েও একধাপ অগ্রসর হইয়াছেন 'অক্রূর সংবাদ' গল্পের শ্রোতা ও সম্পূরক সুশীলচন্দ্র চন্দ্র, ফিলসফির অধ্যাপক। সুশীলবাবুর দেখা পাওয়া যায় 'নীলকণ্ঠ' গল্পেও ; তবে সেখানে তিনি নিরপেক্ষ দ্রষ্টামাত্র। অক্রূরবাবু তিন রকমের বিবাহের কথা বলিয়াছেন : প্রথম, যেখানে

স্বামী ডিক্টেটর, যেমন গান্ধী-কস্তুরবা; দ্বিতীয়, যেখানে স্ত্রী ডিক্টেটর, যেমন জাহাঙ্গীর নূরজাহান; তৃতীয়, 'ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যমূলক আদর্শ-দাম্পত্য, কিন্তু এর পদ্ধতি বা টেকনিক লোকে আয়ত্ত করতে পারে নি।' অক্রূরবাবু একটু ভুল করিয়াছেন, তৃতীয় রকমের আদর্শ দাম্পত্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যুক্তিবাদী গডউইন এবং স্ত্রীস্বাধীনতা আন্দোলনের নেত্রী মেরি উলস্টনেক্র্যাফট। ইহারা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া বিবাহিত জীবন যাপন করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু এই পরীক্ষা সার্থক হইত কি না তাহা দেখিবার মত সময় পাওয়া গেল না। এক বৎসর অতিক্রান্ত হইতে না হইতেই একটি কন্যাসন্তান (পরে কবি শেলীর পত্নী) জন্ম দিয়াই মেরি গডউইন মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। যাহা হউক সুশীলচন্দ্র চন্দ্র অক্রূরবাবুকে খাঁটি কথা বলিয়া দিলেন। স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক হরমোন দ্বারা নির্ধারিত ও চালিত হয়। যে প্রেরণা পুরুষকে স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হইতে লালায়িত করে তাহা রাসায়নিক বস্তু—এক প্রকারের হরমোন বা প্রাণি-দেহজ রস এবং তাহা অক্রূরবাবুর দেহে অবর্তমান।

(২)

সুশীলবাবু বিশদ করিয়া না বলিলেও তাঁহার মন্তব্য হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে এই হরমোনের খেলায় অলৌকিক রস বা রোমান্সের স্থান নাই। পরশুরামের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'গড্ডলিকা' (১৯২২) তাঁহাকে সাহিত্য ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দেয়। ইহার মধ্যে নরনারীর প্রেম স্থান পায় নাই। দ্বিতীয় গ্রন্থ 'কজ্জলী'তে 'কচি-সংসদ' গল্পে তিনি প্রথম রোমান্সকে ব্যঙ্গের বিষয় করেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে, কতকগুলি বিচ্ছিন্ন উক্তি ও কয়েকটি পার্শ্বচরিত্র বাদ দিলে 'বিরিঞ্চিবাবা' কাহিনীটি রসোত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। ইহার মধ্যে রোমান্সের যে স্পর্শ আছে তাহা স্পর্শ মাত্র।

'কচি-সংসদ' সম্পর্কেও এই কথা খাটে। এক সময় মনে করা হইত কোমল কবিতার প্রভাবে ভাবপ্রবণ বাঙালী ছেলেরা চালচলনে, বেশভূষায়, আচার-ব্যবহারে এমন কি চেহারায় পর্যন্ত মেয়েলি ভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রাচীনরা তো অনেকে রবীন্দ্রনাথকেই এই অধঃপতনের জন্য দায়ী করিতেন। এই বিরূপতার পটভূমিকায় 'কচি-সংসদ' গল্পে 'কচি-সংসদ' শিরোনামা সভ্যদের

নামের বাহার, বিশেষ করিয়া 'লালিমা পাল (পুং)', নর-শার্দূল, বহুশ্রুত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের এক ভলুম এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা হাতে লইয়া পেলারাম ওরফে পেলব রায়কে তাড়া করা খুব মুখরোচক বলিয়া মনে হইত। ইহা ছাড়া পার্শ্বচরিত্র—নকুড় চৌধুরী, 'যিনি সম্পর্কনির্বিশেষে আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলেরই সরকারী মামা' এবং মুনসাইন ভিলার চাকর বোদা খুব উপাদেয় এবং যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কর্তৃক অঙ্কিত ইহাদের এবং পেলব রায়ের চিত্র পরশুরামের বর্ণনাকে আরও উজ্জ্বলতা দান করিয়াছে।

কিন্তু মূল কাহিনী বা প্রধান চরিত্রে কোন বৈশিষ্ট্য নাই। কচি-সংসদের সভ্যগণ অদ্ভুত সঙ বিশেষ; তাহারা যে হাসির উদ্রেক করে তাহার মধ্যে অম্ল মধুর তিক্ত কষায় প্রভৃতির কোন স্পর্শ নাই। তাহাদের মেয়েলিপনা এখন সেকেলে হইয়া গিয়াছে। বরং এখন বেলবটম্ ও টপ বা স্ল্যাকস্ পরা সবিতা পাত্র বা শতদল সিংহকেই নামের শেষে (স্ত্রীং) যোগ করা উচিত বলিয়া মনে হয়। আর নায়ক কেষ্ট তো প্রেমে বিশ্বাসই করে না; সুতরাং তাহার সঙ্গে কচি-সংসদ বা রোমান্সের কোন সম্পর্কই নাই। 'রাতারাতি' গল্পের কার্তিকের বিবাহ শৈশবে বা বাল্যেই স্থির হইয়াছিল, যদিও পাত্র নিজে ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল না। সুতরাং 'রাতারাতি' গল্পের প্রেমের কবিতার যদি বা কোন সার্থকতা থাকে—তাহাও বিশেষ আছে বলিয়া মনে হয় না—কচি-সংসদের কেষ্ট ও পদ্মমধুর বিবাহ একেবারেই পুং হরমোন ও স্ত্রী হরমোনের মিলনানুষ্ঠান। ইহার জন্য এত বাগ্‌বিস্তারের প্রয়োজন ছিল না। সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ এই যে ইহা আধিভৌতিক হইয়াও আধ্যাত্মিক, লৌকিক হইয়াও অ-অলৌকিক, প্রাঞ্জল হইলেও রহস্যময়। এই বিচিত্র সহিতত্ত্ব এই দুই গল্পে নাই। কেষ্ট সঙ সাজিয়াছে এবং কার্তিক শূন্যগর্ভ আস্ফালন করিয়াছে এই মাত্র।

রোমান্স লইয়া পরশুরাম যে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করিয়াছেন তন্মধ্যে কঠোরতম পরিহাস প্রকাশ পাইয়াছে 'নির্মোক নৃত্য' ও 'তিলোত্তমা' প্রভৃতি গল্পে। ভাবের গভীরতায় ও অন্তর্দৃষ্টির তীক্ষ্ণতায় এই সকল গল্প অনন্য। সাফ্‌ফো, এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং প্রভৃতি দুই-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রেমের কাব্য লিখিয়াছেন স্তুতিবাদী পুরুষের দল; তাঁহারা ইহাই বলিতে চাহিয়াছেন নারীদেহ অনির্বচনীয় লাবণ্যের আধার এবং সেই কারণেই ইহা মদনের লীলাভূমি এবং ইহার মনও অপার রহস্যে ঘেরা। সেইজন্যই ইহা পুরুষের চিত্তকে বিভ্রান্ত করে এবং কবি-

প্রতিভাকে উদ্দীপ্ত করে। নারীর যে মোহিনী শক্তি আছে তাহাই তাহাকে সৌন্দর্য দান করে। বার্নার্ড শ' The Man of Destiny নাটিকায় ইহা লইয়া খুব মধুর কৌতুক সৃষ্টি করিয়াছেন। সেনাপতি নেপোলিয়ন স্বীয় কক্ষে আবদ্ধ হইয়া আছেন—বাহিরে এক ছোকরা সৈনিক প্রহরী। এই সৈনিককে ছলে বলে কৌশলে হাত করিয়া নাটিকার নায়িকা নেপোলিয়নের কক্ষে প্রবেশ করিতে চান। তিনি একবার স্বরূপে সৈনিককে ধাপ্পা দেওয়ার চেষ্টা করিলেন, আর একবার পুরুষ বেশে নিজেকে পূর্ববর্তিনী রমণীর যমজ ভাই বলিয়া পরিচয় দিয়া স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। মুগ্ধ, অভিভূত সৈনিক মন্তব্য করিল, তোমরা যমজ ভাই-বোন উভয়েই সুশ্রী; তবে তোমার বোন তোমা অপেক্ষাও দেখিতে ভাল!

নারীর মোহিনী শক্তি কেন্দ্রীভূত হইয়াছে স্বর্গের অপ্সরা অনন্তযৌবনা উর্বশীর মধ্যে, যে উর্বশী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন:

তব স্তনহার হতে নভস্তলে খসি পড়ে তারা—
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা
নাচে রক্তধারা।

ব্যঙ্গরসিক পরশুরাম অন্যত্র দেবরাজ ইন্দ্রের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। কিন্তু 'নির্মোক নৃত্য' গল্পে রবীন্দ্রনাথের এই কবিতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই তিনি বলিয়াছেন, 'কবিরা বিস্তর মিছে কথা লেখে।' হরমোন হইতেছে প্রাণীদেহের সেই রস যাহা রক্তের সঙ্গে মিশিয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে ক্রিয়াশীল করে। প্রশ্ন হইতেছে, নৃত্যচঞ্চলা উর্বশীকে দেখিয়া পুরুষের রক্তধারা যে তালে তালে নাচিয়া উঠে তাহার উৎস কোথায়? তাহার দেহে মনে এমন কোন্ শক্তি আছে যাহার প্রভাবে পুরুষের চিত্ত আত্মহারা হয় এবং তাহারই ফলে রক্তধারা ক্রিয়াশীল হয়? যদি তাই হয়, কোথায় সেই নারীসত্তা বা রমণীর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য যাহা তাহার দেহকেও রমণীয় করিয়া তোলে এবং যাহার আকর্ষণে 'মধুমত্ত ভৃঙ্গসম মুগ্ধ কবি ফিরে লুব্ধ চিতে'। এই অপরাজেয় শক্তির পরিচয় দিতে উর্বশী ইন্দ্রসভায় প্রবেশ করিলেন; সেখানে সমবেত হইলেন অগ্নি, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবগণ, নারদাদি দেবর্ষিগণ, অগস্ত্যাদি মহর্ষিগণ আর তিনজন দিব্য মানব—পর্বত, কর্দম ও কুতুক ঋষি। এই দিব্য মানবগণ স্বর্গে-মর্ত্যে অবাধে ঘুরিয়া বেড়ান; ইহারা ময়ূর নৃত্য, খঞ্জন নৃত্য প্রভৃতি দেখিয়া থাকিলেও নারী-

নৃত্য কখনও দেখেন নাই অর্থাৎ নারীদেহের যে বিশিষ্ট মোহিনী শক্তি আছে, যাহাকে নারীসত্তা বলা যাইতে পারে, তাহার সঙ্গে পরিচিত নহেন। যাবতীয় প্রাণীদেহই পঞ্চভূতের সমষ্টি ; নারীর দেহে এমন কি আছে যাহা তাহার স্বকীয়, যাহা পঞ্চভূতের অতিরিক্ত ?

উর্বশীর লাস্যলীলায় এবং তাঁহার দেহের উর্ধ্বাঙ্গের ক্রমিক আবরণ উন্মোচনের ফলে অভ্যাগত তিন দিব্য মানবের মধ্যে পর্বত ও কর্দম ঋষিদ্বয়ের চিত্তপীড়া উপস্থিত হইল। রমণীর লজ্জার মত পুরুষের এই জুগুপ্সা মন্মথপীড়াই সূচিত করে। 'তারপর উর্বশী ক্রমশঃ তার সমস্ত আবরণ ও আভরণ খুলে ভূমিতে নিক্ষেপ করলেন এবং অবশেষে "কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি" প্রকাশ করে পাষাণবিগ্রহবৎ নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।' উপস্থিত দেবগণ, দেবর্ষিগণ ও মহর্ষিগণ সবাই সাধুবাদ করিলেন, কিন্তু অপরাজিত তৃতীয় দিব্য মানব কুতুক ঋষি আরও নির্মোক মোচন করিয়া তাঁহার অন্তঃস্থিত নারীসত্ত প্রকাশ করিতে বলিলেন। অবশিষ্ট নির্মোক তো তাঁহার গাত্রচর্ম যাহার অন্তরালে রহিয়াছে মেদ মাংস ও অস্থি! সুতরাং দেখা গেল এমন পুরুষ থাকিতে পারে উর্বশীর ছলাকলা লাস্যলীলা যাহার চিত্তকে আত্মহারা করিতে পারে না। উর্বশীর পরাজয়ের চিত্রের নাটকীয় ক্রমপরিণতিকে গ্রন্থকার অতি কৌশলের সহিত উদ্ঘাটিত করিয়াছেন—প্রথমে তাঁহার দৃপ্ত অহংকার ও আত্মবিশ্বাস, পর্বত ও কর্দমের অভিভবে ইন্দ্রের দিকে কটাক্ষ-নিক্ষেপ, তারপর কুতুকের দাবী এবং নারদের ব্যাখ্যায় ঘৃণাভরে সভাকক্ষ ত্যাগ, মেনকা মিশ্রকেশী প্রভৃতি প্রতিদ্বন্দ্বী অপ্সরাদের ঈর্ষাকষায়িত উল্লাস এবং ইন্দ্রের ব্যাজ সান্ত্বনা। দেবর্ষি নারদ একাধারে ফিলসফার ও বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। তিনি নারীসত্তার প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, (উর্বশীর) 'নারীত্ব আছে ওর বসনে, আভরণে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, ভাবভঙ্গীতে আর অনুরাগী পুরুষের চিত্তে।' বলা বাহুল্য এই সব উপাদানের মধ্যে শেষেরটিই প্রধান। মহামুনি কুতুক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, 'এই উর্বশী একটা অন্তঃসারশূন্য জন্তু, ছাগদেহের সঙ্গে উহার প্রভেদ কোথায় ?' উর্বশীও ক্ষোভে দুঃখে অমরাবতী ত্যাগ করিলেন। যাওয়ার পূর্বে বলিয়া গেলেন, 'ওই কুতুক ঋষি একটা অপুরুষ, অপদার্থ, দগ্ধেন্দ্রিয় উন্মাদ……।' এই গল্পের আবেদন-বৈচিত্র্যের একটা লক্ষণ এই যে প্রত্যেকটি উক্তি বক্তার চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। উর্বশী যাহাকে 'দগ্ধেন্দ্রিয়' বলিয়াছেন, অপরে তাঁহাকে 'জিতেন্দ্রিয়' বলিবে।

'তিলোত্তমা'গল্পে বক্তা সিদ্ধিনাথ মডার্ন উর্বশী অর্থাৎ বোম্বাই ফিল্মজগতের শ্রেষ্ঠ তারকা তিলোত্তমার মোহ হইতে স্বীয় মুক্তির কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। যে তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল এক হিসাবে সে সার্থকনাম্নী তিলোত্তমাই বটে, কারণ তাহার 'বাপ আর ঠাকুদ্দা বাঙ্গালী, ঠাকুমা বর্মী, মা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, দিদিমা ইংরেজ, দাদামশায় পঞ্জাবী।' মনে করা যাইতে পারে তাহার রক্তে, অঙ্গসৌষ্ঠবে ও সংস্কৃতিতে নানা জাতির সম্মিশ্রণ হইয়াছে। তারপর সিনেমার মেক-আপে বাহিরের অলংকরণের তো কথাই নাই। এই সকল উপাদানের আকর্ষণ যে কোন তরুণের পক্ষেই যে দুর্বার হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। তদুপরি 'তিলোত্তমা' নামভূমিকায় সে যে গান করিয়াছিল তাহার মাধুর্যও অতুলনীয়; সুতরাং সংস্কৃতিতেও সে অনন্যা হইবে ইহাই অনুমেয়। সিদ্ধিনাথের শিক্ষক রামদাস বেদান্তচুঞ্চু একে একে এই ছায়াছবির তিলোত্তমার আবরণ ও আভরণ উন্মোচন করিতে লাগিলেন। প্রথম কথা, তাহার রূপের অর্ধেক তাহার নিজস্ব, অর্ধেক কৃত্রিম সাজসজ্জা। কথোপকথনের যে ভাষা সিদ্ধিনাথকে মুগ্ধ করিয়াছে তাহা নাট্যকারের, যে সুমিষ্ট সঙ্গীত সিদ্ধিনাথের কর্ণে সুধাবর্ষণ করিয়াছে তাহা পিছন হইতে অন্য সুকণ্ঠী গায়িকা গান করিয়াছে। আর সুরূপাই হউক কুরূপাই হউক সে নারী অর্থাৎ নরের স্ত্রীলিঙ্গ নারী; সুতরাং তাহার দেহ সমস্ত লৌকিক প্রক্রিয়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং সেই সেই প্রক্রিয়া গন্ধময়, কোন কোনটি জুগুপ্সাউৎপাদক। এই প্রসঙ্গে চুঞ্চুমহাশয় যে দৃষ্টান্ত দিলেন তাহা 'নির্মোক নৃত্য' গল্পের বিশ্লেষণ ও তর্ক হইতে অনেক বেশী তীক্ষ্ণ ও তীব্র। জনৈক শৌখীন প্রেমিক দুই দিনের বিরহযন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া অকস্মাৎ অতি প্রত্যূষে তাহার রক্ষিতার বাড়ি প্রবেশ করিয়া দেখেন তাঁহার প্রতি মিলনসন্ধ্যার সুসজ্জিতা সুন্দরী প্রেয়সী গামছা পরিয়া গাড়ু হাতে স্থানবিশেষে যাইতেছে। এই 'প্রাকৃত' অর্ধনগ্নকান্তি স্ত্রীলোকটিকে আর অনিন্দিতা বা সুরেন্দ্রবন্দিতা বলিয়া আবাহন করা যায় না।

এই প্রসঙ্গে চুঞ্চুমহাশয় পৌরাণিক কাহিনীর তিলোত্তমার ইতিবৃত্তের স্বরচিত আধুনিক সংস্করণ নিবেদন করিলেন। দেবতাদিগকে প্রবলপরাক্রান্ত দৈত্য সুন্দ ও উপসুন্দের উপদ্রব হইতে রক্ষা করিবার জন্য ব্রহ্মা প্রকৃতির সমস্ত সুন্দর পদার্থ হইতে তিল তিল করিয়া সৌন্দর্য অপহরণ করিয়া তাহাদের সংযোজন ও সংশ্লেষণে এক অপরূপ নারী সৃষ্টি করিয়া দৈত্যসভায় পাঠাইয়া

দিলেন। অভিন্নহৃদয় দৈত্যভ্রাতৃদ্বয় তিলোত্তমাকে পাইবার জন্য নিজেদের মধ্যে কলহে প্রবৃত্ত হইয়া একে অপরের হস্তে নিহত হইল। ইতিমধ্যে তিলোত্তমা অন্তরীক্ষে মিলাইয়া গিয়াছে। সিদ্ধিনাথ এই কাহিনীকে একটু বাড়াইয়া বলিয়াছেন যে, তিলোত্তমা স্বর্গে ফিরিয়া আসিয়া দেবলোকেও মহা গোলযোগের সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইয়াছিল, কারণ ইন্দ্র, বিষ্ণু ও মহেশ্বর তাহাকে পাইবার জন্য যুযুৎসু হইয়া উঠিয়াছিলেন। ব্রহ্মা তখন তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশ্লিষ্ট করিয়া প্রকৃতির যে বস্তু হইতে যে লাবণ্য ধার করিয়াছিলেন তাহাকে তাহা ফিরাইয়া দিলেন; তখন দেখা গেল তিলোত্তমার অন্তরাত্মা বলিয়া আর কিছু রহিল না। সে একটা রবট মাত্র। এইভাবে 'তিলোত্তমা' গল্পটি 'নির্মোক নৃত্য' গল্পের সামিল হইল। উভয় গল্পই প্রশ্ন তুলিয়াছে: নারীর নারীত্ব বলিয়া কোন কিছু আছে কি?

সিদ্ধিনাথ নারীর নারীত্ব লইয়া আর একটি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। শ'য়ের নাটকে নেপোলিয়নের দেহরক্ষীর মত আমরা সবাই মনে করি রমণীর দেহ, বিশেষ করিয়া উদ্ভিন্নযৌবনা রমণীর দেহ সৌন্দর্যের আকর এবং প্রসাধনে ও অলংকরণে তাহাদের জন্মগত অধিকার আছে। এমন কি কাব্যের যে সৌন্দর্য কাব্যের প্রাণ তাহাকেও কেহ কেহ বলেন অলংকার, এবং আমাদের দেশে কাব্যালোচনাশাস্ত্রকে বলা হয় অলংকারশাস্ত্র। কিন্তু সিদ্ধিনাথ অলংকারের উৎপত্তির এক অদ্ভুত ব্যাখ্যা দিয়াছেন। সেই ব্যাখ্যায় দেখা যায় ইহা মূলতঃ নারীদেহের দাসত্বের প্রতীক। নারী গহনা পরে নাক ফুড়িয়ে, কান ফুড়িয়ে, গলায়, হাতে, কোমরে, পায়ে। সে কপালে সিঁদুর ও পায়ে আলতা পরে, সে বড় বড় চুল রাখিয়া তাহা এলাইয়া দেয়, বেণী বাঁধে অথবা কবরী রচনা করে। এমনও তো হইতে পারে যে একসময়ে আদিমকালে গৃহিণী যখন দুষ্প্রাপ্য ছিল তখন তাহাকে করায়ত্ত ও বশীভূত করিতে পুরুষ পাথর ছুঁড়িয়া মাথায় ও পায়ে রক্ত বাহির করিত এবং নাকে দড়ি দিয়া, গলায় কাপড় জড়াইয়া, হাতে পায়ে বেড়ি দিয়া, কটিদেশে শিকল বাঁধিয়া বশে রাখিত। পরে যখন নূরজাহানরা জাহাঙ্গীরদের বশ্যতা স্বীকার করিলেন বা জাহাঙ্গীরদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিলেন তখন লোহার শৃঙ্খল বা রজ্জুর বন্ধন সোনা বা মণিমুক্তার অলংকারে পরিণত হইল। পরশুরাম এই রচনাকে পুরোপুরি গল্প না বলিয়া 'গল্পকল্প' শ্রেণীতে ফেলিয়াছেন এবং ইহার নাম দিয়াছেন 'সিদ্ধিনাথের প্রলাপ'।

'প্রলাপ' হইলেও ইহা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেয় এবং ইহা উচ্চাঙ্গের স্যাটায়ার।

(৩)

সিদ্ধিনাথ স্ত্রীজাতি সম্পর্কে যতই অসূয়া প্রকাশ করুন, তিনিও স্বীকার করিয়াছেন যে কালক্রমে নারী গৃহিণীত্বে অভ্যস্ত হইতে লাগিল, পোষ মানিল, স্বামীপ্রীতে ভালবাসা জন্মিল এবং এইভাবেই শৃঙ্খল অলংকারে পরিণত হইল। তিনি নিজেও মুখরা গৃহিণী নবদুর্গাকে ভয় করেন, যদিও নবদুর্গা নাকি তাঁহার কোন কথা বিশ্বাস করেন না এবং তাঁহার শিক্ষক রামদাস বেদান্তচুঞ্চুও স্বীকার করিয়াছেন তিনি দশ বৎসর বিবাহিত জীবনের পরেও নবদুর্গার জ্যেষ্ঠা ভগিনী জয়দুর্গার 'ইয়ত্তা' পান নাই। সুতরাং তিনিও প্রকারান্তরে বলিয়াছেন যে তিলোত্তমা—এক হিসাবে প্রত্যেক নারীই তিলোত্তমা—শুধু অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমষ্টি নয়, তাহার নিজস্ব নারীসত্তা আছে যাহা রহস্যময় এবং সেই রহস্যের উৎস পুরুষ যুগে যুগে খুঁজিয়াছে। প্রসঙ্গান্তরে বংশলোচন বাইশ বৎসর ঘর করার পর স্ত্রী মানিনীর কাণ্ড দেখিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, 'স্ত্রীচরিত্র কি অদ্ভুত জিনিস।' আর এই সন্ধান, এই প্রতীক্ষা শুধু এক পক্ষের ব্যাপার নয়, —সম্বরণ সহস্র বৎসর ধরিয়া তপতীর জন্য তপস্যা করিয়াছেন আবার তপস্বিনী মহাশ্বেতাও বীণাহস্তে মহেশমন্দিরে পুণ্ডরীকের জন্য অনুরূপ প্রতীক্ষা করিয়াছেন। বস্তুবাদী বলিবেন ইহা 'প্রাকৃত' ব্যাপার, হরমোনের ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া; কিন্তু তিনিও স্বীকার করিবেন যে, দেহের যে রস সঞ্চারিত হইয়া মাতৃস্তন্য ক্ষরণ করে, সেই সঙ্গে সঙ্গে রতিভাব সঞ্চারিত করে এবং এই যে দেহাতিরিক্ত ভাব ইহা অ-লৌকিক, রহস্যময় এবং এইখানেই অর্থাৎ জননীর স্নেহে, রমণীর প্রেমে, কুমারীর নব নীরব-প্রীতিতে নারীসত্তা নিহিত রহিয়াছে। ইহাই রোমান্স।

পরশুরাম নরনারীর মিলন লইয়া বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গে পরিপূর্ণ বহু গল্প রচনা করিয়াছেন। এবং সেই সব গল্প বঙ্গসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। কিন্তু তিনিও এই মিলনের রোমান্সকে একেবারে অস্বীকার করেন নাই। তাঁহার প্রতিনিধি কেদার চাটুজ্যে 'স্বয়ংবরা' গল্পে খুব রূঢ়ভাবে নগেনকে বুঝাইয়া বলিয়াছেন,

'ওরে গর্দভ দাঁতে প্রেম হয় না, প্রেম হয় মনে।' এই মন বা হৃদয়কে বাদ দিয়া আধুনিক যন্ত্রসভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে এবং মার্কিন দেশে কুবেরের সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছে। এই নূতন অলকাপুরীতে হৃদয়ের বালাই নাই; অত্যাজ্য সতীত্ব ও ধ্রুব নীতির স্থান গ্রহণ করিয়াছে ক্ষণিক প্রবৃত্তির উত্তাপ। এই কারণে এই জগতেও স্বয়ংবরারা বিভ্রাটে পড়ে এবং বিভ্রাট সৃষ্টি করে। তবে এই সব স্বয়ংবরাদের সমস্যা দময়ন্তীর সমস্যা নয়। এইখানে বিবাহ নূতন বাসের মত; ইহা পরিধান করিয়া আবার পরমুহূর্তেই জীর্ণ চীরের মত পরিত্যাগ করা যায় এবং কোন কোন দময়ন্তী বিস্ময়ের সহিত আবিষ্কার করেন যে তাঁহাদের হিসাবের খাতায় বিবাহ অপেক্ষা বিবাহবিচ্ছেদের সংখ্যা বেশি। কাজেই এই সমাজে রোমান্সের স্থান নাই। এই জগতের প্রতিনিধি-স্থানীয়া হইলেন মিস্ জোন জিন্টার; নামেই প্রকাশ পুরুষকে প্রলুব্ধ করিয়া পরিত্যাগ করা ইহার নেশা ও খেয়াল। ইহার দুই পাণিপ্রার্থী টোপার ও ব্লোটো আমেরিকা হইতে ভারতবর্ষে তাঁহাকে ধাওয়া করিয়াছেন। গাড়িতে তাঁহারাও উপস্থিত আছেন—তবে বারুণীর কৃপায় বেহুঁস। গাড়ি হাওড়া পৌঁছিবার আগে একজনকে নির্বাচন করিতে হইবে—হাতে সাত আট ঘণ্টা সময় আছে ইহার মধ্যে যাঁহাকে হয় একজনকে মনোনীত করিবেন। উভয়েই ধনকুবের; উভয়েই জোনকে পাইবার জন্য সাময়িক উত্তেজনায় উন্মত্ত, উভয়েই মাতাল এবং 'বিচক্ষণ' চাটুজ্যে মশায় ইহাদের গুণপনার পরিমাপ করিয়া বলিয়াছেন, 'বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয় যা পেয়েছি তা শুধু ঘোঁত ঘোঁত।' পাত্রী ভাবিয়াছেন একটা টাকা ছুঁড়িয়া চিত-উবুর দেখিয়া মনস্থির করিবেন। তারপর অতি আধুনিক এই আয়েষার জন্য জগৎসিংহ ও ওসমানের—অর্থাৎ টোপার ও ব্লোটোর—মধ্যে মল্লযুদ্ধ বাধিয়া গেল এবং তাহা থামাইতে বিলি.বাউণ্ডার নামক নামজাদা মুষ্টিযোদ্ধা রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া উভয় প্রতিদ্বন্দ্বীকে ঘায়েল করিয়া ফেলিলেন। 'বিচক্ষণ' কেদার চাটুজ্যে প্রস্তাব করিলেন যে, বরের আসন তো আপাততঃ খালি হইল এবং বিল সাহেবই তো সে আসনে বসিতে পারেন। সবই তো হরমোনের ব্যাপার—পাত্রপাত্রী উভয়েই রাজি হইলেন। কলিকাতায় আসিয়া বিল ও জোন পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। কিন্তু দুইদিন পরই পত্নীর পলায়ন এবং স্বামীর স্ত্রীর অনুসন্ধানে বহির্গমন। যে সমাজের একমাত্র আরাধ্য দেবতা কুবের, একমাত্র লক্ষ্য প্রবৃত্তির অবাধ স্বাধীনতা, একমাত্র সত্য

অনাসক্ত আকাঙ্ক্ষা, সেই সুসভ্য সমাজ যে এই আদিম অসভ্যতায় উপনীত হইবে এবং বিবাহ একটা প্রহসনে পরিণত হইবে ইহাই স্বাভাবিক।

এই প্রহসনের মতই 'শিবামুখী চিমটে' গল্পে সরসী পিসীমার কাহিনী প্রহসন হইলেও তাহা করুণ ও শৃঙ্গার রসের মিশ্রণে বৈচিত্র্য লাভ করিয়াছে। ঝিণ্টুর সরসী পিসীমা অনূঢ়া ; কলেজের পড়া শেষ করিয়া কাজে ঢুকিয়াছে। অফিসে যায়, অবসর সময়ে নভেলের কল্পিত জগতের প্রেমের অমরাবতীতে বাস করে, অন্য কোন দিকে তাহার মন নাই। এইভাবে সে চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসরে উপনীত হইয়াছে, কিন্তু এই আটপৌরে জীবনের অন্তঃস্থল রোমাণ্টিক স্বপ্নে মশগুল হইয়া আছে। বছর বার-তের আগে দুর্লভ তালুকদারের প্রতি তাহার প্রেম জন্মিয়াছিল এবং দুর্লভ কানপুরে চলিয়া গেলেও সেই পূর্বরাগের স্মৃতি তাহার হৃদয়ে অম্লান দীপ্তিতে আত্মরক্ষা করিয়া আছে। এই যুগের মহাশ্বেতা নিভৃতে নীরবে দুর্লভের সঙ্গে মিলনের স্বপ্ন দেখিতেছে এবং মনে মনে নিজের বয়সকে পঁচিশের উপরে উঠিতে দেয় নাই। যখন তরুণ দুর্লভের সঙ্গে মিলনের প্রত্যাশা ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে তখন অফিসের প্রৌঢ় বিপত্নীক বড়বাবু যোগীন বাঁড়ুজ্যের মত স্তিমিত তারকাও তাহার মনের আকাশে উদিত হইয়াছে। এই স্বপ্নের জগতে আবির্ভাব হইল 'মদে চুর' অর্ধজাগ্রত দুর্লভ তালুকদারের, কিন্তু সার্থকনাম্নী সরসীর ইহাতেও রসভঙ্গ হইল না ; সে তবুও ঝিণ্টুর মুখ দিয়া এই বিশ্বাসঘাতক বর্বরকে বিবাহের প্রস্তাব দিল, কিন্তু যেই শুনিল যে তাহাকে আরও দুইটি রমণী অর্থাৎ দুর্লভের বাঙালী স্ত্রী ও হিন্দুস্থানী জরুর সঙ্গে একত্রে ইহার শয্যাসঙ্গিনী হইতে হইবে, তখন এই সম্ভাবনার বীভৎসতায় তাহার সমস্ত রোমান্স উবিয়া গেল। কিন্তু যৌবনের শেষপ্রান্তে দাঁড়াইয়া অথবা প্রৌঢ়ত্বে পদার্পণ করিয়াও সরসীর হৃদয় শুষ্ক হয় নাই। এইবার তাহার প্রৌঢ় বিপত্নীক যোগীন বাঁড়ুজ্যের কথা মনে পড়িল। দেখা গেল, রোমান্স বয়স-নিরপেক্ষ : সরসী নিজেই বলিয়াছে 'আমি তো আইবুড়ো মেয়ে, বয়েস যাই থাক বিয়ে করব না কেন ?' তবে সে ইহাও জানে যোগীন বাঁড়ুজ্যে পাকা লোক ; তাহাকে হাত করিতে হইলে টাকার দরকার এবং সেইজন্য সে টাকা এবং গহনারও ব্যবস্থা করিয়া লইল। পূর্বেই বলিয়াছি, রোমান্স ব্যক্তি ও বয়সনিরপেক্ষ। যোগীনবাবু প্রৌঢ়, বিপত্নীক, আনকালচার্ড, মুখ খুলিলেই হুঁকো হুঁকো গন্ধ ছাড়ে ; তবু তাঁহার মন হইতে রোমান্স একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই কারণ

তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে মিস্ সরসী মুখার্জির প্রতি তাঁহার একটু 'টাঁকও' ছিল, মডার্ন মহিলা বলিয়া অগ্রসর হইতে সাহস পান নাই।

সরসী পিসীমার মনের গহনে যে আকাঙ্ক্ষা নিহিত ছিল তাহার বহিঃপ্রকাশের জন্য ঝিণ্টুর অ্যাডভেঞ্চার, পিশাচসিদ্ধ করালী জ্যেঠা এবং তাঁহার আজ্ঞাবহ ঢুণ্ডুদাসের প্রয়োজন হইয়াছিল। হয়ত সমস্ত ব্যাপারটাই সযত্নপালিত স্বপ্নমাত্র অথবা এমনও হইতে পারে যে যৌবনের প্রণয়ী দুর্লভ যখন একেবারেই অপ্রাপণীয় হইল তখন মিস্ সরসী মুখার্জী বাধ্য হইয়া হেড অ্যাসিস্টাণ্ট বিপত্নীক যোগীন বাঁড়ুজ্যের পত্নী হইয়াছিলেন। বাস্তব জীবনে আশাভঙ্গের পর এইরূপ পরিণতি হামেশাই হইয়া থাকে। কিন্তু সেই স্বপ্ন, দুর্লভ তালুকদারের অধোগতি, যোগীন বাঁড়ুজ্যের অর্থগৃধ্নুতা ও পত্নীলোভ প্রভৃতির সমন্বয় করিবার জন্য শ্রীমান ঝিণ্টু ও তাহার নৈশ অ্যাডভেঞ্চারের প্রয়োজন হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের 'শিশু বীরপুরুষ' তাহার কল্পিত অ্যাডভেঞ্চারের বর্ণনা দিয়া আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিল :

রোজ কত কি ঘটে যাহা তাহা—
এমন কেন সত্য হয় না, আহা।

পরশুরামের ঝিণ্টু এমনই একজন বীরপুরুষ ; সে 'পিশাচ' ঢুণ্ডুদাস চণ্ডকে ভয় তো করেই না, হেলায় যাহা কিছু আদেশ করিয়া বসে এবং 'বুড়োধাড়ী' পিসীমার বিবাহব্যাপারে স্বচ্ছন্দে কন্যাকর্তার ঝুঁকি লইতে পারে, কিন্তু তাহার কাছে সবচেয়ে প্রিয় হইল কুড়কুড়ে মটর ভাজা। দিনের আলোকে রাত্রির সব অ্যাডভেঞ্চার অলীক প্রমাণিত হইতে পারে, ঢুণ্ডুদাস তো রাত্রিতেই অন্তর্হিত হইলেন, সকাল বেলা সোনা, টাকা প্রভৃতি সব উড়িয়া যাইতে পারে, কিন্তু হাতের কাছের মটর ভাজার আস্বাদ তো মিথ্যা নয়। কমেডির আবেদনের উৎস বেমানান বস্তুর বৈপরীত্য ও সুসঙ্গতি। এই গল্পে রোমান্স ও নোংরামি, স্বপ্নভঙ্গ ও গদ্যময় বাস্তব এবং সেই সঙ্গে কিশোর বালকের সহজ, সরল চপলতা ও স্বল্পে সন্তোষ অতি সহজে মিশিয়া গিয়াছে।

ঝিণ্টু শিবামুখী চিমটে লইয়া অঘটন ঘটাইয়াছে ; তবু রোমান্সের পতন ও উত্থানের যে কাহিনী গল্পের মূল বিষয় তাহার সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই। রটন্তীকুমার তাহারই বয়সী, তাহার অপেক্ষাও সরল, কিন্তু যে গল্পে তাহার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হইয়াছে সেইখানে সে নিজেই শিশুসুলভ সরল বুদ্ধিতে,

খানিকটা বুঝিয়া এবং খানিকটা না বুঝিয়া, কৃত্রিম রোমান্সকে ধূলিসাৎ করিয়াছে এবং প্রকৃত রোমান্সের অভ্যুদয়কে সহজ ও সম্ভব করিয়া দিয়াছে। এইজন্যই তাহারই নামানুসারে গল্পটির নামকরণ সার্থক হইয়াছে। পরশুরামের অন্যান্য অনেক গল্পের মত এই গল্পেও ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ যথেষ্ট পরিমাণে আছে, কিন্তু ইহার পরিসমাপ্তিতে রোমান্সই জয়ী হইয়াছে। শেক্সপীয়ারের নাটকে, যেখানে বিজ্ঞ লোকের বিজ্ঞতা হার মানিয়াছে, সেইখানে ডগ্‌বেরির গর্দভোচিত—O that I were written down an ass!—নির্বুদ্ধিতা শত্রুপক্ষের জারিজুরি ফাঁস করিয়া দিয়াছে। এই গল্পেও রুবির মার বহু যত্নে নির্মিত, বহু চক্রান্তের দ্বারা সুরক্ষিত ব্যবস্থাবন্দোবস্ত একটি শিশুর একটি সরল সত্য কথার কাছে তাসের ঘরের মত ভাঙিয়া গিয়াছে। রুবির বহু প্রত্যাশিত বর ঠিকই বলিয়াছে, রটন্তী-কুমার যে অ্যাটম বম্ ছুঁড়িয়াছে তাহাতেই এই মেকি রোমান্স ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে এবং খগেন অন্য দুই-একটি প্রশ্নের সহজ সরল উত্তরে শুধু যে রুবিদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইল তাহা নহে, রটন্তীকুমার ওরফে রটাইয়ের বড়দিদি সুন্দরী, গুণান্বিতা জয়ন্তীমঙ্গলা সম্পর্কেও কৌতূহলী হইল। রটাইকে খগেন বলিয়াছিল, 'তুমি খুব ভাল ছেলে, শুধু একটু কাণ্ডজ্ঞানের অভাব⋯'। এই কাণ্ডজ্ঞানহীন বালকের নির্বন্ধাতিশয্যেই খগেন ও জয়ন্তীর ঘন ঘন দেখাসাক্ষাৎ সম্ভব হইল এবং আড়ালে থাকিয়া পঞ্চশর তাঁহার অমোঘ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে পারিলেন। পরিণতবয়স্ক ডগ্‌বেরির সঙ্গে বালক রটন্তীকুমারের তুলনা একটু বিসদৃশ মনে হইতে পারে এবং এই দুই কাহিনীর পরিস্থিতিও বিভিন্ন রকমের। কিন্তু ইহাদের মধ্যে মৌলিক সাদৃশ্যও আছে। উভয়েরই কাণ্ডজ্ঞানের অভাব আর এই কাণ্ডজ্ঞানহীনতার জন্যই নায়ক নায়িকার রোমান্স জয়ী হইয়াছে; বুদ্ধিহীন ডগ্‌বেরি চক্রী ডন জনের ষড়যন্ত্র ছিন্নভিন্ন করিয়া এবং হিরোর বিভ্রান্ত, হতবাক অভিভাবকদের বিজ্ঞতাকে তুচ্ছ করিয়া তাহার সঙ্গে ক্লডিওর মিলন সম্ভব করিয়াছে এবং যে সুপাত্রের সংবাদ রটাইর অভিভাবকরা ঘুণাক্ষরেও জানিতেন না রটাই তাহার সঙ্গে পাত্রীর শুধু পরিচয় করাইয়া দিল না, তাহার সরল শিশু-সুলভ বাড়াবাড়ির জন্যই খগেনের সঙ্কোচ এবং জয়ন্তীর আপত্তি বিদূরিত হইল। এই কমিক গল্প যাহাতে ভাবালুতায় আচ্ছন্ন না হইয়া পড়ে সেইজন্য গ্রন্থকার উপসংহারে খুব মানানসই প্রহসন যোগ করিয়া দিয়াছেন। খগেন ও জয়ন্তীর বিবাহে রুবিদের বাড়ি হইতে কেহ আসিল না, কিন্তু তাহাদের বন্ধু কেন্টেদের

বাড়ির সবাই আসিয়াছিল, মায় তাহার পিসী যিনি বেহায়া জয়ন্তীটার মুখে ঝাঁটা মারা উচিত এইরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন। তিনি ঝাঁটার পরিবর্তে একটা থলে লইয়া গিয়াছিলেন এবং ভাঁড়ার থেকে গণ্ডা পাঁচেক কড়া পাকের সন্দেশ আর জয়ন্তীর উপহার সামগ্রী হইতে খান দুই রসাল গল্পের বই সরাইয়াছিলেন।

(৪)

পরশুরাম সব রকম বয়সের স্ত্রীপুরুষের জীবনের রোমান্সের কৌতুকোজ্জল চিত্র আঁকিয়াছেন। তাঁহার হাস্যরসে, রোমান্স, কৌতুক, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ প্রভৃতি বিবিধ উপাদানের সম্মিলন হইয়াছে এবং কোথাও কোথাও করুণরসের ম্লানছায়া সূর্যাস্তের স্বর্ণমেঘস্তরের মত এই উজ্জল চিত্রকে বর্ণবৈচিত্র্য দান করিয়াছে। বালকবালিকার মিলনে রোমান্সের যে পূর্বাভাষ থাকে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় 'কৃষ্ণকলি' গল্পে। কালিন্দী—অশ্রদ্ধায় কেলিন্দী—মাতৃহীন নিরাশ্রয় বালিকা। ছুতোর মিস্ত্রীর বৌ তাহার দশ বৎসর বয়স্ক ছেলে রাম বা রেমোর সঙ্গে কালিন্দীর বিবাহ দিয়া হারানো মায়ের স্থান গ্রহণ করিল; গ্রন্থকার এই কালো মেয়ের লাবণ্য দেখিয়া রবিঠাকুরের কবিতা স্মরণ করিয়া তাহার নাম রাখিলেন 'কৃষ্ণকলি' এবং বিশেষ কিছু না বুঝিয়াও সে ইহাতে খুব গর্বিত হইল। এখনও সে স্বামী রামকে প্রতিবেশী বালক খেলার সাথী রেমো বলিয়াই মনে করে এবং রেমো তাহাকে 'পেত্নী' বলিলে সে রেমোকে চিমটি কাটিয়া দেয়। রাম তাহার অপেক্ষা দু বছরের বড়, কিছু বেশি বুঝে এবং সেইজন্যই প্রকাশ্যে তাহার সান্নিধ্যে লজ্জিত বোধ করে। কিন্তু বালিকা বধূর কোন সঙ্কোচ নাই; সে অনায়াসে রেমোকে হিড়হিড় করিয়া টানিয়া আনিয়া হাজির করিতে পারে। তবু রেমোর সঙ্গে তাহার যে একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে সে বিষয়ে সে একেবারে অচেতন নয়। সে প্রকাশ্যে রামের নাম মুখে আনিয়া লজ্জিত হইয়াছে এবং ইহাও জানে যে রাম ছাড়া—বুড়োদের কথা আলাদা—অন্য কোন পুরুষ তাহার গায়ে হাত দিতে পারে না। তাহার শাশুড়ী আরও জানে যে এই পথেই যৌবনোদ্গমের সঙ্গে 'লজ্জাশরম' আসিবে এবং শুধু আলংকারিক বা মনস্তাত্ত্বিকরা নহেন, আমরা সবাই জানি এই লজ্জাশরমের আড়ালেই অতনু দেবতা উঁকিঝুঁকি দিতে আরম্ভ করিবেন।

তরুণ-তরুণীদের রোমান্স লইয়া পরশুরাম যে সকল কৌতুকোজ্জ্বল গল্প লিখিয়াছেন তন্মধ্যে সবচেয়ে মনোরম হইল 'চিঠিবাজি'। আমাদের দেশে বিবাহকে সামাজিক বন্ধন বলিয়া মনে করা হইত; স্বামী-স্ত্রীর নিভৃত সম্বন্ধ মুখ্য হইলেও তাহা এই বৃহত্তর বন্ধনেরই অন্তর্ভূক্ত ছিল। কাজেই বিবাহের পূর্বে পাত্রপাত্রীর দেখা হইত না; বিবাহের অনুষ্ঠানেই তাহাদের 'শুভদৃষ্টি' অর্থাৎ প্রথম দৃষ্টি। পরশুরাম যখন লেখার আসরে নামিয়াছেন, তখন অবশ্য মেয়েদের বিবাহের বয়স বাড়িয়া গিয়াছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাহারা 'স্বয়ংবরা'ও হইতেছে। 'চিঠিবাজি'তে প্রাচীন প্রথা ও নবীন রুচি লুকোচুরি খেলিয়া অপরূপ পূর্বরাগের সৃষ্টি করিয়াছে। সুকান্ত দত্ত বিদ্বান, সচ্চরিত্র অভিভাবকের বশংবদ পাত্র। সেকেলে সুবোধ ছেলে মামার পছন্দ বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করিয়াছে। পাত্রী সুনন্দা সুন্দরী, লেখাপড়া জানে না এমন নয়, কিন্তু বি.-এস.-সিই পাস করিতে পারে নাই; তবু খুব চালাক। পাত্র সুকান্ত ডাক্তার হইলেও তাহার নারীজ্ঞান নাই আর পাত্রী সুনন্দা আণ্ডার গ্রাজুয়েট হইলেও ডক্টর-পাত্রের রোগ অতি সহজেই ধরিয়া ফেলিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া পছন্দ করিয়াছেন মামাবাবু; সুশীল বাধ্য ছেলে হইলেও পাত্রী সম্পর্কে তাহার কৌতূহল আছে এবং এইজন্যই উপযাচক হইয়া সবিনয়ে নিজের অযোগ্যতার কথা পাত্রীকে জানাইয়াছে। এই সরলতা, অভিভাবকের আজ্ঞানুবর্তিতা অথচ ভাবী স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ জমাইবার ব্যগ্রতা—এইসব দেখিয়া এই সুচতুরা, আত্ম-বিশ্বাসপরায়ণা যুবতী বুঝিয়া ফেলিয়াছে, এ মাছ জালে ধরা দিয়াছে এবং ইহাকে লইয়া একটু খেলা করিলে শৃঙ্গাররসের আস্বাদ মধুরতর হইবে। কাজেই সরল সুশীল পাত্র যতই সত্যের আবরণ উন্মোচন করিয়াছে এই দুঃসাহসিকা তরুণী ততই অকুতোভয়ে মিথ্যার আভরণ স্তূপীকৃত করিয়াছে। সুনন্দার উদ্ভাবনবৈদগ্ধ্য সুকান্তর মনখোলা উদ্ঘাটনের সঙ্গে ধাপে ধাপে তাল রাখিয়া পবন ভাদুড়ীর সঙ্গে ইলোপমেণ্টের কাহিনীতে চরমে পহুঁছিয়াছে। সে জানে যে তখন বিবাহের প্রাক্কালে সুকান্তর আর সত্য যাচাই করিবারও সময় থাকিবে না এবং শুভদৃষ্টি ও বাসরশয্যায় মোহভঙ্গের মধ্য দিয়াই সুকান্ত ও তাহার গতানুগতিক আনুষ্ঠানিক মিলন বিস্ময়কর রোমান্সের বর্ণাঢ্যতা লাভ করিবে।

'চিঠিবাজি'তে যে ব্যাপিকা প্রগল্‌ভা দুর্বিনীতা নায়িকা ও সরল সুপণ্ডিত

নায়কের চিত্র আছে তাহাদেরই প্রাচীন সংস্করণের দেখা পাই 'ডম্বরু পণ্ডিত' গল্পে। সেইখানেও পাত্র শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত কিন্তু সাংসারিক বিষয়ে অনভিজ্ঞ, পাত্রী শিলীন্ধ্রী তেমন লেখাপড়া জানে না, সে শুধু রাজার মালঞ্চের মালিনী; কিন্তু রাজা ও তাঁহার মহিষী ও উপমহিষীদের ফুলের যোগান দিতে যাইয়া প্রণয় ও তাহার বিচিত্র লীলা দেখিয়া সে সাংসারিক জ্ঞান লাভ করিয়াছে। তাহার অন্তর্দৃষ্টি যেমন প্রখর বাগ্‌বৈদগ্ধ্যও তেমনি বিস্ময়কর। বহু বিঘোষিত বিক্রমাদিত্যসভার ঐশ্বর্য সে দেখিয়াছে আবার ইহাও দেখিয়াছে যে বিজ্ঞ পারিষদবর্গের মধ্যে একাধিক নিছক চাটুকারও প্রবেশ করিয়াছে এবং ইহাও সে জানে যে নবরত্নের সবাই কবি কালিদাস বা বৈজ্ঞানিক বররুচি নহেন। ইহা ছাড়া আরও একটি জিনিস বিশেষ করিয়া তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকিবে; তাহা হইল রাজার বহুবল্লভতা। গোড়ায় মহাভারতের কাহিনী গ্রহণ করিলেও কবি কালিদাস অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে স্বীয় উদ্ভাবনী প্রতিভাবলে অনেক নূতন সংযোজনও করিয়াছেন এবং মনে হয় যে-রাজাকে অনুসরণ করিয়া তিনি দুষ্মন্তের চিত্র আঁকিয়াছেন তিনি উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্য। সুতরাং মনে করা যাইতে পারে শিলীন্ধ্রী পট্টমহিষী বসুমতীর পূর্বগৌরব এবং অস্তগত মহিমা দেখিয়াছে, উপমহিষী হংসপদিকার বেদনাবিধুর সঙ্গীত শুনিয়াছে এবং নব-মধুলোভী রাজার অনুগ্রহদৃষ্টিতে সে নিজে যুগপৎ পুলকিত ও আতঙ্কিত হইয়াছে। সে জানে এইসব রাজামহারাজার চঞ্চল দাক্ষিণ্য অপেক্ষা ডম্বরু পণ্ডিতের মত সরল, সচ্চরিত্র পণ্ডিতের উপর আধিপত্য কাঙ্ক্ষণীয়। তাহার নিজের ভবিষ্যৎ সে স্পষ্ট করিয়া দেখিয়া লইয়াছিল কিনা তাহা গল্পে বিশদভাবে বলা হয় নাই; তবে সেইরূপ অনুমান করিলে সত্যের অপলাপ হইবে না। সে যাহা হউক, সোজা প্রকৃতির পণ্ডিতের জবানীতে রাজাকে তিরস্কার করিবার এবং ঐশ্বর্যের অন্তরালে প্রৌঢ়ত্বের ম্লানিমার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া সে পণ্ডিতের জবানীতে সভামধ্যে ঘোষণা করিয়া দিল:

আছে তব তিন ভার্যা মহিষী প্রেয়সী,
দশ উপভার্যা নৃত্যগীতপটীয়সী।
তথাপি অবলা বালা শিলীন্ধ্রীর প্রতি
কেন তব লোভ ওহে প্রৌঢ় নরপতি?

এই দুর্বিনীতা যুবতীকে ডম্বরু পণ্ডিত 'সুবিনীতা' গৃহিণীরূপে গ্রহণ করিয়া

রাজকার্যে নিযুক্ত হইলেন। এই পরিণয়ে রোমান্সের সকল উপাদানই বর্তমান, কিন্তু ইহা আগাগোড়া কৌতুকহাস্যে ঝলমল।

রোমান্সের লীলাবৈচিত্র্যের আর একটি সুন্দর ছবি পাওয়া যায় 'জয়হরির জেব্রা' গল্পের নায়িকা বেতসীর হৃদয়ে রতিভাবের স্পন্দনে। শিলীন্ধ্রীর মত সেও পরিণতযৌবনা, কিন্তু দুর্বিনীতা হইলেও সুনন্দা বা শিলীন্ধ্রীর চরিত্রের সঙ্গে তাহার চরিত্রের কোন সাদৃশ্য নাই। সে অহংকারী, বদমেজাজী, পরুষস্বভাবা এবং পুরাদস্তুর মেমসাহেব। তাহার হৃদয়ে কোমল ভাবের স্পন্দনে এবং জয়হরির প্রতি তাহার অনুরাগের উদ্ভবে কেহ কেহ এই গল্পে শেক্সপীয়রের The Taming of the Shrew নাটকের কর্কশা ক্যাথেরিনের ছায়া দেখিতে পাইয়াছেন। কিন্তু জয়হরি অতিশয় নিরীহ মানুষ; পেট্রোসিও যে কর্কশ, অনেকটা বর্বর পদ্ধতিতে ক্যাথেরিনকে পোষ মানাইয়াছে তাহা এলিজাবেথীয় যুগেই সম্ভব; সেই যুগের পুরোধা স্ত্রীহন্তা অষ্টম হেনরী, প্রতিনিধিস্থানীয়া স্বামিহন্ত্রী স্কটল্যাণ্ডের রানী মেরি, জাঁদরেল রাজপুরুষ হইলেন সিসিল, ওয়ালসিংহাম, লীস্টার, এসেক্স, আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার অগ্রদূত জলদস্যু র‍্যলে, ড্রেক প্রভৃতি। শেক্সপীয়রের রচনার আবেদন এত বিশ্বজনীন যে নানা রুচির লোক ইহাদের মধ্যে নানা রকমের রস আবিষ্কার করেন। কেহ কেহ তো The Taming of the Shrewকে রোমান্সবিরোধী মনোভাবাপন্ন কমেডি বলিয়া মনে করেন। শেক্সপীয়রের নায়িকাদের মধ্যে Much Ado About Nothing-এর বিয়াত্রিচের সঙ্গে বেতসীর সমধিক সাদৃশ্য আছে, কারণ তাহারও মিলন হইয়াছিল এমন একজন লোকের সঙ্গে যাহাকে সে প্রতিপক্ষ বলিয়া মনে করিত। এখানেও কিন্তু সাদৃশ্যে মৌলিক অসম্পূর্ণতা রহিয়া গেল, কারণ জয়হরি ও বেনেডিক একেবারে বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ।

জয়হরি-বেতসী সংঘাতের যে চিত্র পরশুরাম আঁকিয়াছেন তাহার অন্যতম প্রধান লক্ষণ জয়হরির অপরাজেয় সৌজন্য এবং অনমনীয় দৃঢ়তা। বেতসী অতিশয় আত্মাভিমানিনী, কিন্তু জয়হরি আর্টের ধর্মের যে ব্যাখ্যা দিয়াছে তাহার দ্বারা বেতসীর সমালোচনা সম্পূর্ণ নিরাকৃত হইয়াছে। বেতসী যতই অভিজাত সংস্কৃতির দম্ভ করুক, জয়হরি প্রমাণ করিয়া দিল যে প্রকৃতপক্ষে বেতসীই 'শার্লাটান'। তারপর তাহার প্রিন্স কুকুর লইয়া যে হাঙ্গামা বাধিয়া গেল তাহাতে ধাপে ধাপে প্রমাণিত হইল যে সকল দিক দিয়া বেতসী ও তাহার কুকুর

এমন কি তাহার ধোবাই দায়ী। জয়হরির শাস্ত, ন্যায়সঙ্গত প্রত্যুত্তর, বেতসীর পিতৃবন্ধু বিষ্ণুরামবাবুর মৃদু তিরস্কার, হাকিমকর্তৃক তাহার প্রস্তাবের প্রত্যাখ্যান, সর্বোপরি জয়হরির সৌজন্য অজ্ঞাতসারে তাহার মনের গভীরে আঘাত করিয়া সেখানকার বিরোধিতাকে বিপরীত পথে চালিত করিতে লাগিল। এখানেও ডগ্‌বেরির আবির্ভাব হইয়াছে মাইতিগিন্নীর রূপ ধরিয়া। মাইতিগিন্নী তাহারই কর্মচারীর স্ত্রী, তবে বুড়ো বলিয়া তাহার খানিকটা বাক্-স্বাধীনতা আছে। সে ডগ্‌বেরির মতই বকবক করে, কিন্তু তাহার বকবকানি বিশৃঙ্খল নহে। বেতসীর আত্মম্ভরিতার অন্তরালে যে সুপ্ত প্রণয়াকাঙ্ক্ষা উন্মেষের অপেক্ষা করিতেছিল মাইতি বুড়ার এলোমেলো কথায় তাহা অবচেতন স্তর হইতে সচেতন স্তরে উপনীত হইল। আর তাহার মামাতো বোন বেবির প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্ভাবনায় সে বিচলিত হইয়া পড়িল; অবশ্য ইহাতে বিচলিত হইবার কোন কারণ নাই, কারণ আধুনিক কালে ঈর্ষাই রতির প্রধান ব্যভিচারী ভাব। এইরূপে আত্মম্ভরিতা শত্রুতার মাধ্যমে প্রণয়ে রূপান্তরিত হইয়াছে।

'নীলতারা' গল্পটিও রোমান্টিক কমেডি; বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া পাত্র ও পাত্রী মিলিত হইতে চলিয়াছে এবং মিলনের যে প্রতিবন্ধক ছিল ভাগ্য-ক্রমে তাহাই ইহাদিগকে মিলিত করিয়াছে এবং সমৃদ্ধিও আনিয়া দিয়াছে। গল্প যখন আরম্ভ হইয়াছে তখন রাখাল মাস্টারের বয়স তেত্রিশ; সে বিগতযৌবন কিন্তু প্রৌঢ়ত্বে পহুঁছে নাই। সে কুইন ভিক্টোরিয়ার আমলের লোক; সেই আমলে বলা যাইত যে বিবাহের বয়স পার হইয়া গিয়াছে। রাখাল মুস্তৌফী অনূঢ়, খুব খেয়ালী লোক, তামাক খায়, ছাত্র পড়ায় আর কবিতা লিখে। সে মনে করে সেই তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ কবি, হেম বাঁড়ুজ্যের চেয়ে ভাল কবিতা লিখিতে পারে এবং সেই স্বাভিমানেই সে মশগুল হইয়া আছে। কিন্তু মনে হয় সে হতাশার কাব্যই লিখিয়া থাকে: 'ক্ষিপ্ত বায়ু, ধূলি মাখে গায় শুষ্ক বৃক্ষে ঝটিকার প্রভাব কোথায়' ইত্যাদি। এই ছিটগ্রস্ত স্কুলমাস্টার দাড়ি কামায় না এবং চুলের যত্ন নেয় না। কিন্তু ইহার অন্তরালে কোন ট্র্যাজেডিও লুক্কায়িত থাকিতে পারে।

গল্পকারের কৌশলে ক্রমে প্রকাশ পাইল, তাহার একটা করুণ অতীত ইতিহাস আছে। সে একসময় রূপচাঁদপুরের রাজার চাকুরি করিত; তখন প্রতিবেশী রামকৃষ্ণ রায়ের রূপসী ভাগ্নী সাবিত্রী তাহার কাছে লেখাপড়া করিত

এবং ইহাদের মধ্যে বিবাহ সম্পর্কও স্থির হইয়াছিল। বিবাহসভায় অত্যাচারী লম্পট রাজা উপস্থিত হইয়া জোর করিয়া সাবিত্রীকে বিবাহ করিয়া লইয়া যায় এবং প্রবঞ্চিত পাত্র রাখাল বেহালায় স্বগৃহে ফিরিয়া আসিয়া মাস্টারি ও কবিতা রচনায় মনোনিবেশ করে। বিবাহের পাঁচ মাস পরেই লম্পট মাতাল রাজার মৃত্যু হয় এবং তাহার কিছুদিন পরেই বিধবা রাণী সাবিত্রী তাহার গৃহশিক্ষিকার সঙ্গে পলায়ন করিয়া কলিকাতায় আসিয়া একটি স্কুলে চাকুরি যোগাড় করে। গল্পকার অতি সংক্ষেপে ইহাদের অম্লান পূর্বরাগের পরিচয় দিয়াছেন। দশ বৎসর ইহাদের মধ্যে কোন সংযোগ নাই। কিন্তু রাখাল বিবাহ করে নাই, 'হতাশের আক্ষেপ' জাতীয় কবিতা লিখিয়া চিত্তবিনোদন করিয়াছে এবং বিধবা সাবিত্রীকে শার্লক হোমস্ 'রাণী' বলিয়া উল্লেখ করিলে রাখাল জবাব দিয়াছে, 'রাণী বলবেন না বলুন সাবিত্রী দেবী।' সম্পূর্ণ খৃষ্টান পরিবেশে প্রায় দশ বৎসর কাটাইলেও এবং শিক্ষয়িত্রীর সনির্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও সাবিত্রী খৃষ্টান হইতে রাজি হয় নাই। ইহা হইতে মনে হয় সে গোপনে রাখালের স্মৃতি হৃদয়ে পোষণ করিতেছিল; নীলতারার বিষয়ে সে শার্লক হোমস্‌কে বলিয়াছে, 'আমার কিছু স্থির করার শক্তি নাই। ...আপনি মুস্তৌফীর সঙ্গে কথা বলবেন, তিনি যা বলবেন তাই হবে।' দশ বৎসর পর রাখাল সাবিত্রীর সঙ্গে দেখা করিয়া চার ঘণ্টা কাটাইয়া আসিল এবং ইহাও লক্ষণীয় যে সে এইদিন দাড়ি কামাইয়া ফেলিয়াছিল। সেইদিন সন্ধ্যায় তাহার প্রিয় শিষ্য নারায়ণকে যে একটা ইংরেজি কবিতা বুঝাইয়া দেওয়ার কথা ছিল তাহাও সে ভুলিয়া গিয়াছিল এবং সেইদিন সে যে কবিতা নিজে রচনা করিল তাহার সুরও অন্য রকমের: 'বরষে ধারা, ভূমি শীতল, তাপিত তরু পেয়েছে জল; টানিছে রস তৃষিত মূল, ধরিবে পাতা ফুটিবে ফুল!' সংক্ষিপ্ত ব্যঞ্জনাময় অভিব্যক্তি এই রোমান্টিক কাহিনীকে অনন্যতা দান করিয়াছে।

পরশুরাম বুড়ো বয়সের রোমান্সের কথাও লিখিয়াছেন; ইহার মধ্যে মিলন ও বিপ্রলম্ভ দুই-ই আছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে স্মৃতি-বিস্মৃতিতে আলো-আঁধারের লুকোচুরি খেলা কৌতুকহাস্যের সৃষ্টি করিয়াছে। বর্তমান প্রসঙ্গে তিনটি গল্পের অবতারণা করা যাইতে পারে, 'বরনারী বরণ', 'তিরি চৌধুরী' ও 'যশোমতী'। 'বরনারী বরণ' গল্পটি কৌতুকাবহ, কারণ ন্যায়বিচারের প্রধান শর্ত বিচারকের অপক্ষপাতিত্ব আর এখানকার অশীতিপর প্রবীণ বিচারক

'বরনারী' হিসাবে স্বীয় পককেশী স্ত্রীকেই জয়মাল্য দান করিলেন। বামাপদ ঘোষালের স্ত্রী রাজলক্ষ্মীদেবী সাহিত্যভাস্বতী এইরূপ বরনারীবরণ' প্রথাকে আমাদের কালচার ও ঐতিহ্যের পরিপন্থী বলিয়া এই অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনিই 'অথব্বে থুখ্‌ড়ে বুড়ী'কে সর্বপ্রথমে অভিনন্দন করিলেন ও বিচারককে ধন্যবাদ জানাইলেন এবং (গ্রন্থকার টিপ্পনী করিয়াছেন) এই অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পরই নিজের স্বামীর দিকে কটমট করিয়া তাকাইলেন! এই শেষের মন্তব্যের মধ্য দিয়া শুধু রাজলক্ষ্মী ও বামাপদ নয় অন্যান্য সমবেত সীমন্তিনীদের দাম্পত্য জীবনের ছবি প্রতিফলিত হইয়াছে। এই জাতীয় সংক্ষিপ্ত, ব্যঞ্জনাগর্ভ উক্তি পরশুরামের রচনায় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেয় এবং বিচারকের পদ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করার জন্য চপলমতি যুবতীরা যে খ্যাতনামা চলচ্চিত্র প্রযোজক ভূপেন হালদার ও চিত্রশিল্পী নিখিলেশ্বর সেনকে কাওয়ার্ড বলিয়া তাচ্ছিল্য করিয়াছিল তাহার সার্থকতাও উপলব্ধি করা যায়।

এই গল্পটির প্লট অকিঞ্চিৎকর আর চটকদার বরনারীবরণ উৎসবের ঘোষণা করিয়া যদি বুড়ো স্বামীকে বিচারক নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে দিয়া স্বীয় 'অথব্বে' বুড়ী স্ত্রীকে বরণ করা হয় তাহা হইলে উৎসব যে প্রহসনে পরিণত হয় তাহা বলাই বাহুল্য। তাহা হইলেও ইহা রোমান্টিকও বটে এবং এই রোমান্সের আভাস পরশুরাম 'সিদ্ধিনাথের প্রলাপ' গল্পকল্পে দিয়াছেন; সিদ্ধিনাথ পরিহাসচ্ছলে বলিয়াছেন একত্র বসবাসের ফলে বন্দিনীর শৃঙ্খল গৃহিণীর অলংকারে উন্নীত হয়। এই পরিহাসের অন্তরালস্থিত রোমান্সেরই কাব্যময় অভিব্যক্তি দিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্গদার জবানীতে:

যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী;
আমার পাইবে তবে পরিচয়।

বুড়োবুড়ীকে নিয়ে আর একরকম রোমান্স ও কৌতুকহাস্যের অবতারণা করা হইয়াছে—'তিরি চৌধুরী' গল্পে। তিরি নিজে অবশ্য তরুণী; তবে কতকগুলি মাইট-হ্যাভ-বিন্ বা হইলে-হইতে-পারিত ব্যাপার লইয়া সে একটু

কৌতুকহাস্তের সৃষ্টি করিয়াছে এবং একজোড়া বুড়োবুড়ীর বিবাহের রোমান্টিক প্রস্তাব পর্যন্ত করিয়াছে। চটপটে তিরির তৎপরতায় গল্পে কিছু জটিলতার আমদানী হইলেও ইহা মূলতঃ খুব হালকা ধরনের এবং ইহাতে কোথাও গভীরতার আভাস নাই। যুবক প্রিয়নাথ চৌধুরীর একটু পূর্বরাগ জন্মিয়াছিল সুন্দরী প্রভাবতী ঘোষকে দেখিয়া। কিন্তু প্রভাবতীর পিতা উপযুক্ত বরপণ দিতে না পারায় সেই সম্বন্ধ ভাঙিয়া যায়। প্রভাবতী লেখাপড়া শিখিয়া সরকারী চাকুরিতে প্রবেশ করেন। প্রিয়নাথ চৌধুরীর বিবাহ হয় কনকলতার সঙ্গে; কনকলতাও রূপসী এবং এখানে উপযুক্ত বরপণও জুটিয়াছিল। কনকলতারও একটু ইতিহাস আছে; অনূঢ়া অবস্থায় গৌরগোপাল মিত্র নামে এক যুবক তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু প্রচুর সম্পত্তির লোভে গৌরগোপালের পিতা অন্যত্র পুত্রের বিবাহ দেন। গৌরগোপাল ও প্রিয়নাথ উভয়েই সলিসিটর এবং উভয়েই খুব সম্পন্ন ব্যবহারজীব। এই সব মেয়ে দেখাদেখি এবং বিবাহের অধ্যায়ের পঞ্চান্ন বৎসর পর গল্প আরম্ভ হইয়াছে। গৌরগোপালবাবু এখন বিপত্নীক এবং আইনব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিলেও তিনি এখন ধর্মগ্রন্থে মনোনিবেশ করিয়াছেন। ইহাদের নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রায় মৃদু ঝড় আনিয়া দিলেন প্রিয়-নাথের 'পুরাতনী শিখা' প্রভাবতী ঘোষ। তিনি কুমারীই রহিয়া গিয়াছেন, সরকারী চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় বাড়ি কিনিবার ব্যাপারে প্রিয়নাথের কাছে ঘন ঘন যাতায়াত করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের মনে পুরাতন স্মৃতি জাগ্রত হউক বা না হউক প্রবীণা কনকলতার চিত্ত ঈর্ষায় মথিত হইতে লাগিল।

প্রাচীনার এই ঈর্ষারোগের উপযুক্ত দাওয়াই উদ্ভাবন করিল নাতনী তিরি। প্রভাবতীকে দেখার ফলে প্রিয়নাথের মন যদি চঞ্চল হইয়া উঠে, তবে অনুরূপ-ভাবে গৌরগোপালের সান্নিধ্যেও কনকলতার হৃদয়ও দোলায়িত হইতে পারে। তিরি স্বীয় জন্মদিনের উৎসবে অন্যান্যের মধ্যে গৌরগোপাল ও প্রভাবতীকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিল। একত্র হইলেন গৌরগোপাল, তাঁহার হইতে-পারিত স্ত্রী কনকলতা এবং প্রভাবতী ও তাঁহার হইতে-পারিত বর প্রিয়নাথ। এখানে তিরি তাহার তূণের সবচেয়ে সাংঘাতিক অস্ত্র নিক্ষেপ করিল। গৌরগোপালের রূপের প্রশংসা করিয়া সর্বশেষে সে কনকলতাকে বলিয়া ফেলিল, 'তুমি কিন্তু গৌরগোপালবাবুর দিকে অমন করে আড়চোখে তাকিও না বাপু, ঠাকুদ্দা মনে

করবেন কি?' বিষে বিষক্ষয়; প্রিয়নাথের মনে ঈর্ষার উদয়ের সম্ভাবনায় কনকলতা প্রভাবতীরই শরণাপন্ন হইয়া বলিলেন, 'ও মাস্টার, দিদি প্রভা, এই তিরিটাকে বেত মেরে সিধে করতে পার না? জ্বালিয়ে মারলে আমাকে!' এই প্রভাবতীকেই তিনি পূর্বে ডাকিনী, যোগিনী, শাঁকচুন্নী আখ্যা দিয়াছিলেন। এইভাবে টেক্কা তুরুপ দিয়া তিরি প্রভাবতী ও কনকলতার মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া ফেলিল।

'যশোমতী' গল্পটির সঙ্গে 'তিরি চৌধুরী' গল্পের একটা মিল আছে যাহা হয়ত আকস্মিক, কিন্তু তাৎপর্যময়। উভয় গল্পের কাহিনীর সূত্রপাত ও পরিণতিতে ব্যবধান পঞ্চান্ন বছরের। উভয় গল্পে কৈশোরের স্মৃতি জাগ্রত হইয়াছে পরিণত বার্ধক্যে। তবে 'যশোমতী' গল্পটি অনেক বেশি ভাবগভীর এবং এখানে দেখা গেল, স্ফুটনোন্মুখ যৌবনের রোমান্স অর্ধশতাব্দী পরেও অম্লান রহিয়াছে, আবার তাহার চতুর্দিকে ব্যর্থ-প্রণয়ের ম্লানিমার সঙ্গে সংযত জীবনের বিশুদ্ধতাও জড়াইয়া গিয়াছে। এই গল্পটি পড়িলে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি পংক্তি মনে পড়ে:

তুমি মোর জীবনের মাঝে
মিশায়েছ মৃত্যুর মাধুরী

* * *

এঁকে গেছ সব ভাবনায়
সূর্যাস্তের বরণ চাতুরী।

অবশ্য 'বরণচাতুরী' কথাটা এখানে খাটিবে না, কারণ হতাশ প্রেমের সমস্ত বর্ণবৈচিত্র্য মিশিয়া গিয়া পবিত্রতার প্রতীক অবিমিশ্র শুভ্রতায় মিশিয়া গিয়াছে। পরশুরাম নিজেই যশোমতীর বাড়িতে পুরঞ্জয় ভঞ্জের সান্ধ্যভোজনের বর্ণনায় এই ভাবটি স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন: 'সাদা কম্বলের আসন, সাদা পাথরের থালায় ধপধপে সাদা চিঁড়ে, সাদা কলা, সাদা সন্দেশ, সাদা দই। আবার, সামনে একটি সাদা বেড়াল বসে আছে......এই পবিত্র শুভ্র খাদ্যসম্ভার পরিবেশন করেছেন? একজন শুভ্রবসনা শুভ্রকেশী শুভ্রকান্তি শুচিস্মিতা সুন্দরী......'।

এই গল্পটির একটি ত্রুটি এই যে এখানে সবই স্পষ্ট বর্ণনা বা কথোপকথনের মারফতে প্রকাশিত হইয়াছে, আভাস ইঙ্গিত সঙ্কেতের স্থান খুব সীমিত। সংস্কৃত আলংকারিকদের ভাষায় বলা যায়, এখানে অভিধারই প্রাধান্য, ব্যঞ্জনা প্রায় অনুপস্থিত। তাহা হইলেও বিষয়ের অভিনবত্বে, ভাষার স্বচ্ছতায়, সর্বোপরি

সংক্ষিপ্ত পরিসরে বিভিন্ন ভাব তথা রসের সমাবেশে এই গল্পটি অনন্য। পঞ্চান্ন বছরের ব্যবধানে পুরঞ্জয় ভঞ্জ ও যশোমতীর অতর্কিত সাক্ষাৎ বিস্ময়ের সৃষ্টি করে; কিশোরী যশো পিতামাতার অবাধ্য হইয়া প্রেমাস্পদ পুরঞ্জয়কে বিবাহ করিতে পারে নাই, তাহাকে বিবাহ করিয়াছে এক অর্থলোলুপ বর যাহার সঙ্গে তাহার প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হয় নাই এবং পুরঞ্জয়ের সাময়িক পদস্খলনও নিজের মনে বিরক্তিরই সঞ্চার করিয়াছে, সুতরাং জুগুপ্সা এই গল্পের অন্যতম সঞ্চারী ভাব, আবার যে ভাবে উভয়েই ইন্দ্রিয়সংযম করিয়াছে তাহার মধ্যে বীরত্বেরও পরিচয় পাই; যশোমতীর একমাত্র পুত্রের মৃত্যু তাহার জীবনকে করুণ রসে আপ্লুত করিয়াছে এবং যে ভাবে উভয়েই প্রশান্ত ধৈর্যের সহিত নিজেদের প্রবঞ্চিত জীবনকে গ্রহণ করিয়াছে তাহা শান্তরসেরও আস্বাদ দেয়। অবশ্য অঙ্গীরস হইল রোমান্স বা আদিরস। পঞ্চান্ন বৎসর দেখাসাক্ষাৎ নাই, যশোমতীর কোথায় বিবাহ হইয়াছিল পুরঞ্জয় তাহাও জানেন না। তবু প্রণয়িনীর ছবি তাঁহার হৃদয়ে অম্লান দীপ্তিতে ভাস্বর হইয়া রহিয়াছে এবং যে কিশোরী তাঁহাকে একদিন মুগ্ধ করিয়াছিল অর্ধশতাব্দী পরে তাঁহার বার্ধক্যের মূর্তিতে নূতন প্রেরণা পাইয়াছেন। এই সুদীর্ঘ কাল যশোমতীর হৃদয়ের তলদেশে বিভিন্ন ভাবের যে সংঘাত চলিয়াছে প্রগল্‌ভবাক্‌ পুরঞ্জয় কিন্তু তাহা অনুধাবন করিতে পারেন নাই। তাই—'তুমি কিছু বোঝ না'—এই একটি কথার দ্বারা যশোমতী পুরঞ্জয়কে থামাইয়া দিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজ হৃদয়ের রহস্য প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। আর পৌত্র ধ্রুব এবং নাতবৌ রাকার চপল মন্তব্য এই গল্পকে রজতরেখার উজ্জ্বলতা দান করিয়াছে।

(৫)

অনেকগুলি গল্পে পরশুরাম মেকি রোমান্স লইয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন অথবা সকৌতুকে প্রকৃত রোমান্সের বর্ণনা দিয়াছেন। অন্য কতকগুলি গল্প আছে যেখানে নরনারীর যৌনসম্পর্ক ব্যঙ্গের বিষয়ীভূত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে বিকৃত রুচিকে ব্যঙ্গ করিয়া লিখিত কয়েকটি গল্পের কথা মনে আসিবে। 'ধুস্তুরি মায়া'র কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তবে তাহা রূপকথার পর্যায়েই পড়ে এবং অলৌকিক মায়ার প্রভাবে পড়িয়াও উদ্ধব নন্দী কাণ্ডজ্ঞান হারান নাই।

পুরুষের বিকৃত রুচির সবচেয়ে হাস্যকর এবং উৎকট চিত্র আঁকা হইয়াছে 'রাজভোগ' নামক গল্পকল্পে। পাতিপুরের রাজা সেকেলে বনেদী জমিদার। এখন বৃদ্ধ হইয়াছেন। ভোগের আসবাব সবই আছে, কিন্তু ভোগের ক্ষমতা চলিয়া গিয়াছে। উপকরণের প্রাচুর্য, অপরিমেয় ভোগাসক্তি এবং তদধিক ভোগ করিবার অক্ষমতা তাহাকে উপহাসাস্পদ করিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে অবজ্ঞার পাত্রে পরিণত করিয়াছে। এই গল্পে দ্বিমুখী হাস্যরসের সঙ্গম হইয়াছে। রাণীসাহেবা সমভিব্যাহারে রাজাবাহাদুরের অভ্যাগমে অ্যাংলোমোগলাই হোটেলের ম্যানেজার রাইচরণ চক্কোত্তির কর্মজীবন সার্থক হইল ; সে এইরূপ খদ্দের পাইয়া ও মহামান্য খদ্দেরের আগ্রহ দেখিয়া নানা রকমের খাদ্যের ফিরিস্তি দিয়া নিজের কৃতিত্বের পরিচয় দিতে লাগিল এবং তাহার বড় বড় অর্ডারের প্রত্যাশা বাড়িয়া যাইতে লাগিল। এই সব চর্ব চোষ্য লেহ্য পেয় ভোজ্য দ্রব্যের ফিরিস্তি শুনিয়া বারংবার রাজাবাহাদুরের জিভে জল আসিল এবং সব সময় তিনি তাহা সংবরণও করিতে পারিলেন না। কিন্তু তাঁহার উপভোগ ঐ পর্যন্তই ; (মনে হয় বহু অত্যাচারের ফলে) রাজাবাহাদুরের খাদ্য হজম করিবার শক্তি একেবারে লুপ্ত হইয়াছে এবং তিনি অর্ডার দিলেন—এক কাপ জলে এক চামচ বার্লি সিদ্ধ এবং সঙ্গে একটু নেবু ও নুন। রাইচরণ তো আকাশ হইতে পড়িল ! তাহার যে অর্থলোভ বেলুনের মত ফাঁপিয়া উঠিয়াছিল তাহা এক খোঁচায় বেলুনের মতই ফাটিয়া গেল।

ইহার সঙ্গে পরশুরাম আভাসে আর একটি কথা বলিয়াছেন ; তাহা স্পষ্ট না হইলেও ব্যঞ্জনাময়। এই অপচিতশক্তি বৃদ্ধের নারীসঙ্গের প্রতি লোভ আছে, কিন্তু সেখানেও তাঁহার হ্যাংলামো ও অসামর্থ্য সুসজ্জিতা সঙ্গিনীর দুই-একটি মন্তব্যের মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। সবগুলি মন্তব্যই ঔদাসীন্য অধৈর্য বিরক্তি ও অবজ্ঞার পরিচায়ক। প্রথমে তিনি গাড়ি হইতে নামিতেই চাহেন নাই ; পরে রাজাবাহাদুর যখন খাবারের ফিরিস্তি লইতেছিলেন, তখন তিনি অধীর হইয়া বলিলেন, 'ওসব জিজ্ঞেস করে কি হবে, যা খাবে তাই আনতে বল না।' তারপর অধৈর্য চাপিতে না পারিয়া তিনি পাশের কামরায় যাইয়া মাসিক পত্রিকা নাড়াচাড়া করিতে লাগিলেন। রাজাবাহাদুরকে বার্লি দিয়া রাইচরণ যখন এই রাণীমাকে পোলাও কারি আর রোস্ট দিতে চাহিল তখন তিনি তাচ্ছিল্যের সহিত বলিলেন, 'খেপেছেন ? আমি খাব আর ঐ হ্যাংলা

বুড়ো ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে দেখবে! গলা দিয়ে নামবে কেন?' বুড়োর নিকট হইতে অর্থ পাইয়া ইনি ভ্রমণসঙ্গিনী হইয়াছেন, কিন্তু বুড়োর নিজের নর্মসহচর হওয়ার যোগ্যতা চলিয়া গিয়াছে। ইঁহার সর্বশেষ উক্তিটি এই কমেডির চরম তাৎপর্য বহন করে: 'রাণী-ফানি নষ্ট, আমি নক্ষত্র দেবী। আর একদিন আসব এখন স্টুডিওর ফেরৎ। ডিরেক্টর হাঁদুবাবুকেও নিয়ে আসব।'

ব্যঙ্গরসিক পরশুরাম মুনিদের মধ্যে বিশ্বামিত্রের উপর সবচেয়ে বেশি বিরূপতা দেখাইয়াছেন। স্বভাবতঃই রাজাদের মধ্যে যযাতিও তাঁহার মনে জুগুপ্সার উদ্রেক করিয়াছিলেন। পৌরাণিক কাহিনীতে যযাতির যে বিবরণ পাই তাহা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে না। বিংশ শতাব্দীর 'পরশুরাম' তাঁহাকে আরও বেশি হাস্যাস্পদ করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আরও কতকগুলি কৌতুককর চিত্র আঁকিয়াছেন। রোমান্সের ভিত্তি হইল প্রেম আর প্রেমের ভিত্তি হইল নারীপুরুষের যৌনাকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষা মূলতঃ দৈহিক এবং যেহেতু ইহাই প্রজাসৃষ্টির মূল তাই ইহা বুভুক্ষার মতই দুর্বার এবং অনির্বাণ। আমাদের শাস্ত্রকারেরা ইহাকে রিপু বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন, কারণ ইহা বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে, বয়স মানে না, নীতি মানে না এবং অন্য কোন সম্পর্ক স্বীকার করে না। যে কোন সময়, যে কোন অবস্থায় এই দেহজ প্রবৃত্তি মনকে আচ্ছন্ন করিতে পারে। সুতরাং ইহাকে মানসিক বিকারও বলা যাইতে পারে। দেবযানীকে লুকাইয়া শর্মিষ্ঠাকে বিবাহ করায় দেবযানীর প্ররোচনায় শুক্রাচার্য যে অভিশাপ দিয়াছিলেন তাহার ফলে যযাতি জরাগ্রস্ত হইয়া নারীসম্ভোগে অক্ষম হইয়াছিলেন। পুত্র পুরু এই জরা গ্রহণ করায় বিনিময়ে যযাতি পুত্রের যৌবন পাইলেন। পরশুরামের গল্পের কাহিনী এই বিনিময়ের পঁচিশ বৎসর পর আরম্ভ হইয়াছে। এই পঁচিশ বৎসর যযাতি পূর্ণ উদ্যমে ধার করা যৌবন ভোগ করিয়াছেন; বৎসরে দুইটি করিয়া বিবাহ করিয়া পঞ্চাশটি রাণী সংগ্রহ করিয়াছেন। ইঁহাদের অনেকেই যুবতী এবং যৌবনোচিত সুখভোগের জন্য লালায়িতা। যযাতি নিজে পঁয়তাল্লিশ বৎসরের প্রৌঢ় হইলেও যুবকের ন্যায় শক্তিমান; কিন্তু নিজের ও পুত্রের যৌবন পর পর ভোগ করিয়া তাঁহার ভোগসুখে অতৃপ্তি আসিয়া গিয়াছে। তিনি এখন পুত্র পুরুর সঙ্গে আর একদফা বিনিময় করিতে চাহেন। এবার তিনি পুরুর জরা গ্রহণ করিয়া সংসারত্যাগী হইবার সংকল্প করিয়াছেন। কিন্তু পুরু দীর্ঘকাল তপশ্চর্যা করিয়া এখন মোক্ষলাভের জন্য উন্মুখ; তিনি পিতার

'যৌবনতুল্য দুর্মদ প্রৌঢ়ত্ব' গ্রহণ করিতে চান না। ইহাই গল্পের প্লটের সমস্যা।

এই সমস্যা সমাধানের পথে বহু বিঘ্ন দেখা দিল এবং সেই সুযোগে পরশুরাম অনেকগুলি উপভোগ্য কৌতুকাবহ খণ্ডচিত্র আঁকিয়াছেন। প্রথমেই রাজার নূতন পঞ্চাশ রাণী আসিয়া প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিলেন। ইঁহাদের মধ্যে বিগত-যৌবনা, পৃথুলাঙ্গী বয়স্কাদের প্রশমিত করা সহজ; হয়ত তাঁহারা এমনিই রাজার সঙ্গ হইতে বঞ্চিত আছেন। কিন্তু যাঁহারা বয়ঃকনিষ্ঠা, তাঁহাদের সম্ভোগাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবে কে? অনামিকা জ্যেষ্ঠা মহিষী এবং প্রতিবাদে মুখর কনিষ্ঠা করুণাক্ষীর চিত্র দুইটি খুব অল্প কথায় ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং একই দৌত্যকার্যের শরিক হইলেও ইঁহাদের পার্থক্য খুব কৌশলের সহিত আভাসিত হইয়াছে। পুরুর পরামর্শানুসারে রাজা যযাতি বার্ধক্যের সঙ্গে যৌবন বিনিময়ের জন্য রাজ্যের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের কাছে আবেদন প্রচার করিয়া দিলেন। বৃদ্ধ প্রার্থীদের পিছু পিছু তাঁহাদের বৃদ্ধা পত্নীরা এক গণ-ডেপুটেশনে আসিয়া রাজাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন যে, স্বামীদের মধ্যে যাঁহাকেই তিনি মনোনীত করুন তিনি তো যৌবন লাভ করিয়া যুবতী ভার্যা গ্রহণ করিবেন; তখন পরিত্যক্তা বৃদ্ধা ভার্যার বা ভার্যাদের কি উপায় হইবে?

ইহার পর রাজা শুধু বিপত্নীক বা অবিবাহিত পাত্রদিগের মধ্য হইতেই একজন বৃদ্ধকে মনোনয়ন করা স্থির করিলেন। দেখা গেল, রাজার বার্ধক্য সম্পর্কে ধারণাও খুব সীমিত। তিনি এক পঙ্গু ও প্রায় অন্ধ এক বক্রপৃষ্ঠ বৃদ্ধের প্রার্থনা না-মঞ্জুর করিলেন, কারণ জরা চাহিলেও তিনি সুস্থ সবল জরা চাহেন। তিনি জানেন না যে জরা গ্রহণ করিলেই তাঁহাকে বিকলাঙ্গতার জন্যও প্রস্তুত হইতে হইবে।

ইহার পর ষষ্টিপর দুই বৃদ্ধ এক অসামান্যা রূপসীর হাত ধরিয়া সভামধ্যে উপস্থিত হইলেন। ইঁহারা বসুমিত্র রাজার কুলগুরু ভল্লাতকের পুত্র হরীতক ও বিভীতক; আর ইঁহাদের সঙ্গিনী রাজকন্যা মনোহরা। উভয়েই জরাগ্রস্ত, উভয়েই মনোহরার পাণিপ্রার্থী, শুধু যৌবনের অভাব। ইঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করা যায় না, আবার ইঁহারা এমন তুল্যমূল্য যে মনোহরাও একজনকে বাছিয়া লইতে পারেন না। এই রূপযৌবনবতীকে দেখিয়া রাজার দুর্মদ যৌবন আবার জাগিয়া উঠিল; তিনি পূর্ব সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া নিজেই

মনোহরার পাণিপ্রার্থী হইলেন। তখন মহা গণ্ডগোল বাধিয়া গেল, কারণ রাজা যযাতি পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়া সংসারধর্ম গ্রহণ করিলে প্রতিশ্রুতিভঙ্গজনিত পাপে রৌরব নরকে পতিত হইবেন। সভাস্থ সবাই বলিলেন, চলবে না, চলবে না। সমস্যা সমাধানের জন্য আবার পুরুর ডাক পড়িল। মনোহরাকে দেখিয়া এবং তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়া পুরু তাঁহার পঁচিশ বৎসরের সঞ্চিত পুণ্যফল অনায়াসে বিসর্জন দিয়া নিজেই মনোহরার পাণিপ্রার্থী হইলেন এবং পিতার গ্রাস কাড়িয়া লইলেন। নারদের নির্দেশে পিতাপুত্রের পুণ্যফলে (!) সহজেই জরা ও যৌবন বিনিময়-কার্য সুসম্পন্ন হইয়া গেল। নারীর সংকোচ ও সংযমের অন্তরালে যে ভোগলিপ্সা থাকে ভোগবিলাসী যযাতি তাহার কোন সন্ধানই রাখেন নাই, আর মানুষের যৌন প্রবৃত্তি এত তীব্র যে তাহার অভ্যাগমে বৈরাগ্যের আকাঙ্ক্ষা বা অভ্যাস জলোচ্ছ্বাসের মুখে তৃণের মত ভাসিয়া যায়। বিভিন্ন বয়সের ও বিভিন্ন অবস্থার নরনারীর দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়া মানবচরিত্রের বৈচিত্র্য ও ঐক্য এইভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং এই নব পটভূমিকায় অনুপস্থিত দেবযানীর ক্রোধ ও শর্মিষ্ঠার ধর্মচর্চার নিষ্ফলতাও প্রতিভাত হইয়াছে।

জননীর স্নেহ, রমণীর প্রেম এবং যুবতীর রূপমুগ্ধতা 'উৎকণ্ঠাস্তম্ভ' গল্পের বিষয়বস্তু রচনা করিয়াছে এবং এইসব জটিল অনুভূতির পুরোভাগে রহিয়াছে এক 'জন্মসিদ্ধ' স্নেহপুষ্ট তস্কর ধাপ্পাবাজ যুবক প্রাণতোষ ভট্টাচার্য ওরফে পানু। পানু মাতৃহীন যুবক, কিন্তু সন্তানহীন পিসীমার নিকট জননীর স্নেহ পাইয়াছে। তাহার একমাত্র নিজস্ব সম্পদ 'চটকদার' চেহারা এবং খোশামোদ করার ক্ষমতা —ইহার দ্বারা সে বিপিন নন্দীর কন্যা লজ্জাবতীর (বা লেত্তির) হৃদয় জয় করিয়াছে। এখানে জনান্তিকে স্মরণ করা যাইতে পারে যে এইরূপ যথাযোগ্য ভাষা বা প্রণয় নিবেদনের পদ্ধতি জানিত না বলিয়াই 'দাঁড়কাগ' গল্পের কাঞ্চন মজুমদার বেয়াকুব বনিয়াছিল। আবার পানুর কাহিনীতে ফিরিয়া আসা যাক। যদিও বিপত্নীক পিতা বিপিন নন্দীর মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিবাহ দিতে রাজি ছিলেন না, তবু স্নেহময়ী পিসীমা এই বিবাহের ব্যবস্থা করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তঞ্চকতা পানুর চরিত্রের মজ্জাগত প্রবৃত্তি। সে লেত্তিকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল, কিন্তু বিবাহ করিয়া ঘর বাঁধিতে চাহে নাই। তাই সে পিসীমার আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া বাপের বাক্স ভাঙিয়া সাতশ টাকা লইয়া এবং লেত্তির কিছু

গহনা আত্মসাৎ করিয়া চম্পট দিল। তবে ইহার ফলে দুইজন রমণীর বিবাহ সমস্যা সমাধান হইল। সংবাদপত্রে পানুর উদ্দেশ্যে লিখিত লেত্তির পত্র পড়িয়া পানু অপেক্ষা অনেক উপযুক্ত পাত্র, লেত্তির স্বজাতীয় কৃষ্ণধন কুণ্ডু আত্মবিশ্বাসে অশঙ্কিনী এই পাত্রীকে সাদরে গ্রহণ করিল। কৃষ্ণধন বোম্বাই শহরে ইঞ্জিনিয়ার। এদিকে বহুদিনের কুমারীজীবনে অধীর হইয়া ডক্টর সত্যভামা ব্যানার্জি পানুর বিপত্নীক পিতার দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণী হইলেন। পানুর পিতা আরও সন্তান চাহিয়াছিলেন, সত্যভামা নিজের বয়স চল্লিশের কম লিখিয়াছিলেন। সব স্ত্রীলোকই নিজের বয়স একটু হাতে রাখিয়াই বলে, বিশেষতঃ বিবাহের উমেদারির সময়। যাহা হউক সত্যভামার অভ্যাগমে পানুর পিসীমা মনের দুঃখে কাশী চলিয়া গেলেন। সত্যভামা পানুর বাবার পুত্রাকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু পানুকে দেখিবার পূর্বেই পানুর জন্য তাঁহার হৃদয়ে মাতৃস্নেহ ক্ষরিত হইল।

কলিকাতায় পিতৃগৃহ হইতে পলায়ন করিয়া পানু বোম্বাই নগরীতে আস্তানা বাঁধিল। সে তাহার বোম্বাই অভিযানের রোমাঞ্চকর বর্ণনা দিয়া পিতার কাছে চিঠি লিখিল এবং সশরীরে উপস্থিত হইল। ঘটনাচক্রে কৃষ্ণধন কুণ্ডুও এই সময় ছুটি লইয়া স্ত্রীসহ কলিকাতায় হাজির ছিল। লেত্তি ওরফে লজ্জাবতী কুণ্ডু পানুর সব ধাপ্পাবাজি ফাঁস করিয়া দিল এবং দেখা গেল পানু বোম্বাই নগরীতে একটি ইরাণী দোকানে বয়ের কাজ করিত; কিন্তু টাকা চুরি করার অপরাধে সেই চাকুরিও হারাইয়াছে। এই নোংরা ইতিহাস শুনিয়া পিতা মনোতোষ ক্ষেপিয়া গেলেন কিন্তু বিমাতা সত্যভামা তাহার আশ্রয় হইলেন। তিনি বর্মায় পানুর জন্য একটি ভাল চাকুরি যোগাড় করিয়া দিলেন এবং নিজে টাকা দিয়া তাহাকে সেখানে পাঠাইলেন। কিন্তু এখানেও পরের টাকা চুরি করার লোভ সে সংবরণ করিতে পারিল না। সাতদিন চাকুরি করিয়া মনিবের টাকা আত্মসাৎ করিয়া সিঙ্গাপুরে পলাইয়া গেল। বোম্বাইয়ের মত সিঙ্গাপুরেও সে একটি (চীনা) হোটেলে বয়ের কাজ যোগাড় করিয়া লইল। তবে এখানে মালিক মিস্ ফুক্-সান নামে এক মহিলা তাহার চটকদার চেহারা ও কান্তসম্মিত বাক্যে আকৃষ্ট হইয়াছে এবং পানুর ভরসা আছে যে কালক্রমে সে ইহার 'পোষ্যপতি' হইতে পারিবে।

এই গল্পের নারীচতুষ্টয়—পানুর পিসীমা, বিমাতা সত্যভামা, প্রথমা প্রণয়িনী লেত্তি এবং শুধু পরোক্ষে বর্ণিতা মিস্ ফুক্-সান খুব জীবন্ত হইয়াছে।

পুরুষ যেমন রমণীর রূপে ও হাস্যলাস্য ছলাকলায় মুগ্ধ হয়, পুরুষের চটকদার চেহারা ও বাক্যালংকারও সেইরূপ মোহ বিস্তার করিতে পারে। যেমন পিতা যযাতি ও পুত্র পুরু সমভাবে মনোহরার কাছে তাঁহাদের সংকল্প বিসর্জন দিতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন, স্ত্রীলোকের পক্ষেও যৌনলিপ্সা তেমনি দেশকাল-অনালিঙ্গিত ; যে মোহে লেত্তি ও ফুক্-সান পুত্র প্রাণতোষের প্রতি প্রলুব্ধ হইয়াছিল তাহারই অনুরূপ মোহ সত্যভামাকে অজ্ঞাতপরিচয় পিতা মনোতোষের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছে। এই দু'্যার আকর্ষণকে পরিশীলিত করে বাৎসল্য রস এবং তাহাও পাত্রাপাত্র বিচার করে না অথবা পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না। যে পিসীমা পানুকে মানুষ করিয়াছেন আর যে বিমাতা তাহাকে দেখেন নাই উভয়েই তাহার প্রতি সমভাবে অনুকূল। গ্রন্থকার এই বলিয়া গল্প শেষ করিয়াছেন, 'পানুর আশা আছে, ভাল করে খোশামোদ করতে পারলে মিস্ ফুক্-সান তাকে পোষ্যপতির পদে প্রোমোশন দেবেন।' আমাদের ভরসা আছে মিস ফুক্-সান তাহাকে পরিত্যাগ করিলেও বিমাতা সত্যভামা তাহাকে গ্রহণ করিবেন এবং তাহার টানেই পিসীমা হয়ত কাশী হইতে ফিরিয়া আসিবেন।

(৬)

মনুষ্যজীবনের প্রধান লক্ষণ ব্যাপ্তি, তীব্রতা ও অনুভূতির সূক্ষ্মতা—এক কথায় জটিলতা। শরৎচন্দ্র বৈজ্ঞানিকদের কথা উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে আফ্রিকার জঙ্গলে দেখা গিয়াছে সিংহদম্পতি পথে যাইতে যাইতে অপর এক সিংহের সম্মুখীন হইল ; অমনি দুই সিংহে লড়াই লাগিয়া গেল এবং প্রথম সিংহ দ্বিতীয়ের আঘাতে নিহত হইল। সিংহী বিনা দ্বিধায় তক্ষুনি এই বিজেতার সঙ্গিনী হইয়া অন্য পথে চলিল। মনুষ্যজীবনে এই জাতীয় মিলন এত সহজে হওয়ার নয়। শের আফগান, নূরজাহান এবং জাহাঙ্গীরের সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনীর মধ্যে অনেকখানিই কল্পিত এই কথা আধুনিক ঐতিহাসিকেরা বলিয়া থাকেন। তাহা হইলেও তাহা মনুষ্যজীবনের সম্ভাব্যতাকেই অনুকরণ করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে সেলিম ও মেহেরের পূর্বরাগ, সম্রাট আকবরের হস্তক্ষেপে মেহেরের নির্বাসন, শের আফগানের হত্যা, সম্রাট জাহাঙ্গীরের দীর্ঘ

প্রতীক্ষার প্রয়োজন হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় দেবযানী কচকে বলিয়াছিল, 'রমণীর মন সহস্র বৎসরেরই, সখা, সাধনার ধন।'

স্বল্পায়ু কলিযুগের মানুষ আমরা সহস্র বৎসর অপেক্ষা করিতে পারি না। কিন্তু আমাদের মধ্যেও বিশেষ মানসিক যোগ্যতা থাকিলেই রমণীর মন পাওয়া সম্ভব হয়। বাহিরের দৃষ্টিতেও আমরা স্বাস্থ্য, প্রচলিত অর্থে চরিত্র, রূপ, মান, সর্বোপরি আর্থিক সঙ্গতি বিচার করিয়া থাকি, কিন্তু প্রীতিস্নিগ্ধ দাম্পত্য জীবনের জন্য আরও কিছু প্রয়োজন। তাহার অভাব দাম্পত্য জীবনকে বিষময় করিয়া তুলিতে পারে। রোমান্সের এই হাস্যকর, নোংরা দিকটা পরশুরাম তুলিয়া ধরিয়াছেন 'দাঁড়কাগ' ও 'চমৎকুমারী' গল্পে। এখানকার নায়করা 'উৎকণ্ঠাস্তম্ভ' গল্পের পানুর মত অশিক্ষিত, জোচ্চোর নহেন; ইঁহারা উচ্চ-শিক্ষিত, উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত এবং অর্থবান। কিন্তু নারীর মনে প্রবেশ করিবার যে শক্তি পানুর আছে তাহা ব্যারিস্টার কাঞ্চন মজুমদার বা ম্যাজিস্ট্রেট বক্রেশ্বর দাসের নাই। প্রথমে কাঞ্চনের কথাই ধরা যাক। সে সম্পন্ন ব্যারিস্টার; গাড়ি বাড়ি প্রতিপত্তি সবই তাহার আছে, কিন্তু বয়স পার হইয়া গেলেও সে গৃহিণী সংগ্রহ করিতে পারে নাই। সুন্দরী শম্পা সেন এবং কুশ্রী তমিস্রা নাগ উভয়েই তাহাকে সমভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ প্রণয়ের দুইটি অপরিহার্য উপাদান—আত্মসম্মানবোধ এবং বিনয়। কাঞ্চন এত দাম্ভিক যে সে মনে করে যেখানকার যত পাত্রী আছে তাহাকে পাইবার জন্য লালায়িত হইয়া আছে। শুধু তাহার একটু বাজাইয়া নেওয়া দরকার। দাম্ভিকতা এক প্রকারের মোহ এবং মোহ হইতে বুদ্ধিভ্রংশ উপজাত হয়। সে শম্পা সেন—মৃগয়ার উদ্দেশ্যে বিহারের সুদূর পল্লীতে আসিয়া হাজির হইল এবং কুরূপা তমিস্রা নাগের অতিথি হইয়া প্রথমেই ডায়েরীতে গৃহস্বামিনী তমিস্রার জন্য অনুকম্পা প্রকাশ করিল, কারণ সে ধরিয়া লইয়াছে প্রথম দর্শনেই তমিস্রা তাহার প্রেমের কাঙাল এবং অবিলম্বে তমিস্রাকে সতর্ক করিয়া দেওয়া দরকার। পরদিন সকালে অত্যন্ত বেয়াকুবের মত তমিস্রাকে শম্পা সেন সম্পর্কে প্রশ্ন করিতে যাইয়া সে নিজের দুর্বলতাই প্রকাশ করিয়া ফেলিল। সে পূর্বরাত্রিতে ডায়েরীতে লিখিয়াছিল, তমিস্রার মত কুরূপার তাহাকে পাইবার কোন চান্স নাই, কিন্তু পরদিন সকালে তাহার এই সম্ভাষণ শুধু ইহাই প্রমাণ করিল যে, তমিস্রার ত বুদ্ধিমতী আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্না মেয়ের কাছে তাহার আর কোন চান্স

রহিল না। শম্পা সেনের সঙ্গে তাহার যে কোর্টশিপের পর্ব আরম্ভ হইল তাহাও জুলিয়াস সিজারের সেই অভিযানের সঙ্গে তুলনীয় যাহা শেষ করিয়া সিজার বলিয়াছিলেন, আমি আসিলাম, দেখিলাম, জয় করিলাম (veni vidi vici)। শম্পা সেন তাহার সম্পর্কে কি মনে করে, তাহার মন অন্য কোথাও বাঁধা আছে কিনা ইহা কাঞ্চন বুঝিতে চেষ্টা করে নাই , লক্ষ্য করিয়া দেখে নাই যে, গ্যেটে ও রবীন্দ্রনাথের যে তুলনামূলক সমালোচনার সূত্র ধরিয়া সে আলাপ আরম্ভ করিয়াছিল মৃদু রূঢ়তার সহিত এই মহিলা তাহা পুনরুত্থাপিত হইতেই দেয় নাই এবং সে শম্পার প্রতি আগ্রহ দেখাইলেও শম্পা কোনরূপ সাড়া দেয় নাই। ইহা সত্ত্বেও হঠাৎ এক দামী শাড়ি উপহার দিয়া সে বিবাহের প্রস্তাব করিয়া বসিল। শম্পার কাছে প্রত্যাখ্যাত হইয়া সেই শাড়িই হাতে করিয়া সে 'দাঁড়কাগ' তমিস্রার দ্বারস্থ হইয়া উপযুক্ত প্রত্যুত্তর পাইল। তমিস্রা তাহাকে যে বিদায়-অভিবাদন জানাইল তাহাই রোমান্সের অনুপযুক্ত এই পাণিপ্রার্থী পাত্রের সম্পর্কে যথার্থ মন্তব্য : '……প্রেমে পড়ে বিয়ে করা আপনার কাজ নয়,……। ঘটক লাগিয়ে পাত্রী স্থির করুন।……একটু বোকাসোকা মেয়ে হলেই ভাল হয়, অন্তত আপনার চাইতে একটু বেশী বোকা, তবেই আপনাকে বরদাস্ত করা তার পক্ষে সহজ হবে।'

বাহিরের দিক হইতে কাঞ্চন মজুমদারের সঙ্গে 'চমৎকুমারী' গল্পের বক্রেশ্বরের কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে। উভয়েই সম্পন্ন ও পদস্থ, উভয়েই বিগতযৌবন ; প্রধান পার্থক্য এই যে, বক্রেশ্বর বেশী বয়সে তাঁহার অপেক্ষা অনেক ছোট পরমা সুন্দরী মনোলোভাকে সদ্য বিবাহ করিয়াছেন আর গল্পের আরম্ভে ও উপসংহারে কাঞ্চন মজুমদার অনূঢ়। বক্রেশ্বর প্রৌঢ়ত্বে পা দিলেও খুব শক্তিধর পুরুষ, কিন্তু তিনি দেখিতে কুৎসিত এবং এই দ্বিবিধ ন্যূনতা সম্পর্কে তিনি সচেতন। দরিদ্রের কন্যা মনোলোভা অল্পশিক্ষিতা হইলেও স্বামীর এই দুর্বলতার কথা জানে, কাজেই পরপুরুষের নৈকট্য পরিহার করিয়া চলে। পরশুরাম স্যাটিরিস্ট (satirist), বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গ তাঁহার সাহিত্যের প্রাণ এবং তাঁহার দৃষ্টি খুব উদার ও প্রসারিত। তিনি কাহাকেও বাদ দেন নাই—বিশ্বের স্রষ্টা ব্রহ্মা, রক্ষক বিষ্ণু, নটরাজ শিব, দেবরাজ ইন্দ্র, ব্রহ্মর্ষি দুর্বাসা, মুনি বিশ্বামিত্র, পৌরাণিক রাজা যযাতি, অবন্তীপতি বিক্রমাদিত্য সকলকে লইয়াই ব্যঙ্গ করিয়াছেন। যাঁহার নাম করিলেই পাপক্ষয় হয় সেই সর্বগুণান্বিত, 'লোকোত্তরচরিত' রামচন্দ্রও

একেবারে বাদ যান নাই। বিষ্ণুর অবতার রামচন্দ্রের জীবনে দুইটি কার্য খুব বিতর্কিত—বালিবধ ও সীতার বনবাস। প্রথমটি সম্পর্কে পরশুরাম কিছু বলেন নাই, কিন্তু দ্বিতীয়টি তাঁহার ব্যঙ্গের বিষয়ীভূত হইয়াছে। সীতার বনবাস লইয়া প্রাচীন কালেও প্রশ্ন উঠিয়া থাকিবে বলিয়া মনে হয়। বাল্মীকি—যদি তিনি উত্তরকাণ্ড লিখিয়া থাকেন—এই প্রশ্নের একপ্রকার জবাব দিয়াছেন ; তাঁহার মতে নিষ্কলঙ্ক ঈক্ষ্বাকু বংশের গৌরব রক্ষার জন্যই রাম এইরূপ আচরণ করিয়াছিলেন। বহুকাল পরে ভবভূতি উত্তরচরিত নাটকে অন্য ব্যাখ্যা দিয়াছেন ; তাঁহার চিত্রে জনমতের সুদূরপ্রসারী শক্তির কাছে রাবণবিজয়ী রামচন্দ্রকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও হার মানিতে হইয়াছিল। আমাদের আমলে নটশ্রেষ্ঠ শিশিরকুমার ভাদুড়ীও অনেকটা এইভাবেই রামচরিত্র রূপায়িত করিয়াছেন। কিন্তু অগ্নিপরীক্ষার সময় কোন দুর্মুখি উপস্থিত ছিল না এবং প্রজারা কোথায় কে কি জনরব তুলিল তাহা সীতাগতপ্রাণ স্বামীর গ্রাহ্য করা উচিত হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। কাজেই এমন মনে করা যাইতে পারে যে 'লোকোত্তরচরিত' শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রও সর্বদোষশূন্য ছিল না। তিনি নিজেই খুঁতখুঁতে স্বভাবের লোক ছিলেন এবং স্ত্রীর পরপুরুষস্পর্শের সম্ভাবনায় কাতর ছিলেন। ইহাই অগ্নিপরীক্ষা ও সীতার বনবাস প্রভৃতি ব্যবস্থার কারণ। বক্রেশ্বরের চিকিৎসার যে ব্যবস্থা গগন চক্কর করিলেন তাহার প্রথম ধাপ হইল নির্ভুল রোগনির্ণয়। তিনি চলৎশক্তিরহিত মনোলোভাকে প্রশ্ন করিলেন, 'অমন রামচন্দ্রীস্বামী জোটালেন কোথা থেকে ?' এই একটি তুলনার মাধ্যমে সর্বগুণান্বিত রামচন্দ্র ও বক্রেশ্বর এক পর্যায়ে আনীত হইলেন।

গগন চক্কর যেভাবে মনোলোভাকে বহন করিয়া বক্রেশ্বরের বাড়িতে আনিয়া দিলেন সেই বর্ণনা সুন্দর ও স্বাভাবিক হইয়াছে। কিন্তু পরবর্তী অংশে অর্থাৎ বক্রেশ্বর ও গগনচাঁদের দ্বন্দ্বযুদ্ধ, বক্রেশ্বরের পতন, চমৎকুমারীর আগমন ও উদ্ধারে খানিকটা কৃত্রিম উপায়ে চমৎকার উৎপাদনের চেষ্টা আছে। সে যাহা হউক, আশা করা যায়, বক্রেশ্বর শুধু যে সুস্থ হইলেন তাহা নহে ; তাঁহার মানসিক রোগেরও উপশম হইল। চমৎকুমারীর অবিস্মরণীয় উপকারের জন্য বক্রেশ্বরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশে মনোলোভা মনে মনে যথাযোগ্য মন্তব্য করিলেন, 'তা ভুলবে কেন, ঐ গোদা হাতের জাপটানি যে প্রাণে সুড়সুড়ি দিয়েছে।'

(৭)

ইংরেজী শার্প (sharp) শব্দের অর্থ ধারালো ; লাক্ষণিক প্রয়োগের দ্বারা ইহা ধারালো অস্ত্র হইতে ধারালো বুদ্ধিও বুঝাইতে পারে এবং যেহেতু অতি ধারালো বুদ্ধি অসৎ পথে নিয়োজিত হইয়া থাকে সেইজন্য এই শব্দটির চতুর্দিকে শঠতা ও ঠগবাজির পরিমণ্ডল গড়িয়া উঠিয়াছে এবং sharper শব্দের সোজাসুজি অর্থই জুয়াচোর। এই সব কথা স্মরণ করিয়া ইংরেজ ঔপন্যাসিক ভ্যানিটি ফেয়ার নাটকে এক অবিস্মরণীয় চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন যাহার নাম বেকী শার্প। ইহার সততা ও সতীত্ব কোনটাই সন্দেহাতীত নয় ; কারসাজির দ্বারা অর্থ ও সামাজিক প্রতিপত্তি লাভই তাহার একমাত্র লক্ষ্য। তাহার বহু অভিযানের মধ্যে একটি উল্লেখ করিলেই চলিবে। সে একই সঙ্গে—অন্যান্য নাগরের কথা ছাড়িয়া দিলেও—পিতা ও পুত্রের সঙ্গে প্রণয়ের অভিনয় করিয়াছে এবং স্ত্রীর মৃত্যুর পর পিতা তাহার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে ইতিমধ্যে সে গোপনে পুত্রের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া আছে !

ভ্যানিটি ফেয়ার সুদীর্ঘ উপন্যাস ; সেইজন্যই ঔপন্যাসিক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এই ধর্মজ্ঞানহীনা, উচ্চাভিলাষিণী, বিলাসিনী বেকী শার্পের চরিত্র আঁকিতে পারিয়াছেন। ছোট গল্পের সীমিত গণ্ডিতে পরশুরাম কয়েকটি বেকী শার্পের নিখুঁত চিত্র আঁকিয়াছেন এবং তাহাদের চারিদিকে মেকি রোমান্সের পরিবেশ রচিত হওয়ায় ব্যঙ্গবিদ্রূপ পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

'আনন্দীবাঈ' গল্পের রাজহংসী ঝলকানী সিন্ধের লোক অতএব উদ্বাস্তু। নিজের দাদা সিঙ্গাপুরে ব্যবসায় করে, কিন্তু বোনের খোঁজ নেয় না। রূপ, যৌবন ও অন্যান্য আকর্ষণ থাকিলেও রাজহংসীকে অনেকটা নিজেই নিজের ব্যবস্থা করিতে হইবে। পরিতোষ হোড় চৌধুরীর পদবী হইতে মনে হয় তিনিও পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু। তিনি কলিকাতায় সাহেবী স্টাইলে থাকেন, নিজে সুপ্রতিষ্ঠিত, কিন্তু বোন মিস্ বলাকা নানাগুণান্বিতা হইলেও এখনও নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারেন নাই। রাজহংসীর ভগিনীপতিএবং বলাকার দাদা উভয়েই বহু কারবারের অধিপতি, বহু লক্ষ টাকার মালিক ত্রিক্রমদাস কোড়রীর অধীনস্থ ম্যানেজার—একজন বোম্বাইয়ে, অপরজন কলিকাতায়। ইঁহারা জানেন যে তাঁহাদের মনিব বিপত্নীক ; বয়স পঞ্চাশের উপর হইলেও অর্থের দিক দিয়া অতিশয় সুপাত্র আর

এই দুই যবতীর সাজগোজ চালচলন শিক্ষাদীক্ষা সবই সিনেমা-অভিনেত্রীর যোগ্য। যদি ত্রিক্রমদাসের মত এত বড় ধনীকে কাবু করা যায় তাহা হইলে বাড়ি বসিয়াই, কোন ঝুঁকি না লইয়াই সিনেমা-অভিনেত্রীর অধিক ঐশ্বর্য ও বিলাসের আস্বাদ পাওয়া যাইবে আর ত্রিক্রমদাস যখন দিল্লীতেই পাকাপাকি-ভাবে বসবাস করেন, তখন ইঁহারা বোম্বাই ও কলিকাতায় বসিয়া সিনেমা-অভিনেত্রীর অবাধ স্বাধীনতাও ভোগ করিবেন। পিতার বয়সী ত্রিক্রমদাসের বিবাহ প্রস্তাবে ইহাদের সাগ্রহ সম্মতি বুড়ো ব্যারনেট স্যার পিট-ক্রলীর সঙ্গে বেকী শার্পের গোপন ছিনালীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ইঁহারা কেহই ত্রিক্রমদাসের জীবিতা স্ত্রী আনন্দীবাঈয়ের সংবাদ রাখিতেন না এবং একে অপরের খোঁজও পাইলেন না। সেই বিষয়ে ইঁহাদের কোন কৌতূহল হওয়ার কথাও নয়; কারণ যখন ইঁহাদের কাছে ত্রিক্রমদাস তাঁহার তিন বিবাহের কথা পাড়িলেন তখন রাজহংসী ও বলাকা উভয়েই এক-একটি যুবক নাগর লইয়া মশগুল ছিলেন। এই সংবাদ দিতে ত্রিক্রমদাসের বুক কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু পত্নীদ্বয় কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না; রাজহংসী বোম্বাইয়ের বাড়িটা নিজের নামে রেজিষ্ট্রি করিতে ব্যগ্র হইলেন আর বলাকা নূতন গাড়ির জন্য বিশ হাজার টাকার চেক আদায় করিয়া লইলেন। পরে (উকিল খঞ্জনচাঁদের মধ্যবর্তিতায়) আরও কিছু অর্থাগমের ব্যবস্থা করিয়া ত্রিক্রমদাসের স্বল্পায়ু মধুচন্দ্রিমার অবসান ঘটাইয়া ইঁহারা মুক্ত বিহঙ্গিনীর মত সঞ্চরণের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

রাজহংসী-বলাকার মেকি রোমান্টিক জেলুসের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে আটপৌরে আনন্দীবাঈয়ের চাকচিক্যহীন নিষ্ঠার। আনন্দীবাঈ সকল দিক দিয়া ইঁহাদের বিপরীত; তাঁহার বাইরের চটকদার স্টাইল নাই, কিন্তু তিনি বহু সম্পত্তির অধিকারিণী অর্থাৎ তাঁহার ঐশ্বর্যের ভিত পাকা। তিনি দেখিতে সুন্দরী নহেন, তিনি ইংরেজি জানেন না, নৃত্যগীতপটিয়সী নহেন, আধুনিক চালচলনে অভ্যস্ত নহেন। কিন্তু তাঁহার স্বামিভক্তি অচলা; সেইজন্যই স্বামীর অন্য বিবাহের কথা শোনামাত্র তিনি ক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। রাজহংসী-বলাকা অনুরূপ সংবাদে বিন্দুমাত্র চকিত হয়েন নাই, কারণ স্বামীর অর্থ ছাড়া তাঁহাদের জীবনে স্বামীর কোন স্থান নাই। বাড়িগাড়ি ঠিক থাকিলে ঝুমকমল লোটনকুমার প্রভৃতির অভাব হইবে না এবং এইভাবে তাঁহারা 'জীবনটা পরিপূর্ণ' করিতে পারিবেন। যখন ত্রিক্রমদাস তাঁহাদিগকে একেবারেই রেহাই দিলেন,

তখন তাঁহারা আরও টাকা পাইলেন এবং পরিপূর্ণতার দিকে আরও অগ্রসর হইতে পারিবেন। আনন্দীবাঈয়ের ক্ষিপ্ত ব্যবহারের কিন্তু একটা সুফল হইল। ত্রিক্রমদাস পতিগতপ্রাণা সতী স্ত্রী এবং পুষ্পে পুষ্পে বিহারিণী ভ্রমরীদের মধ্যে পার্থক্য বুঝিতে পারিলেন এবং 'ধুস্তুরী মায়া' গল্পের উদ্ধব নন্দীর মত সুস্থ দাম্পত্য জীবনে ফিরিয়া আসিলেন।

'জীবনটা পরিপূর্ণ' করিতে চাহিয়াছিলেন 'একগুঁয়ে বার্থা' গল্পের জলদ রায়ের স্ত্রী হেলেনা রায়। এই পরিপূর্ণতার আস্বাদ তিনি খুঁজিয়াছিলেন স্বামীর বন্ধু কুমার ইন্দ্রপ্রতাপ সিংহের সঙ্গে পলায়ন করিয়া। প্রণয়ীর পক্ষ হইয়া তিনি আর্থিক খেসারতও দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি স্বামীকেও চিনিতে পারেন নাই, স্বামীর বন্ধুকেও চিনিতে পারেন নাই এবং নিজেকেও চিনিতে পারেন নাই। স্বামী যে খেসারতের বিনিময়ে বিশ্বাসহন্ত্রী স্ত্রী ও বিশ্বাসঘাতক বন্ধুকে ক্ষমা করিবেন না, ইহা প্রণয়ী ও প্রণয়িনী আন্দাজ করিতে পারেন নাই। ইন্দ্রপ্রতাপ যে বন্ধুস্ত্রীকে প্রলুব্ধ করিয়াই ক্ষান্ত হইবেন না প্রয়োজন হইলে বন্ধুর জীবননাশের ব্যবস্থাও করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না, ইহা হেলেনা অনুমান করিতে পারেন নাই এবং সেই চরম বিশ্বাসঘাতকতা যে তাঁহার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটাইয়া—সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থে—তাঁর পরিপূর্ণতার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিবে ইহার জন্যও এই অসতী নারী প্রস্তুত ছিলেন না। সর্বোপরি মৃত জলদ রায়ের মোটরগাড়ি যে তাহার মনিবের হত্যাকারীর উপর প্রতিশোধ নিবে ইহা মানুষের সাধারণ বুদ্ধির অতীত। এই গল্পটি একটি অভিনব ট্র্যাজি-কমেডি। ইহার আরম্ভ কৌতুকোজ্জ্বল কথোপকথনে, সমাপ্তিতে দেখিতে পাই বক্তার ভাবোদ্দীপ্ত বর্ণনা কেহ বিশ্বাস করেন নাই আর পতিব্রতা স্ত্রীর জায়গায় 'পতিব্রতা' বার্থা গাড়ির জিঘাংসাকে সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়াও মুশকিল। কিন্তু মধ্যবর্তী কাহিনীটি একটি রোমান্টিক ট্র্যাজেডি। মুখবন্ধ ও উপসংহার কমেডি।

গ্রন্থকার নিজেই বলিয়াছেন যে, জলদ রায়ের স্ত্রী হেলেনা রায় একজন সোসাইটি লেডি এবং সেই সমাজের প্রেরণায়ই পূর্ণতর জীবনের আস্বাদ পাইতে তিনি অভিযানে বাহির হইয়া স্বামীর মৃত্যু ও নিজের মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটাইলেন। এই শেষোক্ত বিপর্যয়ের কারণ সোসাইটি লেডিদের প্রধান গুণ বা দোষ তাঁহার মধ্যে নাই। তিনি হৃদয়হীনা নহেন। বেকী শার্পের জাতবোনেরা হৃদয় বলিয়া

কোন বস্তু স্বীকার করে না। এই গুণ রাজহংসী ও বলাকার আছে; সুতরাং ত্রিক্রমদাসের নিকট হইতে মোটা টাকা সংগ্রহ করিতে পারিলে ত্রিক্রমদাসের অন্য পত্নী থাকুক বা নাই থাকুক, ত্রিক্রমদাস পতির পদে অধিষ্ঠিত থাকুন আর নাই থাকুন তাঁহাদের কিছুই আসে যায় না; তাঁহারা হংসবলাকার মত সর্বত্র উড়িয়া বেড়াইতে পারিলেই খুশি। ইঁহাদের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে 'সরলাক্ষ হোম' গল্পের খঞ্জনা দাসের। খঞ্জনার সঙ্গে বেকী শার্পের সাদৃশ্য বেশি। সে ছোট চাকুরি করে, কৌশলে অপরের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতে উদ্যত এবং তাহার কোন সংকোচের বা ধর্মবোধের বালাই নাই। সে বেকীর মত দুঃসাহসিকাও বটে, কারণ সে জানে একবার কেহ সরকারি চাকুরিতে প্রবেশ করিতে পারিলে সেখান হইতে তাহাকে বদলি করা সহজ হইতে পারে, কিন্তু তাহাকে চাকুরি হইতে সরানো অত সহজ নয় আর সরাইলেই বা কি? যোগ্য পাত্র হাতে থাকিলে সে সংসারসমুদ্রে ভেলা ভাসাইতে পারিবে; তেমন অসুবিধা হইলে বরুণকে ছাড়িতেই বা আপত্তি কি? বরুণের জন্য তো তাহার কোন মায়া নাই। এই সহজ অথচ নির্মম সত্যটাই সে প্রমাণ করিয়া দিল। বরুণের চাকুরিতে বটুক সেন নিযুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে বটুকের গৃহিণী হইল; ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি সংঘটিত হইল যে চাকুরি দেওয়ার মালিক গদাধর ঘোষকেও জানানো সম্ভব হইল না। গদাধরের কন্যা বরুণের বাগ্‌দত্তা সরলা কিশোরী মাণ্ডবী উভয়পক্ষের এই হৃদয়হীনতায় স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ইহাদের সেন্টিমেণ্ট বলিয়া কোন বস্তু নাই এবং বেকী শার্পদের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ বিভেদ নাই, বটুক সেন ও খঞ্জনার বিবাহ শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি!

ধনীর কন্যা মাণ্ডবী ঘোষ বটবৃক্ষের ছায়ায় মানুষ হইয়াছে; থ্যাকারের উপন্যাস স্মরণ করিয়া বলা যায়, ভ্যানিটি ফেয়ারের এমেলিয়ার মত সে সরল সহজ বুদ্ধির মেয়ে। তাই পিতার ব্যবস্থাপনায় সে সরলাক্ষ হোমের পূর্ব ইতিহাস ও ফন্দিফিকির না বুঝিয়াই তাহাকে বিবাহ করিল। এইভাবে এই গল্পের সমস্যার সহজ সমাধান হইল। আমাদের দেশের—হয়ত অন্য দেশেরও—মন্ত্রীরা অনেক সময় পরাক্রমশালী ব্যবসায়ীদের হাতের পুতুল হয়েন এবং সরকার অনেক সময় নিজেদের লোকের জন্য বহু আজগুবি পদও সৃষ্টি করিয়া থাকেন। কিন্তু গদাধর ঘোষকে আনিয়া তাঁহার প্রভাবে যে ভাবে সমস্যার সমাধান করা হইল ইহা আর্টের দিক দিয়া সমর্থন করা যায় কিনা

সন্দেহ মনে হয় গল্পের পরিসমাপ্তি গল্পের নিজস্ব প্রয়োজনে আসে নাই; গ্রন্থকার ইহা চাপাইয়া দিয়াছেন। তবু এই গল্পেও আমরা বেকী শার্প-শ্রেণীর তিনটি চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই এবং কৌতুকের সহিত লক্ষ্য করি যে পুরুষ ও নারী উভয় শ্রেণীতেই ইহারা সমভাবে বর্তমান।

(৮)

পরশুরামের কয়েকটি গল্প আছে যাহাদের মধ্যে রোমান্স ও বাস্তবজীবনের বৈপরীত্যই কৌতুকের খোরাক যোগাইয়াছে। রোমান্স আমাদিগকে ভাবাতিরেকের আকাশে লইয়া যায় এবং সেখান হইতে বাস্তবজীবনের তুচ্ছতা ও রূঢ়তার খোঁচায় আকাশস্থ ভাবের বেলুন ফাটিয়া যায়। সংস্কৃত সাহিত্যে হাস্যরসের প্রাচুর্য নাই। অন্যে পরে কা কথা। কালিদাসের বিদূষকদের সঙ্গে শেক্সপীয়রের ক্লাউন বা ভাঁড়দের তুলনা করিলেই এই অপ্রতুলতা চোখে পড়ে। কিন্তু এই বিদূষকেরাও নায়ক রাজাদের ভাবোচ্ছ্বাসের বাহুল্যকে বাস্তব জগতে টানিয়া আনিয়া উহার উপহাসাস্পদতা প্রমাণ করিয়াছে। রাজাকে দেখিয়াই শকুন্তলা তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে, সেই আকর্ষণ রাজার কাছে গোপনও থাকে নাই, তবে নবোদ্ভিন্ন প্রণয়ের প্রকাশে কোন অশালীনতা বা প্রগল্ভতা ছিল না। এই সঙ্কোচ ও সম্ভ্রমবোধ যে কোন ভদ্র নারীতেই থাকে; শকুন্তলার ইহাতে কোন বৈশিষ্ট্য নাই। কিন্তু প্রণয়োন্মত্ত রাজা শকুন্তলার সলজ্জতা লইয়া একটু বাড়াবাড়ি করিতেছিলেন। এই বাড়াবাড়িতে ঈষৎ উত্ত্যক্ত হইয়া বিদূষক খুব উপযুক্ত মন্তব্য করিল, 'সে কি? তোমাকে দেখিয়া সে তোমার কোলে চড়িয়া বসে নাই?' অর্থাৎ রাজা কি সেইরূপ বেহায়াপনাই প্রত্যাশা করিয়াছিলেন? বিক্রমোর্বশীর বিদূষক রাজা পুরুরবার প্রেমাতিশয্যের উপর স্থূল রসিকতার অবলেপ দিয়াছে। রাজা যখন জিজ্ঞাসা করিলেন উর্বশীর প্রতি দুর্বার আসক্তিতে উত্তপ্ত চিত্ত কোথায় যাইয়া আনন্দ পাইতে পারে, বিদূষক অমনি জবাব দিল, 'কেন রান্নাঘরে চল!'

পরশুরাম এই বৈপরীত্যই দেখাইয়াছেন আধুনিক পরিবেশে। একটি ছোট্ট হালকা গল্পের উল্লেখ করিলেই তাঁহার শিল্পচাতুর্যের নমুনা দেওয়া যাইতে পারে। গল্পটির নাম 'উপেক্ষিতা'। পুরুরবা, দুষ্মন্ত প্রভৃতি যতই

প্রণয়োন্মত্ত হউন, তাঁহাদের তৎকালিক ও তৎস্থানিক উন্মাদনায় কোন কৃত্রিমতা ছিল না। কিন্তু আমাদের বণিক সভ্যতায় অনেক রোমান্সও সাজানো ব্যাপার। কন্যার পিতামাতাই উপযুক্ত পাত্রের জন্য ফাঁদ রচনা করেন, কন্যা তাঁহাদের কলের পুতুল মাত্র। এইরূপ একটি জাগ-দিয়া-পাকানো রোমান্সের অন্ততঃ সাময়িক ব্যর্থতার কৌতুককর চিত্র আঁকা হইয়াছে গরিমা গাঙ্গুলী ও চটক রায়ের বিদায়-সন্ধ্যার বর্ণনায়। গরিমার বাবা কলিকাতা হইতে ঢাকা বদলি হইয়াছেন, তাঁহাদের কলিকাতা-ত্যাগ আসন্ন। এই সম্ভাবনার পটভূমিকায় ভাবী দম্পতিকে বিশ্রম্ভালাপের সুযোগ দিয়া বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় গরিমার পিতা-মাতা অধীর আগ্রহে দোতলায় অপেক্ষা করিতেছেন। ফার্নিচার সব প্যাক হইয়া গিয়াছে। বাকী রহিয়াছে একখানা পুরানো ইজিচেয়ার ; সেই চেয়ারে চটক রায় উপবিষ্ট, আর তাহার সম্মুখে গরিমা একটির পর একটি গান গাহিতেছে, কিন্তু চটক মোহিত হইল না, সে শুধু উশখুশ করিতে লাগিল এবং শেষে একটু অসৌজন্য দেখাইয়াই বৃষ্টির মধ্যে বাহির হইয়া গেল। গরিমার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল, সমস্ত মহিমা ধূলিসাৎ হইল। কাঁদিবার জন্য 'উপেক্ষিতা' গরিমা চেয়ারে বসিয়াই লাফ দিয়া উঠিল। চেয়ারে অসংখ্য ছারপোকা! প্রেমনিবেদন যতই উচ্ছ্বসিত হউক, তাহা ছারপোকার কামড়কে আচ্ছন্ন করিতে পারে না।

এই পর্যায়ের দ্বিতীয় গল্পের পটভূমি দ্বাপর যুগের রাক্ষস-অধ্যুষিত বনজঙ্গল পরিবৃত পার্বত্য গুহা। রাক্ষসে-মানুষে চিরবৈরিতা। রাক্ষসের প্রিয় ভক্ষ্য—নরমাংস। রাবণকে যখন বর দেওয়া হইল যে নর ও বানর ছাড়া অন্য কেহ তাঁহাকে বধ করিতে পারিবে না, তখন রাবণ প্রসন্ন চিত্তে তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন, কারণ নর ও বানর তো তাঁহার ভক্ষ্য বস্তু। রামের হস্তে তাঁহার নিধনের কথা এইখানে অপ্রাসঙ্গিক। যেখানে খাদ্যখাদক সম্পর্ক সেইখানে রোমান্টিক আবেগ কল্পনা করা যায় না। শূর্পণখা এই অসম্ভব রোমান্সের কল্পনা করিয়াছিল বলিয়া স্বর্ণলঙ্কা ছারখার হইয়াছিল। দ্বাপরযুগে ভীম কিন্তু এই অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন। এক সময় এই অসীম বলশালী নরপুঙ্গব বক রাক্ষসকে বধ করিয়াছিলেন আবার অন্য সময়ে তিনি রাক্ষসী হিড়িম্বার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং এই বিবাহের সন্তান ঘটোৎকচ কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষে প্রচণ্ড বীরত্বের পরিচয় দিয়া আত্মাহুতি

দেয়। রাক্ষসে মানুষে খাদ্য-খাদক সম্পর্ক; আবার ইহাদের মধ্যেই যদি প্রণয় ও দাম্পত্য সম্পর্ক গড়িয়া উঠে তাহা হইলে এই পরস্পরবিরোধী ভাবের লুকোচুরিতে এক অভিনব কৌতুক সৃষ্টি হয়। ভাসের নাটক হইতে সূত্র গ্রহণ করিয়া পরশুরাম তাহারই বর্ণনা দিয়াছেন। পাণ্ডবরা—বিশেষ করিয়া ভীমার্জুন—নানা অভিযানে বাহির হইতেন। সেইজন্য কোথাও এক স্ত্রীকে রাখিয়া গেলে—আবার সেই স্ত্রী যদি সুদূর অরণ্যবাসিনী রাক্ষসী হয়—তাহার সঙ্গে অনেকদিন দেখা না হওয়া বিচিত্র নয়, বিশেষতঃ সেই মহাকাব্যের যুগে, যখন দিন বা বৎসর আমাদের মত সীমিত মানদণ্ডে গণনা করা হইত না। ভীম তো পুত্রের জন্ম দিয়া চলিয়া গিয়াছেন; পুত্রও অরণ্যচারী মনুষ্যভোজী রাক্ষস সমাজেই বাড়িয়া উঠিয়াছে এবং হিড়িম্বাও রাক্ষসাচার পুনরায় পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু মনুষ্যকুলশ্রেষ্ঠ কুরুবংশের বধূর মধ্যে মনুষ্যোচিত সংস্কৃতিও প্রতিফলিত হইতে বাধ্য। তাই হিড়িম্বা শাস্ত্রানুসারে কোন ব্রত পালন করিয়া উপবাসের পর উত্তম ভোজনের নিমিত্ত হৃষ্টপুষ্ট মানুষের মাংস খাইতে চাহিবে তাহাও স্বাভাবিক। কিন্তু সে সবিস্ময়ে দেখিতে পাইল যে, যে মানুষ তাহার ছেলে ধরিয়া আনিয়াছে, তিনি আর কেহ নহেন—তাহাদের পুত্রের পিতা ও তাহার স্বামী মধ্যম-পাণ্ডব ভীম। তাহার লজ্জা, বিস্ময়, পুলক সর্বোপরি অভিজাত মনুষ্যসমাজের অনুকরণে স্বামীকে 'আর্যপুত্র' বলিয়া উল্লেখে এই অপরূপ পরিস্থিতির কৌতুক বিধৃত হইয়াছে আর যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের রেখাচিত্র এই কমেডিকে সম্পূর্ণতা দান করিয়াছে।

(৯)

রোমান্সকে ভিত্তি করিয়া পরশুরাম যে সকল সার্থক রসাপ্লুত গল্প লিখিয়াছেন তন্মধ্যে সবচেয়ে জটিল হইল 'হনুমানের স্বপ্ন'। গল্পটির বিষয়ই ব্যঙ্গরচনার অনুকূল। বৈজ্ঞানিকরা বলেন বিবর্তনের ফলে পশু হইতে মানুষ সৃষ্টি হইয়াছে এবং বানর নরের নিকট আদিপুরুষ। আমরা সাধারণভাবে দেখি বানর অনেকটা নরের মত; কোন কোন ভাষাতাত্ত্বিক বলেন, নরের অনুকরণ করে বলিয়া 'বা (তুল্য) নর'। আবার সংস্কৃত আলংকারিকরা ইহাও বলিয়া থাকেন যে হাস্তরস অন্য রসের অনুকরণ। এই সংজ্ঞার যৌক্তিকতা

লইয়া আপত্তি হইতে পারে ; শেক্সপীয়রের সবচেয়ে বিদগ্ধ চরিত্র হ্যামলেট তো মনে করেন যে সমস্ত শিল্পকলার বিশেষ করিয়া অভিনয় শিল্পের উদ্দেশ্য হইল প্রকৃতির অনুকরণ, প্রকৃতির কাছে দর্পণ তুলিয়া ধরা। তবে অসম্পূর্ণ অথচ একেবারে অসার্থক নয় এমন অনুকরণ যে হাস্যকর সেই সম্পর্কে সন্দেহ নাই। এই জন্যই অন্য পশু অপেক্ষা বানরের খেলা বা বানরনৃত্য সবচেয়ে কৌতুককর। রামচন্দ্রের বানরবাহিনীর বর্ণনা হাস্যকর হইবে—এই যুক্তিতেই মধুসূদন মনে করিতেন যে তিনি মেঘনাদ বধ কাব্যকে ইলিয়াডের অনুরূপ মহাকাব্য করিতে পারেন নাই।

আমাদের দেশের প্রধান দুই মহাকাব্যে দুই মহাবাহু বীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়—হনুমান ও ভীম। ইঁহারা উভয়েই পবননন্দন নামে খ্যাত। ভীম গদা যুদ্ধে পারদর্শী, তবু হনুমানের মত তিনিও প্রধানতঃ অনন্যসাধারণ বাহুবলের উপরই নির্ভরশীল। ভীম কুলের বাহিরে বিবাহ করিয়া যে কৌতুককর পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা সংক্ষেপে 'পুনর্মিলন' গল্পে বর্ণিত হইয়াছে। হনুমান ভীম অপেক্ষাও অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ; তিনি লাফ দিয়া সমুদ্র পার হইয়াছেন, লঙ্কা দগ্ধ করিয়াছেন, গন্ধমাদন পর্বত বহন করিয়াছেন, সূর্যকে কুক্ষিগত করিয়াছেন। তিনি ভক্তিরসেরও পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন ; তাঁহার হৃদয়ে রামসীতা ছাড়া আর কেহ স্থান পায় নাই। এই সব কারণেই তিনি দেবতা বলিয়া পূজিত হইয়াছেন ; পার্থিব জগতে যে সাতজন চিরঞ্জীব আছেন তাঁহাদের মধ্যে জামদগ্নি বিষ্ণুর অবতার বলিয়া কথিত হইলেও সেই মাতৃহন্তাকে কেহ দেবতা বলিয়া স্বীকার করে নাই। কিন্তু হনুমান দেবতারূপে মন্দিরে মন্দিরে পূজিত হইয়া থাকেন ; আচারনিষ্ঠ গণ্ডেরীরাম বাটপাড়িয়া 'রামজী কিরিয়া'র পরই, 'হনুমানজী কিরিয়া' বলিয়া শপথ গ্রহণ করেন। 'হনুমানের স্বপ্ন' গল্পে পরশুরাম হনুমানের অলৌকিক শক্তি, রামসীতার প্রতি অনুরক্তি এবং চিরঞ্জীবত্বের ভিত্তির অভিনব বর্ণনা দিয়াছেন এবং ইহার সঙ্গে শৃঙ্গাররসের নানাপ্রকার সজীব দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়া অপরূপ কৌতুকের সৃষ্টি করিয়াছেন ; শৃঙ্গার গুণীভূত হইয়া হাস্যরসকে জটিলতা দান করিয়াছে। এই গল্পে চারটি প্রেমের কাহিনী আছে : এক দিকে আছেন হনুমান ও কিচ্চট রাজকুমারী চিলিম্পা এবং তদ্বিপরীত কিষ্কিন্ধ্যারাজ সুগ্রীব ও তাঁহার তারা-প্রমুখ অষ্টোত্তর সহস্র ভার্যা। অপরদিকে রহিয়াছেন তুম্বদেশের অধিপতি

চঞ্চরীক যিনি এক স্ত্রীর সঙ্গে সীমিত প্রেমে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া ভূমার সন্ধানী হইয়া বনবাসে কাল কাটাইতেছেন আর আছেন লোমশ মুনি যিনি ভূমা অর্থাৎ শতস্ত্রীর দ্বারা উদ্বেজিত হইয়া স্বগৃহ হইতে পলায়ন করিয়া নূতন করিয়া এক :স্ত্রী বিবাহ করিয়া শান্তিতে কালাতিপাত করিতে চাহেন। এই চার রকমের শৃঙ্গাররসের সংযোজন এই কাহিনীকে বর্ণবহুল করিয়াছে এবং হনুমানের অমরত্বের কারণ বর্ণিত হইলেও নরনারীর সম্পর্কের রহস্য অনাবিষ্কৃতই রহিয়া গিয়াছে।

যৌনমিলন ইতরপ্রাণীর মধ্যেও বর্তমান; ইহার প্রেরণা যুক্তিহীন, দেহাশ্রিত এবং দুর্বার। এইজন্য ইহাকে পাশবিক বলা হইয়া থাকে এবং যেখানে জুলুম করিয়া নারীকে এই কার্যে অংশীদার করা হয় তাহাকে 'পাশবিক অত্যাচার' আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। সুগ্রীবের দাম্পত্য জীবন একেবারে পাশবিক। রামায়ণে দেখিতে পাই শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীবের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিয়া সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্য উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন এবং এই বন্ধুর উপকারার্থে বালি বধ করিয়া যে অন্যায় করিয়াছিলেন তাহা 'সর্বগুণান্বিত লোকোত্তর-চরিত' শ্রীরামচন্দ্রের জীবনের একমাত্র কলঙ্ক। রামচন্দ্র বালিকে বধ করিলে সুগ্রীব শুধু রাজ্যই পাইলেন না বালির স্ত্রীকেও বিবাহ করিলেন। রামচন্দ্র যে সীতাকে উদ্ধার করিলেন সেই অভিযানে হনুমানের কৃতিত্ব অসাধারণ, কিন্তু সুগ্রীবের সাহায্য অকিঞ্চিৎকর; সুগ্রীবের অনুমতি ব্যতিরেকেই তিনি বানর-বাহিনী গঠন করিতে পারিতেন। স্ত্রীপুরুষের মিলনের যে বিচিত্র বর্ণনা পরশুরাম দিয়াছেন, তাহার সবচেয়ে নীচু স্তরে রহিয়াছে সুগ্রীবের শৃঙ্গার-রসোপভোগ। ইহা একেবারেই পাশবিক মিলন। সুগ্রীব অকৃতজ্ঞ, ভীরু, কপট এবং তাঁহার স্ত্রীসম্ভোগ নিছক উৎপীড়ন ও কামুকতা। যে হনুমান এক সময় তাঁহার বলভরসা ছিলেন, তাঁহাকে তিনি বিদায় করিতেই ব্যস্ত, নিতান্ত মুরুব্বিয়ানার সঙ্গে তিনি হনুমানকে বলিয়াছেন, 'রাঘব তো মন্দ লোক নহেন'! রামের সাহায্যে বালিকে বধ করিয়া বালির বিধবা পত্নীকে বিবাহ করা বলাৎকার ছাড়া আর কিছুই নহে। কিন্তু হনুমান যখন তাঁহার কাছে উপস্থিত হইয়াছেন তখন তারা বিগতযৌবনা; সুতরাং তাঁহাকে তিনি পরিত্যাগ করিতে ব্যস্ত। এই পাষণ্ডের নিজের কোন ধর্মবোধ নাই এবং অপরের ধর্মবোধ বুঝিবার ক্ষমতাও লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। হনুমান তাঁহার পরিত্যক্ত স্ত্রী তারাকে

নমস্যা বলিয়া পত্নীত্বে বরণ করিতে আপত্তি করিলে, সুগ্রীব উত্তর করিলেন, 'বটে! অযোধ্যায় থাকিয়া তোমার মতিগতি বিগড়াইয়াছে দেখিতেছি।' ইঁহার রাজকার্য সুরম্য উপবনে নল নীল গয় গবাক্ষ প্রভৃতি মিত্রগণের সহিত নারিকেল ভক্ষণ। কিচ্চট রাজ্যের রাজকুমারী ইঁহার দূতকে অপমান করিয়া ফেরত দিলেও সেই রাজ্যে অভিযান করার মত 'অবসর' অর্থাৎ সাহস ইঁহার নাই। এই অনবসরই কিষ্কিন্ধ্যারাজের শৌর্যের পরিচায়ক।

তারার প্রতি সুগ্রীবের মনোভাব পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। অষ্টোত্তর সহস্র স্ত্রী লইয়া তিনি সুখে কালাতিপাত করিতেছেন, কারণ তাঁহার এই পত্নীদের মুখ খুলিবার স্বাধীনতা নাই। তাহারা তাঁহাকে বাক্যবাণে প্রপীড়িত করিতে পারে না; তিনি জোর করিয়া তাহাদের মুখ বন্ধ করিয়া রাখেন, শুধু প্রেমালাপের জন্য খুলিয়া দেন। এই জাতীয় শৃঙ্গার ও প্রেমালাপ ধর্ষণেরই নামান্তর মাত্র। মানুষের মধ্যেও এই জাতীয় সম্পর্ক যে নাই তাহা বলা যায় না। 'সিদ্ধিনাথের প্রলাপ' গল্পে সিদ্ধিনাথ শৃঙ্খলিত, রজ্জুবদ্ধ নারীর যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাদের অবস্থা সুগ্রীবের অষ্টোত্তর সহস্র বানরী পত্নীরই অনুরূপ। আরব্য উপন্যাস পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পগ্রন্থ, কিন্তু তাহার ভূমিকায় এক ভীষণ নারী-উৎপীড়নের কাহিনী আছে শাহারজাদী যাহার অবসান ঘটাইয়াছেন। পরশুরামের কল্পনায় এই নৃশংসতা রেখাপাত করিয়াছিল, কারণ 'গুলবুলিস্তান' গল্পে উৎফুল ও লুৎফুলের ব্যবস্থাপনায় নারী ইহার প্রতিশোধ লইয়াছেন। কিচ্চট রাজকন্যা চিলিম্পার সঙ্গে সুগ্রীবের কিরূপ বনিবনাও হইয়াছিল গ্রন্থকার তাহা লিখেন নাই। তবে চিলিম্পা স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিতে পারিলে সুগ্রীবসহ অষ্টোত্তর সহস্র বানরের লাঙ্গুল কর্তন করিতে পারিতেন অথবা তাহাদের মুখ বন্ধ করিয়া তাহাদিগকে পতিত্বে বরণ করিতে পারিতেন।

সুগ্রীবের বন্ধু হনুমান অন্য কোটির লোক। তিনি স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত; সুতরাং শুধু সুগ্রীবের বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিলে তাঁহাকে একটু ছোট করিয়া দেখা হয়। পরাক্রমশালিতার জন্য তিনি মহাবীর নামে খ্যাত, কিন্তু তিনি নিজে রামদাস বলিয়া বর্ণিত হইতে সমধিক আগ্রহী। তিনি শুধু মহাবলশালীই নহেন, তীক্ষ্ণধীও বটে। প্রত্যুৎপন্নমতি না হইলে তিনি সুরক্ষিত লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া, সীতার কাছে তাঁহার দৌত্যকার্য সমাপ্ত করিয়া, লঙ্কা দগ্ধ করিয়া,

অক্ষত শরীরে রামের শিবিরে ফিরিয়া আসিতে পারিতেন না। ভূম্বরাজ চঞ্চরীকের প্রগল্‌ভতা তিনি ধমক দিয়া থামাইয়া দিয়াছেন এবং ব্যর্থকাম রাজা যখন তাঁহার উপর উপদেশ বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন মহাবীর তাঁহাকে এই বলিয়া সংযত করিলেন, 'ওহে চঞ্চরীক, তুমি ক্ষান্ত হও। অগ্রে নিজের সমস্যা সমাধান কর তাহার পর আমাকে উপদেশ দিও।' প্রখর বুদ্ধির অধিকারী হইলেও হনুমানের মধ্যে বানরসুলভ চপলতা ও শিশুসুলভ সরলতাও আছে। আলোচ্য গল্পেই তিনি দণ্ডকারণ্যে অজ্ঞাত পর্ণকুটীরে প্রবেশ করিয়া রাজোচিত বসন উত্তরীয় উষ্ণীষ প্রভৃতি পরিচ্ছদ দেখিয়া পরিয়া বসিলেন এবং প্রাচীর গাত্রে বিলম্বিত বীণা দেখিয়া শিশু যেমন খেলনা ধরে তেমনি সাগ্রহে তাহা বাজাইতে শুরু করিলেন। তাঁহার প্রবল অঙ্গুলিস্পর্শে বীণার তার ছিঁড়িয়া গেলে বিরক্ত হইয়া তিনি যন্ত্রটি ফেলিয়া দিলেন এবং রাজপোশাকে অস্বস্তি বোধ করায় চঞ্চরীককে তাহা ফিরাইয়া দিলেন।

মহাবীর অন্যের অসাধ্য অনেক কার্য সমাধা করিয়াছেন, কিন্তু ললিত-মধুর ব্যাপারে তাঁহার রুচি নাই এবং এই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রবেশও প্রায় অসম্ভব। চঞ্চরীকের বীণা লইয়া যে পরীক্ষা করিতে গিয়াছিলেন তাহার পরিণতি পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তৎপূর্বেও একবার নৃত্যগীতের চেষ্টা করিয়া উপহাসাস্পদ হইলে লক্ষ্মণ তাঁহাকে এই বলিয়া নিরস্ত করিয়াছিলেন, 'মারুতি,..... তুমি যাহা কর তাহাই নৃত্য, যাহা বল তাহাই গীত, যাহা না বল তাহাই কাব্য!' রামদাস মহাবীর যে কখনও রমণীর প্রেমে পড়েন নাই এবং কোন রমণীই যে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে সাহস পাইবে না ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। এই জিতেন্দ্রিয়, রামসীতায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ বীরের জীবনে গোল বাধাইলেন পিণ্ডলোভী পূর্বপুরুষেরা। যাহাতে তাঁহাদের পিণ্ডলাভের ধারা অব্যাহত থাকে তজ্জন্য হনুমানকে পুত্রার্থে ভার্যা গ্রহণ করিতে হয় এবং ইহা তাঁহার জীবনে এক উৎকট সমস্যার সৃষ্টি করিল। বাহিরের ভাসা-ভাসা ঠাট্টাতামাসার অন্তরালে যে রোমান্টিক কমেডির সন্ধান এই গল্পে পাওয়া যায় তাহা হইল চিলিম্পার রূপদর্শনে প্রভঞ্জন-নন্দনের হৃদয়ে প্রণয়ের হিল্লোল। অবশ্য বানরবাহিনী সম্পর্কে কবি মধুসূদনের যে আশংকা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে তাহা অমূলক নহে, বানর থাকিলেই প্রহসনের স্পর্শ আসিয়া যাইবে। যে সুন্দরী মারুতির হৃদয় হরণ করিলেন তাঁহার রূপের বর্ণনা একই

সঙ্গে রোমান্টিক ও কমিক—তাঁহার কর্ণে রক্তপ্রবাল, কণ্ঠে কপর্দমালা, হস্তে লীলাকমলের পরিবর্তে—লীলাকদলী! কিন্তু স্বল্পকালের মধ্যেই এই রূপসীর চরিত্রের কর্কশ দিকের যে পরিচয় তিনি পাইলেন তাহাতেই তাঁহার হৃদয়-দৌর্বল্য নির্জিত হইল এবং যিনি ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'তুমি প্রেমের কিছুই জান না। যাও, কিষ্কিন্ধ্যায় গিয়া সুগ্রীবকে পাঠাইয়া দেও', তিনি সেই চিলিম্পাকে উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে কিষ্কিন্ধ্যায় জলকেলিরত সুগ্রীবের ক্রোড়ে নিক্ষেপ করিলেন। সেইখানে মহিষীর সংখ্যা নবোত্তর সহস্র হইল এই পর্যন্ত। অক্ষত হৃদয়ে হনুমান অযোধ্যায় পহুঁছিয়া 'জয় সীতারাম' বলিয়া সীতাকে অভিবাদন করিলেন। রমণীর যে রূপ প্রথমে রতিভাবের সঞ্চার করিয়াছিল তাহাই পরে জুগুপ্সারও উদ্রেক করিল। ইহাও কমেডির অঙ্গ।

এই দুই বানরপুঙ্গবের সঙ্গে তুলিত হইতে পারে দুই নরপুঙ্গব—তুম্বরাজ চঞ্চরীক ও অশেষ ব্রহ্মতেজসম্পন্ন লোমশ মুনি। চঞ্চরীক অসামান্য রূপসী ও অতিশয় গুণবতী মহিষীর একনিষ্ঠ প্রেমের দাবীর বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ভূমার অর্থাৎ বহু নারীর সঙ্গে শৃঙ্গাররস আস্বাদ করিতে চাহেন। স্ত্রীর অজ্ঞান্তে আর কি করিয়াছিলেন প্রকাশ পায় নাই, কিন্তু একদিন রাজমহিষীর এক সখীর সঙ্গে কিঞ্চিৎ রসচর্চায় লিপ্ত ছিলেন, দুরদৃষ্টক্রমে মহিষী তাহা দেখিয়া ফেলিলেন। ইহার ফলে রাণী রাজার সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করিলেন। রাজা চঞ্চরীক রাজ্যত্যাগ করিয়া শতপত্নীর স্বামী লোমশ মুনির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে অরণ্যবাসী হইয়াছেন; মুনিবর তাঁহাকে বহুনারীকে বশে রাখার বিদ্যা শিখাইতে পারিবেন। ঘটনাচক্রে পরস্পর যুযুধান শতপত্নীর দ্বারা উদ্বেজিত হইয়া লোমশ মুনি ভূমার তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে পলায়ন করিয়া চঞ্চরীকের পর্ণকুটীরে আশ্রয় লইলেন। তিনি আর সেই বিবদমান পত্নীদের কাছে ফিরিয়া যাইবেন না, হনুমান তাঁহাদের যে কোন একটিকে পত্নীত্বে বরণ করিতে পারেন, চঞ্চরীক সবকয়টিকেই গ্রহণ করিয়া ভূমার সন্ধান করিতে পারেন। এখানে সুগ্রীব উপস্থিত হইলে পরিস্থিতির জটিলতা সম্পূর্ণ হইত। সুগ্রীবের ব্যবস্থা মনুষ্যসমাজে অপ্রযোজ্য বলিয়াই বোধ হয় গ্রন্থকার তাঁহাকে এই সম্মিলনীতে আনেন নাই। তবে সুগ্রীবের ব্যবস্থাও নিশ্ছিদ্র নহে, কারণ তারা তাঁহার পক্ষে বোঝা হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং 'গুলবুলিস্তান'

গল্পের শাহজাদীদের মত চিলিম্পা সুগ্রীবের জলকেলিতে কি বিভ্রাট ঘটাইল তাহা আমরা আন্দাজ করিতে পারি না।

রোমান্সের লক্ষণই অতৃপ্তি। শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক কবি বলিয়াছেন, প্রেমকে তুলনা করা যাইতে পারে খদ্যোতের চন্দ্রের সঙ্গে মিলনাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে অথবা রাত্রির দিনের জন্য সাগ্রহ প্রতীক্ষার সঙ্গে। তাই মানুষ একের বন্ধন ছিন্ন করিয়া ভূমাকে চাহিবে, আবার ভূমার উৎপীড়ন হইতে একের বিরলতার দিকে ধাবিত হইবে। এই পরস্পর-বিরোধী আকর্ষণের জন্যই রোমান্স দুর্বার রহস্যাবৃত—আবার কৌতুকময়।

লম্বকর্ণ—কেদার চাটুজ্যে—জটাধর বকশী

(১)

ছোটগল্পের পরিসর ছোট ; সুতরাং এখানে চরিত্রের জটিলতা ও বৈচিত্র্য প্রকাশের ক্ষেত্র খুব সীমিত। তবু পরশুরাম প্রায় সব সার্থক গল্পেই অল্প কথার মধ্যে যে সকল চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাদের ব্যক্তিত্ব খুব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। শুধু মুখ্য চরিত্র নয় যাহারা গল্পে খুবই গৌণ তাহারাও সংক্ষিপ্ত পরিধিতে দুই-একটি রেখার টানে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। বংশলোচনবাবুর ভাগ্নে উদয় ওরফে উদো শুধু নিজের বৌয়ের কথা ইবলিতে পারে এবং এইজন্য তাহার সমবয়সী নগেনমামা তাহাকে তিরস্কারও করে, যদিও উদো দমিবার পাত্র নহে। কিন্তু এই একটানা স্ত্রীনামসংকীর্তন কোথাও একঘেয়ে হয় না। ইহা আসে অপ্রত্যাশিতভাবে এবং প্রত্যেকবারই কিছু নূতন তথ্য থাকে। কখনও সে বাঘের লেজের সঙ্গে স্ত্রীর বেণী বা বিনুনীর তুলনা করিয়া তাহার বক্তব্য স্পষ্ট করিতে চায়, কখনও নিজের সাহসিকতার প্রমাণের জন্য স্ত্রীর উল্লেখের প্রয়োজন হয়, কখনও বা শ্যালিকার পাকা দেখা অথবা শাশুড়ীর মুরগীতে আসক্তি তাহার যুক্তিকে অলংকৃত করে। এইভাবে বিচিত্র এক-নিষ্ঠতার মাহাত্ম্যে তাহার ব্যক্তিত্বের অভাব বর্ণাঢ্যতা লাভ করে।

পার্শ্বচরিত্রের মধ্যে সবচেয়ে বর্ণাঢ্য হইল জিগীষা দেবীর স্বামী সুষেণবাবু। 'রাতারাতি' গল্পটা খুব এলোমেলো ; তাহার মধ্যে জিগীষা দেবীই আগন্তুক, কিন্তু তাঁহার স্বামীর আলেখ্য অবিস্মরণীয়। স্ত্রী নামজাদা লেখিকা ; মূর্খ, পরিচয়হীন সুষেণবাবু তাঁহার স্বামীও বটে আবার আজ্ঞাবহ ভৃত্যও বটে ; স্ত্রীর পোষ্য ভর্তৃনামধেয় এই লোকটির নিজের উপার্জনের একমাত্র পথ ভিক্ষা। জিগীষা দেবী সুষ্‌সুষ্‌ করিয়া শিস দিতেই : 'একটি ছোট প্রাণী গুট্‌গুট্‌ করিয়া আসিল। কুত্তা নয়। ইনি সুষেণবাবু, জিগীষা দেবীর স্বামী। রোগা, বেঁটে, চোখে চশমা কিন্তু গোঁফ জোড়াটি বেশ বড় এবং মোম্‌ দিয়া পাকানো। সতীসাধ্বী যেমন সর্বহারা হইয়াও এয়োতের লক্ষণ শাঁখাজোড়াটি শেষ পর্যন্ত রক্ষা করে, বেচারা সুষেণবাবুও তেমনি সমস্ত কর্তৃত্ব খোয়াইয়া পুরুষত্বের

চিহ্নস্বরূপ এই গোঁপ জোড়াটি সযত্নে বজায় রাখিয়াছেন।' তিনি স্ত্রীর ধমক হজম করিলেন। তাঁহার আজ্ঞা পালন করিলেন এবং শেষ পর্যন্ত অভ্যাগতদের নিকট হইতে পাঁচ টাকা ধার চাহিয়া আট আনা বখ্‌শিশেই তৃপ্ত হইলেন। ডিকেন্সের পিকউইক পেপার্স উপন্যাসে একটি চরিত্রের উল্লেখ পাই; তিনি নিজের পরিচয়জ্ঞাপক যে কার্ড ছাপিয়াছিলেন তাহাতে সগৌরবে লিখিত ছিল: Mr. Leo Hunter, Husband of Mrs. Leo Hunter; কিমাশ্চর্যমতঃপরম্‌!

পরশুরাম ছোট ছোট রেখার টানে অনেক চরিত্রকে দীপ্যমান করিলেও তিনটি চরিত্রকে বিস্তৃত করিয়া আঁকিয়াছেন এবং মনে হয় তাঁহারা গল্পের প্রয়োজনে গল্পের মধ্যে প্রবেশ করে নাই, অনেকাংশে তাহারাই গল্পের স্রষ্টা। গল্পের প্রয়োজন শেষ হইয়া গেলেও এবং একাধিক গল্পে ইহারা অবতীর্ণ হইলেও গল্পের উপসংহারে ইহাদের চরিত্রের রহস্য অনাবিষ্কৃত রহিয়া গিয়াছে। এই তিনটি চরিত্র হইল—লম্বকর্ণ, কেদার চাটুজ্যে এবং জটাধর বকশী। ইহাদের চরিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণর অপেক্ষা রাখে। অথচ কোন বিশ্লেষণেই ইহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাইবে না।

(২)

লম্বকর্ণ মানুষই নয়। সে মূক ছাগল, পশু জগতেও খুব নিকৃষ্ট, কারণ সিংহ বাঘ ভালুকের কথা ছাড়িয়া দিলেও কুকুর গরু প্রভৃতি নানা কারণে মর্যাদা পাইয়া থাকে, বানর শিয়াল প্রভৃতি চতুরতার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে কিন্তু ছাগল শুধু নির্বুদ্ধিতার প্রতীক। কোন লোককে মূর্খ বলিয়া গালি দিতে চাহিলেই আমরা বলি, বোকা পাঁঠা! পরশুরামের 'জাবালি' গল্পে নায়ক জাবালি মুনি তদীয় দর্শন ব্যাখ্যা করিলে, শিবের শ্বশুর দক্ষ প্রজাপতি কহিলেন, 'তোমার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝিলাম না।' তদুত্তরে মুনিবর মন্তব্য করিলেন, 'হে ছাগমুণ্ড দক্ষ, তুমি বুঝিবার চেষ্টা করিও না।' লম্বকর্ণ সম্পর্কে কিন্তু এইরূপ অবজ্ঞা প্রদর্শন করা সম্ভব বলিয়া পরশুরাম নিজেই মনে করিতেন না। তিনি 'লম্বকর্ণ' গল্পের উপসংহার করিয়াছেন এইভাবে: 'লোকে দূর হইতে তাহাকে বিদ্রূপ করে। লম্বকর্ণ গম্ভীরভাবে সমস্ত শুনিয়া

যায়, নিতান্ত বাড়াবাড়ি করিলে বলে—ব-ব-ব—অর্থাৎ যত ইচ্ছা হয় বকিয়া যাও, আমি ও-সব গ্রাহ্য করি না।' পরবর্তীকালেও ('গুরু-বিদায়') তিনি মন্তব্য করিয়াছেন যে লোকে তাহাকে বোকা-পাঁঠা বলিলেও সে মোটেই বোকা নয়। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লম্বকর্ণ গল্পের নিপুণ বিশ্লেষণ করিয়া আপত্তি তুলিয়াছেন যে, লম্বকর্ণের ক্ষুদ্র স্কন্ধের উপর গল্পের ভারকেন্দ্র চাপাইয়া দেওয়া সামঞ্জস্য-বোধের অনুযায়ী হয় নাই। তিনি 'গুরু-বিদায়' গল্পটি প্রকাশিত হইবার পূর্বেই এই সমালোচনা লিখিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্লেষণ-বৈদগ্ধ্য মানিয়া লইলেও মনে হয় তিনি লম্বকর্ণের সহজাত প্রজ্ঞার উপর ন্যায়বিচার করেন নাই।

শেক্সপীয়রের হ্যামলেট পাগলামির ভান করিয়া আবোলতাবোল বকিতেন, কিন্তু এই প্রলাপোক্তির মধ্য দিয়া মৌলিক প্রতিভার দীপ্তি বিচ্ছুরিত হইত। তাহা দেখিয়া পোলোনিয়াস বলিয়া উঠিয়াছিলেন, এই পাগলামির মধ্যে সুশৃঙ্খল যৌক্তিকতা দেখা যাইতেছে। বড়র সঙ্গে ছোটর তুলনা অমার্জনীয় না হইলে বলা যাইতে পারে, লম্বকর্ণ বোকাপাঁঠা বটে এবং তাহার খানিকটা একগুঁয়েমিও আছে। কিন্তু দেখিতে পাওয়া যাইবে তাহার বোকামি, খামখেয়ালি জ্যামিতির প্রতিজ্ঞার মত তাহাকে অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে অবিচলিত গতিতে পহুঁছাইয়া দিয়াছে।

লম্বকর্ণ কাথায় জন্মিয়াছিল, কে তাহার প্রথম মালিক ছিল কেহ বলিতে পারে না। 'বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি' উর্বশী যেমন আপনাতে আপনি বিকশি' উর্বশী যেমন ইন্দ্রসভামধ্যে তাহার ইন্দ্রজাল বিস্তার করিল, তেমনি কোন্ অজ্ঞাত স্থান হইতে আসিয়া সে রায়বাহাদুর বংশলোচনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া রায়বাহাদুরের সঙ্গে ক্রীড়ায় নিমগ্ন হইল, রায়বাহাদুরের সমস্ত সিগার উদরসাৎ করিল; শুধু তাই নয় প্রথম দৃষ্টিতেই সে বুঝিয়া ফেলিল যে রায়বাহাদুর তাহার বশীভূত এবং তিনি নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থলও বটে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা বলিয়া থাকেন ইতর প্রাণীদের একটা সহজাত বোধ বা ইন্‌স্‌টিংক্ট আছে যাহা মানুষের বুদ্ধির মত কার্যকারণ সম্বন্ধ বা ন্যায়ের যুক্তিশৃঙ্খলা ছাড়াই সত্যের গভীরতম তলদেশে পহুঁছাইতে পারে। রায়বাহাদুরের সঙ্গে যখন এই ছাগবীরের দেখা হয় তখন সে শিশু, কিন্তু এই শৈশবেই তাহার ইন্‌স্‌টিংক্ট পরিপক্কতা লাভ করিয়াছে। সে রায়বাহাদুরের সবগুলি চুরুট উদরসাৎ করার

পর নিঃসম্বল রায়বাহাদুর তাহাকে খালি বাক্সটা দেখাইল। সুতরাং সে মনে মনে সিদ্ধান্ত করিয়া থাকিবে যে এই ব্যক্তি তাহার পোষ মানিয়াছে এবং ইহার সঙ্গ লওয়া নিরাপদ। ইহা ইন্‌স্‌টিংক্ট না হইয়া নৈয়ায়িক সিদ্ধান্তও হইতে পারে। রায়বাহাদুরের বাড়িতে আসিয়াই সে নিজের এবং আশ্রয়দাতার জন্য বিপদ ডাকিয়া আনিল। রায়বাহাদুর তাহার প্রতি আসক্ত, কিন্তু রায়বাহাদুরের পারিষদরা তাহার মাংসের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি দিতে লাগিলেন এবং 'পুরুষ্টু পাঠা'র মাংসের প্রতি রায়বাহাদুরের ছেলেমেয়েরও আকর্ষণ আছে। ইহা অপেক্ষা অধিক অন্তরায় রায়বাহাদুর-গৃহিণী মানিনী দেবী যাঁহার চরিত্র স্বনাম-নিবেদিত এবং ঠিক এই সময়ই তাঁহার মানের পালা চলিতেছিল; তদুপরি তিনি স্বভাবতঃই জন্তুজানোয়ার পোষার বিরোধী। কিন্তু স্বল্পকালের মধ্যেই এই ছাগশিশু—যাহার নাম রাখা হইল লম্বকর্ণ—রায়বাহাদুরের মনে এমন প্রভাব সৃষ্টি করিয়াছে যে তিনি বন্ধুদের লোভাতুরতাকে নস্যাৎ করিয়া ছাগলকে পুষিবার অটল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। ইহাতে স্ত্রীর সঙ্গে তাঁহার বিরোধ বাড়িয়া গেল, কিন্তু তিনি সেই বিষয়েও একটা হেস্তনেস্ত করিতে চাহিলেন। এই লম্বকর্ণকে লইয়া প্রথম দিনেই ইঁহাদের মতান্তর মনান্তরে পরিণত হইবে এইরূপ সম্ভাবনা দেখা গেল।

এবার গোল বাধাইল লম্বকর্ণ নিজেই। সে রাত্রিবেলা বাঁধন ছিঁড়িয়া, তিন অধ্যায় গীতা উদরসাৎ করিয়া প্রদীপ উলটাইয়া, রেড়ির তেলে তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া, মনিবের স্বপ্ন ভঙ্গ করিয়া এক বিপর্যয় সৃষ্টি করিল। এ যেন শ্রীকান্ত উপন্যাসে ছিনাথ বউরূপীর অভ্যাগমে রয়াল বেঙ্গল টাইগারের বিভীষিকা আর এই বিভীষিকা সৃষ্টি করিলেন রায়বাহাদুর বংশলোচন নিজে ও তাঁহার আশ্রিত লম্বকর্ণ। এই বিপর্যয়ের পর পরাজয় মানিয়া লইয়া বংশলোচন লম্বকর্ণকে বিদায় দিতে মনস্থ করিয়া ইহাকে লাটুবাবুর 'কনসালটপার্টি'র জিম্মায় দিলেন। এই কনসালট পার্টি বা কেরোসিন ব্যাণ্ডের সানুনাসিক শব্দবর্জনমূলক কথোপকথন এবং অজ্ঞতা, বিলাসিতা, বিনয় ও আত্মাভিমানপূর্ণ অদ্ভুত আদব-কায়দা খুবই মুখরোচক। কিন্তু এই অশিক্ষিত শ্রমিকের দলও রায়বাহাদুরের প্রস্তাবের উদ্ভটতার প্রতি অবিচলিতভাবে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়াছে—কেহ পুষিবার উদ্দেশ্যে ছাগল পোষে না; ইহা ভোজ্যবস্তু এবং তাহাই ইহার একমাত্র আকর্ষণ। দলের ফ্লুটবাদক নরহরির উপদেশমত লাটুবাবু বংশলোচনকে আশ্বাস দিয়া

ছাগলটি গ্রহণ করিলেও বংশলোচন নিজে খুব ভরসা পাইলেন না, তাঁহার সন্দেহ হইল ইহারা হয় উহাকে বেচিবে নচেৎ কাটিয়া মাংস খাইবে এবং বন্ধু বিনোদ এই শঙ্কাকে আরও স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, 'ভেবো না হে তোমার পাঁঠা গন্ধর্ব-লোকে বাস করবে, ফাঁকে পড়লুম আমরা।'

লম্বকর্ণ নিজেও বোধ হয় তাহা বুঝিতে পারিল। সঙ্কট মুহূর্তে তাহার ইন্‌স্‌টিংক্ট বা সহজাত বোধ ঠিক জাগ্রত হইয়া আপন ভাগ্য আপনি জয় করিয়া লয়। সে লাটুবাবুর সঙ্গীতের যন্ত্রপাতি সব চিবাইয়া নষ্ট করিয়া দিল, ততোধিক লাটুবাবুর সযত্নরক্ষিত নব্বুই টাকার নোট ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। তাহার এই বৃকোদরসুলভ ভোজনের অন্য একটা দিকও আছে। সে লাটু-বাবুদের যে ক্ষতি করিল তাহা তাহার মাংসের দাম অপেক্ষা অনেক বেশি। সুতরাং লাটুবাবুরা তাহাকে ফেরত দিয়া খেসারত লইয়া চলিয়া গেল।

এইভাবে সকল পরিস্থিতিতেই দেখা যায় যে তাহার জীবনে অদৃষ্ট ও পুরুষ-কারের লুকোচুরি খেলা চলিয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত তাহার পুরুষকারই জয়ী হইয়াছে। বংশলোচনের যে তাহার প্রতি মায়া আছে ইহা সে বুঝিয়াছে এবং নিরুপায় বংশলোচন একটি টিনের উপরে করুণ আবেদন লিখিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন ঠিক করিয়া গোপনে তাহাকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন। এইবার নিয়তি সুপ্রসন্ন হইয়া লম্বকর্ণের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। আকাশে মেঘ দেখিয়া বংশলোচন বাৎসল্যের শেষ চিহ্নস্বরূপ লম্বকর্ণকে কয়েকখানি জিলাপি ঘুষ দিয়া একা একা বাড়ি ফিরিলেন। লম্বকর্ণ পিছু পিছু আসিতেছে কিনা দেখিয়া লইলেন এবং তাহাকে দেখিতে না পাইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু এখানে পশুর ইন্‌স্‌টিংক্ট বা সহজাত বোধ মানুষের বুদ্ধিকে অতিক্রম করিয়াছে। যে আধিদৈবিক শক্তি আকাশে বসিয়া লম্বকর্ণের ভাগ্য নির্ণয় করিতেছিল তাহার প্রচণ্ড প্রকোপ আন্দাজ করিয়া আত্মরক্ষা করিবার জন্যই লম্বকর্ণ কোন নিরাপদ্ জায়গায় আশ্রয় লইয়া থাকিবে। সুতরাং রায়বাহাদুর তাহাকে দেখিতে না পাইলেও সে রায়বাহাদুরের গতিবিধি এবং সঙ্কট সবই পর্যবেক্ষণ করিয়াছে; শুধু তাই নয়, সময়মত তাঁহার মাংসলোভী পারিষদবর্গ ও তাঁহার প্রধান প্রতিপক্ষ রায়বাহাদুর-গৃহিণীকে সংবাদ দিয়া পথ দেখাইয়া লইয়া গিয়াছে। এবার বংশলোচন তাহাকে মারিয়া দূর করিয়া দেওয়ার জন্য চেঁচাইয়া উঠিলেন, কিন্তু তাহার পক্ষ হইয়া সওয়াল করিলেন স্বয়ং মানিনী,

'আহা, কর কি, মেরো না। ও বেচারা বৃষ্টি থামতেই ফিরে এসে তোমার খবর দিয়েছে। তাইতেই তোমায় ফিরে পেলুম। ওঃ হরি মধুসূদন।' ইহার পর বংশলোচন তাহার প্রতি খানিকটা উদাসীন হইলেন, কিন্তু সে উত্তরোত্তর মানিনীর একান্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল এবং আর সকলের তাচ্ছিল্য নির্বিবাদে উপেক্ষা করিতে লাগিল।

সিপাহী হস্ত হইতে দেবী চৌধুরাণীর উদ্ধার সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই বলিয়াছেন, 'সময়ে মেঘোদয় ঈশ্বরের অনুগ্রহ ; অবশিষ্ট ভক্তের দক্ষতা।' ('ধর্মতত্ত্ব' —১৯শ অধ্যায়) লম্বকর্ণ ঈশ্বরভক্ত ছিল কিনা জানি না। কিন্তু ঈশ্বর তাহার সাহায্যার্থে সময়ে মেঘ ও বজ্রপাতের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং তাহার দক্ষতার জন্যই বংশলোচন রক্ষা পাইলেন এবং সে পাকাপাকিভাবে আশ্রয় পাইল। পরশুরাম জ্ঞাতসারে বঙ্কিমচন্দ্রের প্যারডি করিয়াছেন এমন কথা জোর করিয়া বলা যায় না। তবে দুইটি বর্ণনার পরমাশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষণীয়। লম্বকর্ণের মধ্য দিয়া আমাদের পারিবারিক জীবন, আমাদের দর্শন, নিউটনীয় বিজ্ঞান, আমাদের বিজ্ঞানচর্চা, ধর্মানুষ্ঠান, দর্শনব্যাখ্যা, আধুনিক ও প্রাচীন গুরুবাদ প্রভৃতি বিষয় অপরূপ ব্যঙ্গরসে অভিষিক্ত হইয়াছে, আর ধর্মীয় ভণ্ডামির বর্ণনায় স্নিগ্ধ ব্যঙ্গ কঠোর বিদ্রূপে পরিণত হইয়াছে।

রায়বাহাদুর ইলেকশনে মাতিয়া লম্বকর্ণকে ভুলিয়া গেলেন, কিন্তু লম্বকর্ণ যেন তাঁহারও ভুল শোধরাইয়া দেওয়ার জন্য দিনে দিনে শশিকলার ন্যায় পরিপুষ্ট হইয়া শক্তি সঞ্চয় করিতে লাগিল। মানিনী দেবী গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা লইবার জন্য ব্যগ্র হওয়ায় রায়বাহাদুর বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং দীক্ষা গ্রহণের পূর্বেই শিষ্যার গুরুভক্তির যে অদ্ভুত নমুনা দেখা গেল তাহাতে সপার্ষদ রায়বাহাদুর প্রমাদ গণিলেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে লম্বকর্ণের ইন্‌স্‌টিংক্ট বা ইনটুইশন কেদার চাটুজ্যের বিচক্ষণতা বা বিনোদ উকিলের ধূর্ত বুদ্ধি অপেক্ষা অনেক বেশি তীক্ষ্ণ ও প্রবল। সে প্রথম হইতেই বুঝিয়াছিল গুরুদেবের বাহিরের চেহারা, পোশাক, কথোপকথন, মধুর ভাবনৃত্য এবং ধর্মব্যাখ্যার অন্তরালে সারবস্তু কিছুই নাই, ভিতরটা একেবারেই ফাঁপা। অথচ ইনি কর্ত্রীর উপর যে প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছেন তাহাতে শুধু বংশলোচনের আসন টলিবে না, সে নিজেও অবহেলিত হইবে এবং এই মেকি সাধুর রাহুদৃষ্টি হইতে কেহই বাদ পড়িবে না। বিজ্ঞান না পড়িয়াও যেমন সহজাত বোধের দ্বারাই সে বলবিদ্যা

আয়ত্ত করিয়াছিল, তেমনি ধর্মশাস্ত্র বা দর্শন না পড়িয়াও সে বুঝিয়াছিল যে ফ্যাশনদুরস্ত ভণ্ড সাধুকে কাবু করিতে হইলে এবং মানিনীকে মোহমুক্ত করিবার পক্ষে তাহার শৃঙ্গৌষধিই যথেষ্ট; ইহার সঙ্গে অনুপানেরও কোন প্রয়োজন হইবে না। গুরুর ব্রহ্মজ্ঞানের করুণ পরিণতিতে কেদার চাটুজ্যে ও বংশলোচন যথাযোগ্য মন্তব্য করিলেন। লম্বকর্ণ গীতার মত শেক্সপীয়র উদরস্থ করিতে পারিলে মনে মনে ভাবিত: 'The wheel is come full circle; I am here.' সে যাহা হউক, শেক্সপীয়রের বিখ্যাত উক্তিও নূতন দ্যোতনায় মণ্ডিত হইয়া আমাদের স্মৃতিপথে উদিত হইল।

(৩)

'বিচক্ষণ' বৃদ্ধ কেদার চাটুজ্যে পরশুরামের আর একটি প্রধান সৃষ্টি। তাঁহার চরিত্র অতিশয় বিচিত্র। এমন কি তাঁহাকে পরশুরামের সৃষ্টি বলিলেও ঠিক বিবরণ দেওয়া হয় না, কারণ তিনি নিজেও স্রষ্টা; বকুলালবাবুর ও চরণ ঘোষের ছাগল ভুটের ব্যাঘ্রে পরিবর্তন তাঁহার রচিত science fiction বা বিজ্ঞান-ভিত্তিক উপন্যাস। তিনি বয়সে প্রাচীন, অভিজ্ঞতায় প্রবীণ, তাঁহাকে সাপে তাড়া করিয়াছে, বাঘে পিছু লইয়াছে, পুলিস কোর্টের উকিলে জেরা করিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই বিচলিত করিতে পারে নাই। তিনি সব অভিজ্ঞতা হইতে রস আহরণ করিয়া ভূয়োদর্শী হইয়াছেন। কিন্তু তিনি একাধিক অর্থে তরুণ; শুধু যে তিনি বঙ্কিম চাটুজ্যে ও শরৎ চাটুজ্যের মত গুম্ফশ্মশ্রুহীন তাহাই নহে; 'রাতারাতি' গল্পে তরুণদের ডেপুটেশনের তিনিই নেতৃত্ব করিলেন। তিনি বর্ণাশ্রমধর্মে এবং ব্রাহ্মণের জন্মগত শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী। তিনি আরও মনে করেন ব্রাহ্মণদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলেন পদ্মগর্ভ ঠাকুরের সন্তান কাশ্যপগোত্রীয় চাটুজ্যেরা; প্রমাণ বঙ্কিম চাটুজ্যে, শরৎ চাটুজ্যে আর—কেদার চাটুজ্যে। সেই সূত্রে তিনি কিঞ্চিৎ অলৌকিক ক্ষমতা দাবী করেন; আধুনিক রাডারযন্ত্রের সাহায্যে নয়, পঞ্জিকা দেখিয়া তিনি বৃষ্টির আগমন ও প্রশমন নির্ণয় করেন। প্রশ্ন করিলে তিনি অকুতোভয়ে উত্তর দিতেন আধুনিক আবহতত্ত্ব (meteorology), বিবর্তনবাদ (evolution), সুপ্রজননবিদ্যা (genetics) ইত্যাদি সবই প্রাচীন হিন্দুদের জানা ছিল। কিন্তু তাঁহার গোঁড়ামিও নাই; তিনি রেলগাড়িকে বৃহৎ

কাষ্ঠখণ্ড বিবেচনা করিয়া শীতের প্রভাতে মেমসাহেব-পরিবেশিত চা সেবন করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই এবং গোঁড়া বৈষ্ণব চরণ ঘোষ যখন ছেলেদের অ্যাংলো-মোগলাই হোটেলে খাইতে দেখিয়া ধিক্কার দিলেন তখন তিনি ছেলেদের সপক্ষে যে উদার মন্তব্য করিয়া বন্ধুকে নিরস্ত করিলেন তাহা উদ্ধার-যোগ্য: 'আরে চুপ চুপ। বেচারাদের অপরাধ নেই; হাজার বছর শুনে এসেছে এটা খেয়ো না, ওটা খেয়ো না। এখন যখন ভগবান সুবুদ্ধি আর সুবিধে দিয়েছেন তখন জন্মজন্মান্তরের অতৃপ্তি চটপট মিটিয়ে নিতে হবে। আহা, এদের ভোজন সার্থক হ'ক।'

চাটুজ্যে মহাশয়ের ব্যক্তিত্বের মূলে রহিয়াছে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং আত্ম-প্রত্যয়। তিনি ইংরেজি জানেন না, এমন কি চিকিৎসকের ডাক্তারি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেটের পার্থক্য কি তাহা বোঝেন না। চিমেশ মিত্তির তাঁহার পুরাণ পুঁথি কিনিয়া লইয়া ডক্টর হইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা দেন নাই। তাঁহার নাড়ীজ্ঞান আছে, প্রবন্ধ লিখিয়া ডাক্তার হইতে হইলে তিনিই তাহা করিবেন; বুড়ো বয়সের একটা সম্বল হইবে! বংশলোচন যখন সভয়ে তাঁহার স্ত্রীর গুরুর কাছে দীক্ষা নেওয়ার কথা পাড়িলেন, সেকেলে চাটুজ্যে মহাশয়ের দৃষ্টি গেল বংশলোচনদের বংশগত গুরুপরিবারের প্রতি; একালের মহিলারা যে নতুন ধরনের গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়াছেন এবং সেই পুরানো আমলের গুরুরা যে একালে অচল চাটুজ্যে তাহা বুঝিতেই পারেন নাই। তাহা হইলেও এই অচিন্ত্যপূর্ব পরিস্থিতিতেও তিনি সম্বিৎ হারান নাই। লম্বকর্ণ যখন খল্বিদং স্বামীকে ধরাশায়ী করিল ও ব্রহ্মজ্ঞানী মহাপুরুষ যখন প্রতিপক্ষ একটা ছাগলকেই একমাত্র সত্য বলিয়া রুখিয়া উঠিলেন এবং মানিনী যখন ছাগ-প্রীতির দ্বারা সকলকে বিভ্রান্ত করিয়া ফেলিয়াছে, তখন স্বামীজীর আদি মুরুব্বি নগেন চুপ করিয়া গিয়াছে, উদয় কোনক্রমে একবার বউয়ের নাম করিয়া থামিয়া গিয়াছে, চতুর বিনোদ উকিল শুধু একটু মামুলি ব্যঙ্গোক্তি করিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তখন প্রশান্ত গম্ভীর কেদার চাটুজ্যে স্বামীজীর পিঠে হাত বুলাইয়া বংশলোচন-মানিনীর জীবনের এই অধ্যায়ের উপর এই বলিয়া যবনিকা টানিলেন: 'এই নির্বান্ধব-পুরে দুশমনের হাতে কেন প্রাণটা খোয়াবে, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও, বেঁচে থাকলে অনেক শিষ্য জুটবে। এস, আমি একটা ট্যাক্সি ডেকে দিচ্ছি।'

ইহার সঙ্গে 'বিরিঞ্চিবাবা'র পরিণতি তুলনা করা যাইতে পারে এবং অন্যান্য অংশেও এই গল্পের বিষয়ের সাদৃশ্য ও প্রকাশভঙ্গির পার্থক্য লক্ষণীয়। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে: 'বিরিঞ্চিবাবা' আগাগোড়া হৈচৈপূর্ণ প্রচণ্ড প্রহসন আর 'গুরুবিদায়' সূক্ষ্ম কমেডি।

চাটুজ্যে মহাশয় ডক্টর জনসনের মত পণ্ডিত নহেন, কিন্তু তাঁহারও জনসনের মত প্রচুর পরিমাণে সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান আছে এবং জনসনের ন্যায় তিনিও একজন 'প্রবীণ তরুণ'। মনে রাখিতে হইবে এই শব্দযুগ্মকও তাঁহারই সৃষ্টি। তিনি জানেন তরুণরা কিছুদিন চেঁচামেচি করিয়া চরিয়া বেড়াইয়া যথারীতি সংসার-খোঁয়াড়ে প্রবেশ করে। কাজেই 'রাতারাতি' গল্পে—অনেকটা জনসনের মতই—তিনি অতি সহজে তরুণদের দলে ভিড়িয়া গেলেন; চরণ ঘোষকে বিদায় দিয়া তিনি চরণ ঘোষের পুত্র কার্তিক ও কার্তিকের বন্ধুদের লইয়া লেখিকা জিগীষা দেবীর কাছে ডেপুটেশনে গেলেন। সেকেলে লোক হইলেও 'ঘাবড়াবার ছেলে কেদার চাটুজ্যে নয়'। মেয়েদের সঙ্গে ব্যবহারও তাঁহার বেশ রপ্ত আছে, কারণ তাঁহার তিন খুড়শাশুড়ী, চার শালাজ, সাত শালী আর গিন্নী তো আছেনই; চল্লিশ বৎসর ইহাদের সঙ্গে কারবার করিয়া তিনি হাত পাকাইয়াছেন। কার্তিকের জন্যই তিনি ডেপুটেশনের মুখপাত্র হইয়া জিগীষা দেবীর কাছে গিয়াছিলেন। কার্তিক যাহা পরে বলিয়াছে তাহা তিনি জিগীষা দেবীকে না দেখিয়াই আন্দাজ করিয়াছিলেন অর্থাৎ এই মহীয়সী মহিলা একটি 'বিগ হমবগ' এবং উৎপীড়িত স্বামী সুষেণবাবুর সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পূর্বেই তিনি এই মহিলার নাম দিয়াছিলেন—'জিঘাংসা দেবী'। তিনি ইঁহার অর্থহীন বাণী সস্নেহে গ্রহণ করিলেন এবং বিদায় নেওয়ার সময় বলিয়া গেলেন—'বাঃ চমৎকার, খাসা। বাটলো, কাগজখানা যত্ন করে রেখে দিস।··· আর ভাবনা কি, কেল্লা মার দিয়া······'। অর্থাৎ এই কাগজখানার অকিঞ্চিৎকরত্ব ছেলেরাও অচিরেই বুঝিতে পারিবে।

চাটুজ্যে মহাশয় বলিয়াছেন যে, বাঘে তাঁহার পেছু লইয়াছিল আবার ইহাও বলিয়াছেন যে 'আর বছর মুঙ্গেরে থাকৃতে আমি এক বাঘিনীর পাল্লায় পড়েছিলুম·· ···।' তারপর প্রেমের কাহিনী বলিতে অনুরুদ্ধ হইলে তিনি আরম্ভ করিলেন, 'আর বছরের ঘটনা। আমি এক অপরূপ সুন্দরী নারীর পাল্লায় পড়েছিলুম।' তখন নগেন ফোড়ন কাটিয়া বলিল, 'এই যে বলছিলেন

বাঘিনীর পাল্লায়।' বিনোদ উকিল সময়োচিত মন্তব্য করিলেন, 'একই কথা।' ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, তিনি পলায়ন করিয়া বাঘিনীর পশ্চাদ্ধাবন হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন কিন্তু টুণ্ডলা রেলস্টেশনে যে নারীদেহধারিণী রূপসী মার্কিনী বাঘিনীর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল তাঁহাকে দেখিয়া তিনি ভীত হয়েন নাই; বরং ইংরেজিতে অজ্ঞ, প্রাচীন আচারপন্থী নিরীহ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সম্মুখ সম্ভাষণে উপস্থিত বুদ্ধি ও আত্মপ্রত্যয়ের দ্বারা এই অতি আধুনিকা বিদেশিনীকে সাময়িকভাবে স্বীয় আয়ত্তে আনিয়া ফেলিয়াছেন।

প্রথম দর্শনের তিনি যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা হইতেই বোঝা যায় যে আধুনিক সভ্যতা মনে ক্ষণেকের জন্য চমক লাগাইলেও তাঁহার আত্মবিশ্বাসকে বিচলিত করিতে পারে নাই। ইহার পোশাক তাঁহার কাছে কিম্ভূতকিমাকার বলিয়া মনে হইয়াছিল, তিনি বিনোদ উকিলের প্রতিবাদের উত্তরে বলিলেন, 'কাট (skirt)-কাট বুঝি না। পষ্ট দেখলুম বাঁদিপোতার গামছা থাটো করে পরা .....।' তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যে নিখুঁত পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়াছেন তাহার মধ্যে বিস্ময়ের সঙ্গে তাচ্ছিল্যও আছে এবং আত্মনিষ্ঠ লোকের পক্ষেই তাহা সম্ভব—ইনি কালিদাসের সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার সঙ্গে তুলনীয়া নহেন, বরং মনে হয় যেন জ্বলন্ত হাউইয়ের কাঠি! ইনি বরাভয়দাত্রী, কিন্তু ইনি কালী করালী নহেন এবং গৌরী হইলেও দশরণপ্রহরণধারিণী দুর্গাও নহেন; এই দেবীর এক হাতে বরাভয় অপর হাতে—জ্বলন্ত সিগারেট! কেদার চাটুজ্যে 'ঘাবড়াবার ছেলে নয়'; কাজেই মেমের ভব্যতাবিরুদ্ধ তীক্ষ্ণ দৃষ্টির এবং কৌতূহলী প্রশ্নের একসঙ্গে জবাব দিয়া তিনি বলিলেন, 'আই কেদার চাটুজ্যে—নো জু গার্ডেন।' বাল্মীকি হইতে রবীন্দ্রনাথ, হোমার হইতে শেক্সপীয়র—কোন ভাষাবিদই ইহা অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত অথচ জোরালো উত্তর কল্পনা করিতে পারিতেন না। সম্মুখ সম্ভাষণে তিনি পশ্চাৎপদ হওয়ার ব্যক্তি নহেন; নিজে যে হাই কাস্ট বেঙ্গলী ব্রাহ্মিণ তাহাও মেমকে বলিয়া দিলেন এবং সাক্ষ্যস্বরূপ পৈতা বাহির করিয়া দেখাইয়া দিলেন। তিনি ভীরু বাঙালীর মত সাহেবী এটিকেটের ধার ধারেন না; মেমসাহেব যেমন তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তেমনি তিনিও পাল্টা প্রশ্ন করিয়া মেমসাহেবের পরিচয় লইলেন এবং দেখা গেল পদ্মগর্ভ ঠাকুরের সন্তান এই অকুতোভয় ব্রাহ্মণের ব্যবহারে মেমসাহেব শুধু প্রীত হয়েন নাই শ্রদ্ধাবনতও হইয়াছেন। স্বল্পকালের মধ্যেই এই

'জ্বলন্ত হাউইয়ের কাঠি' তাঁহার বশে আসিল; অবশ্য পরে দেখা গেল তাহাও ক্ষণেকের জন্য।

মার্কিনী যুবতী জোন জিলটারের সঙ্গে ষষ্ঠীবর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ পাঁজিপুথিপড়া আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ কেদার চাটুজ্যের সম্ভাষণ যেন প্রাচীন ভারতীয় সংস্কারবদ্ধ জীবনধারার সঙ্গে আধুনিক সংস্কারমুক্ত ধনতান্ত্রিক যন্ত্রযুগের ক্ষণিক সহাবস্থান। এই সম্মুখ সম্ভাষণে কেদার চাটুজ্যের পর্যবেক্ষণশক্তি ও ভারতীয় সনাতন আদর্শে তাঁহার অচল নিষ্ঠা পরমাশ্চর্য দ্যুতি লাভ করিয়াছে। যুযুধান দুই পাত্রের যে বর্ণনা তিনি দিয়াছেন তাহার মধ্যে অতিরঞ্জন থাকিতে পারে, ঠিক সময়ে মুষ্টিযোদ্ধা বিল বাউণ্ডারের অভ্যাগম deus ex machina-র দ্বারা কৃত্রিম সমস্যা সমাধান বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু আদর্শের যে বৈপরীত্য এই গল্পের ভিত্তি তাহার মধ্যে অতিরঞ্জন নাই, কোন কৃত্রিমতা নাই। আমাদের সনাতন বিবাহপদ্ধতি নানা ত্রুটিতে পরিপূর্ণ, ইহার বীভৎসতার বিষয় শরৎচন্দ্র একাধিক উপন্যাসে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহার আদর্শ হইল চিরন্তন, দেবতার আশীর্বাদপূত অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। পুরুষের বহুবিবাহ ইহাকে ট্র্যাজেডি ও প্রহসনে পরিণত করিয়াছে; বিভিন্ন পথে কোন কোন নারী একাধিক পুরুষের সংস্পর্শে আসিয়াছে। তবু রামসীতা এবং সাবিত্রীসত্যবানের সম্পর্কই আদর্শ; অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা ও মন্দোদরী একাধিক পুরুষের সংস্পর্শে আসিয়াও দৈব আশীর্বাদের ফলেই স্মরণীয়া হইয়াছেন। যে'সব প্রাচীন সমাজে বিবাহে খানিকটা সামাজিক চুক্তির ভাব প্রবেশ করিয়াছে সেইখানেও এই চুক্তি স্থায়ী হইবে এইরূপ আশার ভিত্তিতেই পাত্রপাত্রী এই বন্ধন গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু আধুনিক কালে চিরন্তনতার আদর্শ এবং অত্যাজ্য সতীত্বের লক্ষ্য ক্রমে ক্রমে ঝাপসা হইয়া আসিতেছে এবং ধর্মীয় অনুশাসন অবান্তর বলিয়া গণ্য হইতেছে। এই বন্ধনমুক্তির পরিণতি সবচেয়ে বেশি উৎকট হইয়াছে আমেরিকায়। এই সভ্যতা একেবারে ঐহিক, ধনতান্ত্রিক ও যান্ত্রিক; দ্বিতীয়তঃ এই সভ্যতার পশ্চাতে যুগযুগপ্রবাহিত ঐতিহ্য নাই।

এই সমাজে বিবাহ কোন বন্ধনই নয়; ইহা একটা ক্ষণিক খেয়ালের আবরণ বা আভরণ মাত্র; ইহাকে খেয়ালখুশিমত গ্রহণ বা বর্জন করা যায়। ইহার ক্ষণিকতা, অন্তঃসারশূন্যতা মুহূর্তের মধ্যেই কেদার চাটুজ্যের কাছে ধরা পড়িয়াছে, কারণ এই ব্রাহ্মণ ইহার বিপরীত প্রান্তের মানুষ। তিনি বই পড়িয়া

আধুনিক সভ্যতা সম্পর্কে কিছুই শিখেন নাই, আধুনিক ছোট স্কার্ট পরা মেম-সাহেবের সঙ্গে তাঁহার এই প্রথম সাক্ষাৎ, আমেরিকার আবিষ্কর্তা কলম্বসের নাম তিনি শুনিয়াছেন, এই নাম অন্য কাহারও থাকিতে পারে তাহা তাঁহার মনেই হয় নাই, কিন্তু এক দৃষ্টিতেই আধুনিক—তথা মার্কিনী—সভ্যতার স্বরূপ তাঁহার কাছে স্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহারা নিজেদের বুদ্ধি বিবেচনা মত স্বামী নির্বাচন করেন বলিয়া বড়াই করেন তাঁহারা যখন একটা টাকাকে চিত উবুর করার উপরে সেই দায়িত্ব ছাড়িয়া দিয়াছেন তখনই ইঁহাদের বুদ্ধির দৌড়, ইঁহাদের অনুষ্ঠানের মহিমা তিনি বুঝিয়া ফেলিয়াছেন এবং প্রতি-দ্বন্দ্বী দুই পাত্রের যোগ্যতাও শুধু ঘোঁত-ঘোঁত অথবা মাতালের মাতলামি। হিন্দুরা শ্রাদ্ধ, প্রায়শ্চিত্তের সময় মাথা মুড়াইয়া ফেলে, জোন জিলটারও চুল ছোট করিয়া প্রায় মুণ্ডিতমস্তিষ্ক হইয়াছেন। সুতরাং পদ্মগর্ভ ঠাকুরের সন্তানের মতে এই দুই ভাবী স্বামীকে নরকে ঝাঁটাইয়া বিদায় করিলেই ইঁহাদের প্রতি কর্তব্য সমাধান করা হয়। কেদার চাটুজ্যে ইংরেজি না জানিলেও spirit শব্দের অর্থ জানেন :এবং মেথিলেটেড স্পিরিট তো বাংলা শব্দ৷ হিসাবেই প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। আমেরিকায় মেথিলেটেড স্পিরিট ছাড়া আর সব রকম কড়া সুরা নিষিদ্ধ অর্থাৎ দুষ্প্রাপ্য হইয়া গিয়াছে বলিয়া এই দুই ভাবী স্বামী দেশভ্রমণে বহির্গত হইয়া মাতাল হইয়া ট্রেনের কামরায় গড়াগড়ি যাইতেছে। এই সব দেখিয়া শুনিয়া চাটুজ্যে মহাশয় এই দুই সুরাসন্ধানীদের উদ্দেশ্যে বলিলেন—'এঁরা বুঝি মস্ত স্পিরিচুয়ালিস্ট?' ইহাই এই ভোগসর্বস্ব, প্রীতিহীন, ঐতিহ্যহীন সভ্যতা সম্পর্কে উপযুক্ত মন্তব্য।

কেদার চাটুজ্যে পরে যে ব্যবস্থা করিয়া দিলেন তাহাও তাঁহার উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দেয়। বলং বলং বাহুবলং—বিলা সাহেব যখন দুই প্রতিদ্বন্দ্বীকেই ধরাশায়ী করিয়াছেন তখন তাঁহাকে বিবাহ করিলেই সাময়িক সমস্যার সমাধান হইয়া যায়। ইঁহাদের বিবাহ তো ক্ষণেরই ব্যাপার, কাজেই বেশি চিন্তা করার প্রয়োজন কি? তিনি যে মঙ্গলাচরণ করিলেন তাহার মধ্যেও প্রাচীন-আধুনিক, ইঙ্গ-ভারতীয় পদ্ধতির এবং আশীর্বাদ ও বিদ্রূপের সমন্বয় হইয়াছে। তিনি মেমকে এই বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন—'তোমার ঠোঁটের সিঁদুর অক্ষয় হ'ক।' অতঃপর ইঁহাদের যাবনিক নৃত্যের সঙ্গে তিনি রামপ্রসাদী গান যোগ করিয়া

দিলেন। এই কাহিনীর উপসংহারও অপ্রত্যাশিত নয়—'বিয়ের পরদিনই বেটি পালিয়েছে। সায়েব তাঁকে খুঁজতে গেছে।'

কেদার চাটুজ্যে দাবী করিয়াছেন তিনি গল্প বলেন না, সত্য ঘটনার বিবরণ দেন। 'দক্ষিণ রায়' গল্পে তিনি প্রতিবেশী বন্ধু চরণ ঘোষের মেসো বকুলাল দত্তের রূপান্তরের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহার মধ্যে ব্যক্তির জীবনী, মনস্তত্ত্ব, সমসাময়িক ইতিহাস এবং নাটকীয় পরিস্থিতির পরমাশ্চর্য পরিচয় পাওয়া যায়। এই আত্মপ্রত্যয়সম্পন্ন সেকেলে ব্রাহ্মণ মনে করিতেন আধুনিক বিজ্ঞান নূতন কিছুই আবিষ্কার করে নাই; সবই প্রাচীন ভারতে জানা ছিল এবং এখনও স্বল্পসংখ্যক সূক্ষ্মদর্শী ব্রাহ্মণের তাহা জানা আছে। বলা বাহুল্য, ইঁহাদের অন্যতম হইলেন কাশ্যপগোত্রীয় কেদার চাটুজ্যে। তাই তিনি চরণ ঘোষের ছাগল ও বকুলালের ব্যাঘ্রত্বপ্রাপ্তির আজগুবি কাহিনীকে সত্য ঘটনা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং এইভাবে রসস্রষ্টা নিজেই উপহাসাস্পদ হইয়াছেন। সাহিত্যে এই জাতীয় দৃষ্টান্ত আরও দু-চারটি পাওয়া যায়; কিন্তু অনেক সময় এই দুরূহ চেষ্টা সার্থক হয় না। দক্ষিণ রায় সম্পর্কিত পাঁচালী অতিশয় মুখরোচক রচনা, বকুলাল দত্তের জীবনের প্রথমার্ধের নাটকীয় পটপরিবর্তন উচ্চাঙ্গের কমেডি, কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক নাই আর বকুলালের ব্যাঘ্রত্বপ্রাপ্তির কাহিনী এত উদ্ভট ও আজগুবি যে ইহাকে কমেডির পর্যায়ে ফেলা যায় না। কমেডির প্রধান লক্ষণ সম্ভব ও অসম্ভবের লুকোচুরি। এখানে সম্ভাব্যতার বাষ্পও নাই, রূপকথার আভ্যন্তরীণ সংহতি বা মনস্তাত্ত্বিক সুসঙ্গতিও নাই। রামগিধরের আবির্ভাবের পর হইতেই গল্পের সমস্ত রস শুকাইয়া গিয়াছে, এমন কি এই অংশের পাঁচালীর যে উদ্ধৃতি আছে তাহারও কোন জৌলুষ নাই।

'দক্ষিণ রায়' গল্পের প্রথম ভাগ দ্বিধা-বিভক্ত হইলেও উভয় অংশই কেদার চাটুজ্যের—তথা পরশুরামের—বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে ঝলমল এবং চরিত্রসৃষ্টি ও ঘটনা-সংস্থানে অনবদ্য। দক্ষিণ রায়ের যে বর্ণনা আছে তাহার মধ্যে পাঁচালীর ছন্দ ও ভাষার এমন সুন্দর অনুকরণ করা হইয়াছে যে ইহা 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। আর রামজাদু অ্যাটর্নির সামান্য কেরানী বকুলাল দত্তের মনোভাবের যে বিশ্লেষণ দেওয়া হইয়াছে তাহার মধ্য দিয়া এই লোকটির সাধারণত্ব বিস্ময়কর হইয়া প্রতিভাত হইয়াছে অথচ সাধারণত্বও

হারায় নাই। তিনি মনিব কর্তৃক তিরস্কৃত ও অপমানিত হইয়া ঝোঁকের মাথায় চাকুরিতে ইস্তফা দিয়া সম্মুখে অন্ধকার দেখিলেন, কিন্তু সেই মানসিক অন্ধকারের মধ্যে মেসে প্রবেশ করিলে একটি অদ্ভুত দৃশ্য তাঁহার সামনে পড়িল। বকুলালের স্ত্রী স্বামীর জন্য যে পশমের আসন বানাইয়া দিয়াছিলেন তাহার উপরে বসিয়া মেসের ঝি তাঁহারই থালায় বসিয়া লুচি খাইতেছে আর মেসের পাচক তাহাকে বাতাস করিতেছে। জীবনটা যে ট্র্যাজি-কমেডি—ইহার পর কেহ তাহা অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু বকুবাবু এমন ট্র্যাজেডির সমীপবর্তী হইয়াছেন যে তিনি এই কমেডির রস গ্রহণ করিতে পারিলেন না এবং এই অশালীন, অশোভন, অপমানকর আচরণ দেখিয়াও দেখিলেন না। তাঁহার নিজের মনে যে বিচিত্র ভাবের তরঙ্গবিক্ষোভ হইতে লাগিল সেইখানেও ট্র্যাজি-কমেডি। এক দিকে নিজের ও স্ত্রীপুত্রের সামনে নিশ্চিত অনাহারের সম্ভাবনা ; অপর দিকে তিনি হঠাৎ প্রচুর টাকার জন্য একাগ্র মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সেই জাগ্রৎ স্বপ্নেও তিনি আপন মনে দর কষাকষি করিতে লাগিলেন এবং গিন্নীর সঙ্গে সেই কল্পিত সৌভাগ্যের ভাগাভাগি করিতে লাগিলেন।

'অত্যভক্ষধনুর্গুণ' হইয়া বকুলাল প্রথমে তাঁহার ঐশ্বর্যশালিনী বিধবা পিসীমার কথা ভাবিলেন। কিন্তু সেখানে কোন সম্ভাবনা দেখিতে পাইলেন না, কারণ পিসীমা নিজের মাতাল ছেলেকে লইয়াই ব্যস্ত, তাঁহাকে ছাড়িয়া ভাইপো বকুর কথা ভাবিবেন না। অগত্যা বকুলালকে দৈবানুগ্রহেই ধনী হইতে হইবে এবং শুধু নিজে ধনী হইবেন না, শত্রু রামজাদুকেও জব্দ করিতে হইবে। সেইজন্য প্রথমেই শত্রুবিমর্দনের ব্যবস্থা করিতে হইলে প্রেম ও অহিংসার প্রবক্তাদের কোপ প্রশমনের উদ্দেশ্যে বুদ্ধ, যিশু ও চৈতন্যের কাছে আবেদন করিয়া লইলেন তাঁহারা যেন বাগড়া না দেন। তারপর রামজাদুকে ছাড়িয়া নিজের সৌভাগ্যের জন্য দেববন্দনার কথা চিন্তা করিলেন। কাহাকে বন্দনা করিবেন ? দেবতারা অদৃশ্য, তাঁহাদের সংখ্যাও কম নয়, প্রত্যেক ধর্মেই অলৌকিক শক্তির উল্লেখ আছে। কাহাকে ছাড়িয়া কাহাকে বাছিবেন ? উত্তপ্ত মস্তিষ্কে তিনি এই অকাট্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে আজ তিনি সব ধর্মেরই অনুশাসন মানিয়া চলিবেন। দুর্গা, কালীর নাম করিলেও হিন্দুর প্রধান প্রধান দেবতাদের মধ্যে তিনি নারায়ণকে বাছিয়া লইলেন, কারণ শ্রীকৃষ্ণরূপে তিনি 'দর্পহারী'

মধুসূদন, কাজেই তিনি প্রসন্ন হইলে শুধু বকুলালকেই ধন দিবেন না, বকুলালের পূর্বতন মনিব রামজাদুকেও টিট্ করিবেন ; বুদ্ধ ও যিশুকে তো আগেই বন্দনা করিয়াছেন, এখন ইসলামের পয়গম্বর, ব্রাহ্মের ব্রহ্ম, ইহুদীদের যেহোবা, পার্শীর অহুর, ইঁহাদেরও আরাধনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এখানে থামিলেই চলিবে কি ? আমাদের শাস্ত্রে আছে দেবযোনি যক্ষরাজ কুবেরই তো স্বর্গের কোষাধ্যক্ষ আর দৈত্যগণ যে ধনসম্পদ দিতে পারে ইহা বহু দেশের কিংবদন্তীতেই পাওয়া যায়। সুতরাং তিনি আরাধ্য দেবতাদের সঙ্গে দৈত্য ও যক্ষকেও যোগ করিয়া দিলেন। বোধ হয় অনুপ্রাসের বলেই যক্ষের সঙ্গে রক্ষও আসিয়া গেল এবং রাক্ষসই যদি উপাস্য হয়, তাহা হইলে শয়তান ? তাঁহাকেও ছিঃ ছিঃ করিলে চলিবে না। শয়তান ধনসম্পদ দিয়া মানুষকে প্রলুব্ধ করেন, যদিও শেষে এই প্রলুব্ধ মানুষরা নরকে যায়। অন্তিমে নরক যাত্রার সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করিয়া বকুলাল শয়তানেরও আরাধনা করিতে লাগিলেন।

তাঁহার প্রার্থনার বিষয় অর্থলাভ, এই অনায়ত্ত ধনের পরিমাণ নির্ণয়ও খুব কৌতুকোদ্দীপক। তিনি কেবলই স্বপন করিতেছেন বপন, কিন্তু ইহার মধ্যে সূক্ষ্ম বিচার ও চুলচেরা হিসাবনিকাশের পরিচয় আছে। তিনি প্রথমে এক লাখ চাহিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনে হইল মাত্র এক লাখে তাঁহার চাহিদা মিটিবে না ; তাঁহার অন্ততঃ দশ লাখের প্রয়োজন। নিরন্ন বেকার কেরানীর পক্ষে এত বড় আবদার অযৌক্তিক মনে হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে অসম্ভব কিছুই নাই বা ইহাকে বাড়াবাড়িও বলা যায় না। দেবতা বা শয়তানের কাছে এক লাখ আর এক কোটিতে তো কোন তফাত নাই ; সুতরাং তাঁহাদের আপত্তিরও কোন কারণ নাই, আর কত মানুষকে তো তাঁহারা কোটি কোটি টাকা দিতেছেন। হাতে আসার আগেই দশ লাখের বণ্টনেও তিনি সূক্ষ্ম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক হিসাব কষিয়া লইলেন—বাড়ি, ফার্নিচার, গাড়ি এবং তাও একটা নয়, দুইটি, কারণ গৃহিণীরও মনোরঞ্জন করিতে হইবে। এই বিষয়েও তিনি স্বামীর প্রাধান্য বজায় রাখিতে চান ; সুতরাং গৃহিণীর গঙ্গাস্নান ও থিয়েটার দেখা প্রভৃতির জন্য একটা ফোর্ড বা অন্য মার্কার সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড বরাদ্দ করিলেন। অলৌকিক ম্যাজিক ও লৌকিক লজিকের গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে তাঁহার প্রার্থনা এক অপরূপ কমেডির সৃষ্টি করিয়াছে।

মেসের সবাই সিনেমায় গিয়াছে। নির্জন কক্ষে আলো নিভাইয়া বকুলাল

এই অপূর্ব, একাগ্র সার্বভৌমিক 'তপস্যা'য় নিমগ্ন আছেন; ঠিক সেই সময় নিবিড় স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া আওয়াজ হইল—টিং। তখনকার মনের উত্তেজনায় তিনি কোন একজন দেবতার বাহনের প্রত্যাশায় চোখ মেলিলেন। কিন্তু যাহা দেখিলেন ও শুনিলেন তাহাতে তাঁহার চমক ভাঙিল, আশা ধূলিসাৎ হইল, বরং আশঙ্কায় বুক দুরদুর করিতে লাগিল। এ যেন এক লাফে কৈলাস শিখর হইতে কচুবনে পতন। শব্দটি সাইকেলের ঘণ্টা, আগন্তুক কোন বরদাতা দেবতা নহেন—তারবাহী টেলিগ্রাফ পিয়ন। আমাদের দেশে লোকে সাধারণতঃ মনে করে টেলিগ্রাম মৃত্যু বা তাহার কাছাকাছি কোন বিপদের সংবাদবাহক। এবার কমেডির উপর কমেডি। তার দুঃসংবাদই বহন করিতেছে—তবে ইহা ভূতোর মৃত্যুসংবাদ এবং পিসীর দুরারোগ্য ব্যাধির সংবাদ। বকুলালের পক্ষে ইহাই অতি সুসংবাদ। দশ লাখ টাকার মালিক পিসীর এখন তিনিই একমাত্র উত্তরাধিকারী। টেলিগ্রাফ পিয়নের পক্ষেও ইহা প্রত্যাশাতীত আনন্দের কারণ হইল। সে শুনিয়া আসিয়াছিল যে, টেলিগ্রাফে দুঃসংবাদ আছে; সুতরাং বখশিশ প্রত্যাশা করা যাইবে না। কিন্তু বকুলাল আনন্দের আতিশয্যে তাঁহার তখনকার সমস্ত পুঁজি—মানিব্যাগস্থিত তিন টাকা ছ আনা—পিওনের হাতে উজাড় করিয়া দিলেন; বিস্মিত আনন্দে পিওন চম্পট দিল। প্রত্যাশাতীত পুলকের সঙ্গে সামান্য প্রত্যাশাভঙ্গের কমেডিও যুক্ত হইল। পিসীমার বাড়ি আসিয়া এবং পিসীমার সম্পত্তির মালিক হইয়া বকুলাল অল্পবিস্তর ক্ষোভের সহিত লক্ষ্য করিলেন যে, যে সম্পত্তি তাঁহার হাতে আসিল তাহার মূল্য পাঁচ লাখ—দশ লাখ নয়!

ইহার পর বকুলালবাবুর উত্তরোত্তর ঋদ্ধিলাভ এবং রাজনৈতিক অভিলাষের অঙ্কুর ও পরিণতি অনেকটা মামুলি ধরনের বিদ্রূপ এবং উপসংহারের প্রহসন কেদার চাটুজ্যের চরিত্রানুগ হইলেও কমেডি হিসাবে সার্থক নহে। কেদার চাটুজ্যে পরশুরামের সৃষ্টি, কিন্তু দোষেগুণে বকুলাল কেদার চাটুজ্যের সৃষ্টি। উদো ও নগেনকে ধমক দিয়া, বিনোদ উকিলের প্রশ্নের লাগসই উত্তর দিয়া, পুলিসের স্পাই হরেন ঘোষালের বিরুদ্ধে যথোচিত সতর্কতা অবলম্বন করিয়া, প্রত্যেকটি সন্ধিক্ষণকে উপযুক্ত মর্যাদা দান করিয়া তিনি এই গল্পের উপর স্বকীয় প্রতিভার স্বাক্ষর রাখিয়া দিয়াছেন। তিনি একাধারে পাঁচালি কাব্যরচয়িতা, রামাঙ্ককর গল্পকার এবং সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ববিদ ও অভিনব বৈজ্ঞানিক।

(৪)

পরশুরাম হাস্যরসিক; শুধু তাই নয় তিনি বহুশ্রুতও বটে। ছদ্মনাম পরিত্যাগ করিয়া রাজশেখর বসু যে সকল গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, তাহার দিকে একটু নজর দিলেই তাঁহার বহুবিষয়িনী মনীষার পরিচয় পাওয়া যায়। এই বিদগ্ধ লেখক শেক্সপীয়রের ফলস্টাফের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না এমন কথা ভাবাই যায় না। যাহা হউক, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে শেক্সপীয়রের এই শ্রেষ্ঠ কমিক চরিত্র—পাঠকবর্গের মতে সাহিত্যজগতের অন্যতর শ্রেষ্ঠ কমিক চরিত্র—পরশুরামের একটি অতিশয় মজাদার চরিত্রকে প্রভাবিত করিয়াছে। ইহাদের কাহিনী ও পরিবেশে কোন সাদৃশ্য নাই। স্যার জন ফলস্টাফ রাজদরবারের লোক, যুবরাজ (এবং উত্তরকালে ফ্রান্সবিজয়ী রাজা পঞ্চম হেনরী) তাঁহার সাকরেদ। জটাধর বকশী ভবঘুরে লোক; তাহার কর্মক্ষেত্র দিল্লীর খুব আটপৌরে চায়ের দোকান, কালীবাবুর ছোট্ট টি-ক্যাবিন। ফলস্টাফের জীবনে যে বৈচিত্র্য, ব্যাপ্তি, জটিলতা ও গভীরতা আছে তাহা জটাধরের বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন ছিঁচকে চুরি ও ক্ষুদে তঞ্চকতার মধ্যে নাই এবং ফলস্টাফের মত মহীয়ান ধাপ্পাবাজের সঙ্গে তাহার তুলনা আপাতদৃষ্টিতে পরিমাণ-বোধের অভাব বলিয়া ধিক্কৃত হইতে পারে। ফলস্টাফ অসাধুতা ও আদর্শ-বিমুখিতাকে দর্শনে পরিণত করিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহার কর্মধারার মধ্যে পৌর্বাপর্য আছে এবং মরিস মরগ্যান এই কল্পিত চরিত্রের জীবনালেখ্য রচনা করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। ফলস্টাফের পরিণতি করুণ এবং ইহা লইয়া সমালোচকদের মধ্যে বহু বাদবিতণ্ডা হইয়াছে। জটাধরের তিনটি অভিযানের মধ্যেও সঙ্গতি আছে, কিন্তু ধারাবাহিকতা নাই এবং তাহার জীবনের পরিণতি আমরা জানি না বা সেই সম্পর্কে কৌতূহলও বোধ করি না। কিন্তু এইসব পার্থক্য মানিয়া লইলেও ইহা দাবী করাযাইতে পারে যে ফল-স্টাফের সঙ্গে জটাধর বকশীর মৌলিক সাদৃশ্য আছে এবং সেই সাদৃশ্যই জটাধরকে পরশুরামের রচনায়—তথা বঙ্গসাহিত্যে—অনন্যতা দান করিয়াছে।

● ফলস্টাফকে শেক্সপীয়রের তিনটি নাটকে দেখা যায়—*Henry VI* প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে, যেখানে তিনি যুবরাজ হেনরির দোসর ছিলেন। হেনরী রাজা হইয়া ফলস্টাফকে বিতাড়িত করিলেন এবং *Henry V* নাটকে ফলস্টাফের মৃত্যুর কথা উল্লিখিত হইয়াছে। 1—*Henry IV* এবং 2—*Henry IV*

ছাড়া তৃতীয় একটি নাটকেও ফলস্টাফকে দেখা যায়—*The Merry Wives of Windsor*। এখানকার পরিবেশ একেবারে পৃথক—দুই মধ্যবিত্ত পরিবারের চতুরা গৃহিণীদের পাল্লায় পড়িয়া ফলস্টাফ নাজেহাল হইয়াছেন। পরিবেশ যেমন বিভিন্ন, এখানকার ফলস্টাফও বিভিন্ন। অধিকাংশ পাঠক ও সমালোচক এই বিপর্যস্ত কামুকের সঙ্গে হাসির রাজা ফলস্টাফের নাম ছাড়া অন্য কোন ঐক্য স্বীকার করেন না। The Merry Wives of Windsor-এর মেকি ফলস্টাফের অনুকরণে দীনবন্ধু মিত্র 'নবীন তপস্বিনী'র জলধরকে আঁকিয়াছেন। কিন্তু পরশুরামের জটাধর আসল ফলস্টাফের—অর্থাৎ *Henry IV* নাটকদ্বয়ের ফলস্টাফের সমগোত্রীয়। ইহাই পরশুরামের কৃতিত্ব।

ফলস্টাফ ও জটাধরের বড় সাদৃশ্য এই যে ইহাদের উভয়ের কারবার মিথ্যা লইয়া ; আর, ইহারা সাধারণ মিথ্যাবাদীর মত রাখিয়া ঢাকিয়া মিথ্যা কথা বলে না। যুবরাজ হেনরী বলিয়াছেন, ফলস্টাফের মিথ্যা পর্বতের মত বিপুলকায় এবং উন্নতশীর্ষ—ইহাকে ভুল করিবার কোন অবকাশ নাই। সঙ্গীদের সঙ্গে রাহাজানি করিয়া ফলস্টাফ যখন পালাইতেছিলেন তখন মাত্র একজন অনুচর সঙ্গে লইয়া হেনরী চোরের উপর লাফাইয়া পড়িলে সদলবলে ফলস্টাফ উর্ধ্ব-শ্বাসে দৌড়াইয়া আত্মরক্ষা করিলেন। অন্ধকার রাত্রিতে ফলস্টাফ দুই অতি পরিচিত বাটপাড়কে চিনিতেও পারিলেন না। লুঠের মালও পড়িয়া রহিল। পরদিন তিনি যুবরাজের কাছেই ইহাদের সঙ্গে কল্পিত যুদ্ধের এক বর্ণাঢ্য বিবরণ দিলেন। বক্তৃতার তোড়ে দুইজন চর্মবর্মপরিহিত আক্রমণকারী এগারজন হইয়া গেল! সমস্তটা এমন জীবন্ত বলিয়া মনে হইল যে যুবরাজও নির্বাক বিস্ময়ে শুনিয়া অবশেষে আসল কথা ব্যক্ত করিলেন। তখনও ফলস্টাফ ঘাবড়াইবার লোক নহেন ; তিনি বলিলেন ইন্‌স্টিংক্ট বা সহজাত বোধের ফলেই তিনি আন্দাজ করিতে পারিয়াছিলেন যে যুবরাজই তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজভক্ত প্রজা হিসাবে তিনি তো আর রাজার গায় হাত দিতে পারেন না। কাজেই তাঁহাকে সরিয়া পড়িতে হইল। এইভাবে ধর্ম ও নীতিকে ব্যঙ্গ করিয়া, তুচ্ছ করিয়া, মিথ্যা ও সত্যের প্রভেদ মুছিয়া ফেলিয়া তিনি এক অভিযান হইতে আর এক অভিযানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং শেষের অপ্রত্যাশিত প্রত্যাখ্যানের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত অক্ষত রহিয়াছেন।

জটাধর বকশীর চেহারার বর্ণনায় পাই—সে ছয় ফুট লম্বা, তাহার মজবুত

গড়ন ও কাইজারী গোঁফ এবং সে কথা বলে বাজখাঁই গলায়। অর্থাৎ তাহাকে সহজেই চোখে পড়িবে এবং তাহাকে ভুল করিবার উপায় নাই। তাহার স্পষ্ট মিথ্যা কথাগুলিও সেইরূপ—ইহারা স্পষ্ট, মজবুত, কানে বাজিয়া থাকে এবং মনে অনপনেয় ছাপ রাখিয়া যায়। কালীবাবুর ছোট টি-ক্যাবিনে সে আগন্তুক, হয়ত ইহার খোঁজখবর সে রাখে; তবে দোকানের মালিক এবং নিয়মিতভাবে যাহারা এখানে আসে তাহাদের কাহাকেও সে চেনে না। কিন্তু একনজরেই সে বুঝিয়া ফেলিল যে ইহারা অল্পবিত্ত, অল্পবুদ্ধি, ভীতু বাঙালী, ইহাদিগের কাছে ম্যাজিকের খেলা দেখাইতে হইলে খুব বেশি হাতসাফাইয়ের প্রয়োজন নাই, বাজখাঁই গলায় জাঁকালো গল্প জোর করিয়া বলিলেই ইহাদিগকে বিভ্রান্ত করা যাইবে। সে ইহাও বুঝিয়া ফেলিল যে বৃদ্ধ রামতারণ বিরাট ছেঁদা অর্থাৎ গ্রেট বোর হইলেও প্রবীণতা ও অনর্গল বকবকানির জন্য তিনিই এই ছোট আড্ডার নেতা এবং এই জাতীয় 'বকবক্তা'র কাছে বক্তৃতার জাঁকজমক করিতে পারিলেই ইনি কাবু হইবেন। ভূত দেখাইবার বাজি ধরিয়া সে এক প্রলয়ঙ্কর গল্প ফাঁদিল—সম্রাট জাহাঙ্গীর, ভবানন্দ মজুমদার এবং ইষ্টদেবীর কাছে তাঁহার প্রার্থনা, ভারতচন্দ্রের কাব্যে মহামায়া কর্তৃক দিল্লীতে ভূতসেনা প্রেরণের বর্ণনা প্রভৃতি জটাধর এমনভাবে এক নিঃশ্বাসে আওড়াইয়া গেল যে শ্রোতৃবর্গ তাহা উড়াইয়া দিতে পারে না। আর সে খুব বেশি দিনের কথা নয়, শ'তিনেক বছর আগে মাত্র। এই জমকালো মুখবন্ধের পর জটাধর একেবারে সমসাময়িক ইতিহাসে চলিয়া আসিল—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, একদিকে ইংরেজ ও তাহার সহায় চিয়াং-কাই-শেক, অপরদিকে দুর্ধর্ষ জাপান, ব্রহ্মদেশে রণক্ষেত্র, জাপানী আক্রমণ ও অগ্রগতি। ইহা এক হিসাবে অকাট্য ও বিশ্বাস্য আবার শ্রোতাদের অভিজ্ঞতার বাহিরে। সেই যুদ্ধে বহু ভারতীয়ও ইংরেজ সৈন্যবাহিনীতে ছিল, জটাধর তাহাদের অন্যতম—এই দাবীও কেহ খণ্ডন করিতে পারে না। এই কাহিনীর প্রত্যেকটি ধাপ যখন স্বীকৃত হইল এবং শ্রোতারা সবটাই মানিয়া লইলেন, তখন নিজের মৃত্যুর লোমহর্ষণ, চমকপ্রদ কাহিনী বর্ণনা করিয়া সে কবুল করিল যে সে-ই বহুপ্রত্যাশিত এবং সাগ্রহে ও সভয়ে প্রতীক্ষিত ভূত। বিভ্রান্ত, বিমূঢ় শ্রোতারা সম্বিৎ ফিরিয়া পাইবার পূর্বেই সে দোকানের মালিক কালীবাবুকে বলিল যে সে ভূত অর্থাৎ নিজেকে দেখাইয়া কথা রক্ষা করিয়াছে।

সুতরাং তাহার চা ও চুরুটের দাম রামতারণবাবু দিয়া বাজির শর্ত প্রতিপালন করিবেন। এই বলিয়া সে ভূতের মতই মুহূর্তের মধ্যে অন্তর্হিত হইল।

এই কাহিনী জাজ্বল্যমান মিথ্যা ; শুধু জটাধরের উপস্থিত উদ্ভাবনী বুদ্ধি ও বর্ণনানৈপুণ্য এবং তড়িৎ বেগে সিদ্ধান্তঘোষণা ও অন্তর্ধানের ফলে ইহা লইয়া তর্কবিতর্ক সম্ভব হইল না। ইহাতেও আপত্তি করা চলে না কারণ ভূত তর্ক করে না, আকস্মিক আবির্ভাব ও অপসরণ তাহার অস্তিত্বের ও কার্যপদ্ধতির প্রধান লক্ষণ। জটাধর চমকপ্রদ কাহিনী বলিয়া সকলকে হতবাক করিয়া চলিয়া গেল ; সে ঢুকিয়াছিল সাধারণ মানুষের মত, চা চুরুট চুন ও দোক্তার অর্ডারও দিল সেইভাবেই ; রামতারণবাবুর সঙ্গে তাহার তর্ক, কাহিনীর বর্ণনা প্রভৃতির মধ্যে কোথাও অশরীরী ছায়া আপতিত হয় নাই। তাহার সিদ্ধান্ত নির্জলা মিথ্যা, কিন্তু তাহার যুক্তির পদ্ধতি অকাট্য। এই অঘটন ঘটাইবার পারিশ্রমিক মাত্র সাড়ে চৌদ্দ আনা। এতটুকু পুরস্কারের জন্য এতখানি পরিশ্রম তাহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং ইহাই ফলস্টাফ হইতে তাহার মৌলিক পার্থক্যের পরিচয় দেয়। একবার যখন সেই প্রহসন-সম্রাটের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে তখন ইহাদের সাদৃশ্য ও পার্থক্যের কথা একটু সবিস্তারে বলা প্রয়োজন।

ফলস্টাফ শঠ ; কপট, মদ্যপ, পরস্বাপহরক, পরদারনিরত, বেশ্যাসক্ত এবং স্ত্রী পুরুষ ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সার্বভৌমিক প্রতারক—এক কথায় পাপিষ্ঠ। কেহ কেহ তো এই ইম্‌মরাল বা দুর্নীতিগ্রস্ত লোকটিকে সাহিত্যে অপাংক্তেয় বলিয়া মনে করেন। অবশ্য এই শেষোক্ত মতাবলম্বীর সংখ্যা খুব বেশি নয়, কিন্তু যাঁহারা রাজা হেনরী কর্তৃক তাঁহার প্রত্যাখ্যানকে সমর্থন করেন তাঁহারাও পরোক্ষে এই শ্রেণীর আওতায় আসেন। অপর দিকের সমালোচকরাও তাঁহাকে নীতিনিষ্ঠ বলিবেন না। তাঁহাদের মত—এবং সেই মতই গ্রহণযোগ্য—যে ফলস্টাফ ইম্‌মরাল নহেন,অ্যামরাল এবং সেইজন্যই এই চরিত্রের আবেদন অফুরন্ত, ইহার দীপ্তি অম্লান। ফলস্টাফ হইলেন সেই আদিম প্রাণশক্তির প্রতীক, যাহা বাঁচিতে চায়, ভোগ করিতে চায়, আলো চায়, আনন্দ চায়। ইহা সুনীতি-দুর্নীতির দ্বারা সীমিত হয় নাই। পরশুরামের কথা প্রয়োগ করিয়া বলা যায়, রামধনু, বিদ্যুৎ ও জ্যোৎস্নার যেমন কোন বয়স নাই, তেমনি ইহাদের কোন নীতিও নাই। সেইভাবেই বলা যাইতে পারে যে, ফলস্টাফের চরিত্রকে ধর্মবুদ্ধির ন্যায়দণ্ড স্পর্শ করিতে পারে না। এই জাতীয় চরিত্রের খণ্ডিত প্রকাশ এখানে-

ওখানে দেখা যায়, যেমন বার্নার্ড শ'য়ের অ্যালফ্রেড ডুলিট্‌ল (Alfred Doolittle) চরিত্রে ; নামেই প্রকাশ যে সে কিছু করিতে চায় না, সেই হিসাবে দানের অযোগ্য পাত্র। কিন্তু অযোগ্য বলিয়া কি তাহার ক্ষুৎপিপাসা বা ভোগাকাঙ্ক্ষা কাহারও অপেক্ষা কম ?

অ্যালফ্রেড ডুলি্‌টলকে ছাড়িয়া দিয়া ফলস্টাফ ও জটাধরে ফিরিয়া আসা যাক। জটাধরকে আমরা তিনবার দেখিতে পাই ; এই চিত্রগুলি খণ্ডিত হইলেও ইহাদের মধ্যে সুরের ঐক্য আছে। ফলস্টাফের মত তাহারও বেসাতি মিথ্যা ; সেও বারংবার কয়েকটি লোককে ঠকাইয়াছে। কিন্তু তাহার পরিশ্রমের তুলনায় পারিশ্রমিক খুবই কম, সুতরাং মিথ্যার কারবার করিলেও শঠতা তাহার পেশা নয়। উদ্ভাবননৈপুণ্যে সে ফলস্টাফের উত্তরাধিকারী, সেইজন্য যেটুকু কপটতা বা শঠতা অনিবার্য বিনাদ্বিধায় সে তাহা অবলম্বন করে এবং হয়ত তাহার যাহা আশু প্রয়োজন তাহাও মিটাইয়া লয়। কিন্তু সে ঠগ-জুয়াচোর শ্রেণীর মানুষ নয়। সে নিজেই নিজের যথার্থ বর্ণনা দিয়াছে : 'এই জটাধর বকশী একটু আমুদে বটে, কিন্তু খাঁটি মানুষ, চরিত্রে কোন কলঙ্ক পাবেন না।' সে বানানো ভূতের গল্প বলিয়া বীরেশ্বর সিংঘী মহাশয়কে ভয় দেখাইয়াছিল। সেজন্য সে ভেরি সরি, আর রামতারণ মুখুজ্যের যে সাড়ে চৌদ্দ আনা গচ্চা গিয়াছিল তাহার সমর্থনে সে বলিয়াছে যে সব গল্পই তো তাহা মিথ্যা। তবু লোকে পয়সা দিয়া কিনিয়া বই পড়ে কেন ? 'মনে একটু সুড়সুড়ি, একটু টিপুনী, একটু ধাক্কা লাগাবার জন্য।...পড়লে মেজাজ চাঙ্গা হয়। আর কোন্ গল্পের বই সাড়ে চৌদ্দ আনার কমে পাওয়া যায় ?' তাহার এই যুক্তি শ্রোতারাও মানিয়া লইয়াছেন।

তাহার পরের অ্যাডভেঞ্চারও এই জাতীয়। যে যাহাই বলুক, অচলা নামে কোন মেয়ে সে কোথাও দেখে নাই। তাহার আর বলহরির মধ্যে অচলাকে লইয়া যে কাড়াকাড়ি ইহা শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' গল্পের প্যারডি ছাড়া আর কিছুই নহে। বর্তমান গল্পে সে নিজেই শরৎ চাটুজ্যের নামও করিয়াছে। সে জানে যে রামতারণ মুখুজ্যে নিজেকে প্রবীণ, শাস্ত্রজ্ঞ, সাত্ত্বিক পুরুষ বলিয়া মনে করেন। সুতরাং পতি সম্পর্কে 'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে' ইত্যাদি যে শাস্ত্রীয় প্রবচন আছে তাহার সঙ্গে ঠিক মিলিয়া যায় এমন একটা গল্প ফাঁদিতে পারিলে, অচলাকে বিবাহ করার পূর্বে তাহাকে দিয়া শ্রাদ্ধ করাইবার এপিসোড যোগ করিয়া দিলে

এবং গল্পের ঠিক সন্ধিক্ষণে প্রব্রজিত স্বামীকে হাজির করিতে পারিলে যে 'জটিল' সমস্যার সৃষ্টি হইবে তাহার মধ্যেই রামতারণবাবু হাবুডুবু খাইবেন, অন্য সকলে হতচকিত হইয়া চুপ করিয়া যাইবে, ইতিমধ্যে অনুপস্থিত এবং সম্পূর্ণ কল্পিত অচলার দুষ্ট স্বামী প্রচুর আহার্য সঙ্গে লইয়া নির্বিঘ্নে পলায়ন করিয়া যাইতে পারিবে। কপিল গুপ্ত প্রথম হইতেই জটাধরের উদ্ভাবনী প্রতিভার সমঝদার ছিলেন এবং এখন এই স্কুলমাস্টার মহাশয় টেনিসনের এনক আর্ডেনের সঙ্গে এই কাহিনীর সাদৃশ্য ও পার্থক্যের উল্লেখ করিলেন। রিপোর্টার অতুল হালদার ব্যাপারটি খবরের কাগজে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়াছিলেন ; ভীরু বীরেশ্বর সিংঘী যখন দেখিলেন যে জটাধর ভূত নয় তখন বিজ্ঞের মত মন্তব্য করিলেন যে তিনি পূর্বেই বুঝিয়াছিলেন যে এই বলহরিই জটাধরের কল্পিত মাসতুতো ভাই যাহার বাড়িতে জটাধরের কল্পিত বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে।

এই আখ্যায়িকার আর একটা দিক আছে। জটাধর চপ চা প্রভৃতি যাহা নিজে খাইয়াছে এবং যাহা অচলাকে দিবে বলিয়া লইয়া গিয়াছে তাহার দাম মাত্র ন' টাকা ছ' আনা ; তাহার শ্রোতা কালীবাবুকে বাদ দিয়া উপস্থিত ছিলেন তেরজন। কপিল গুপ্তের প্রস্তাব অনুসারে ইহা সকলের মধ্যে 'চারিয়ে' দিলে জনপ্রতি এগার আনারও কম পড়ে। সুতরাং কপিল গুপ্ত ঠিকই মন্তব্য করিলেন, 'জটাধরের বিবেচনা আছে বেশী ঠকায়নি।' সবশুদ্ধ দেড়খানি উপন্যাসের দাম দাবী করিয়াছে। আমরা পূর্ব সিদ্ধান্তেই ফিরিয়া আসিলাম, জটাধর ঠগ জোচ্চোর কিছুই নয়, সে আমুদে মানুষ, লোককে মিথ্যা কাহিনী বলিয়া আনন্দ দেয়, নিজে আনন্দ পায় এবং সেই আনন্দের জন্য সামান্য খেসারত দাবী করে। উদ্ভাবনী শক্তিতে সে ফলস্টাফের অনুজ, সে লোককে আনন্দ দান করে, ক্ষণেকের জন্য 'চাঙ্গা' করে, কিন্তু ফলস্টাফের মত প্রতারক নয় এবং মূলতঃ সে খাঁটি লোক। এইজন্যই সে 'অল্পবিত্ত' লোকদের অল্পস্বল্প খরচ করাইয়াই থামিয়া যায়। সে জানে কালীবাবুর দোকানের মক্কেলরা কেহ টাকার 'আণ্ডিল' নয় ; সুতরাং ইহাদের নিকট হইতে অর্থ আদায় করিবার সময় যথেষ্ট বিবেচনার পরিচয় দেয়।

সমালোচকেরা ফলস্টাফের মধ্যে ক্রমিক অবনতি দেখিতে পাইয়াছেন আবার ইহা লইয়া তাহাদের মধ্যে মতদ্বৈধও আছে। জটাধরের উদ্ভাবনের মধ্যে কিন্তু একটির পর একটিতে উন্নততর কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়।

তাহার ঠাট্টাতামাশা সময়োপযোগী ও নির্দোষ এবং প্রতিবারই সে যতটুকু আনন্দ দিয়াছে তাহার তুলনায় মাশুল আদায় করিয়াছে যৎসামান্য। বিজয়ায় হিন্দুদের মধ্যে সিদ্ধি খাওয়ার রেওয়াজ আছে, আর রামতারণ মুখুজ্যের মত ধর্মধ্বজীরা যতই শাস্ত্রীয় অনুশাসনের দোহাই দিন, সিদ্ধি মাদক দ্রব্য। বিজয়ার দিন জটাধরের শেষ এবং সর্বাপেক্ষা সার্থক অভিযান। এবার সে কিছু ব্যয় করিয়া কমণ্ডলুসহ সাধুর বেশে আসিয়াছে। দ্বিতীয়বারের মত এবারও রামতারণবাবু খুব ক্রুদ্ধ হইলেন আর কপিল গুপ্ত শুধু তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন না নিজের খরচে তাহাকে চা ইত্যাদি দেওয়ার অর্ডার দিলেন। ইহার আগেই খবরের কাগজের রিপোর্টার অতুল হালদার—ইহার কড়া পানীয়ের আস্বাদ জানা আছে—শুভদিনে সিদ্ধির শরবতের অভাবের জন্য আক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং রামতারণ মুখুজ্যে, যিনি শাস্ত্রীয় নিয়মানুসারে একটু সিদ্ধি আস্বাদ করিয়াই আসিয়াছেন, হালদারকে এই বেয়াড়া আবদারের জন্য ভর্ৎসনা করিলেও বিজয়ার দিন সিদ্ধির শরবৎ যে শাস্ত্রানুমোদিত তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। জটাধর যেন দিব্যচক্ষে ইহাদের মনের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া সেইজন্য প্রস্তুত হইয়াই আসিয়া উপস্থিত হইল। সে জানে উত্তেজক পানীয়ের জন্য ইহাদের সকলেরই লোভ আছে, শুধু সাহস কম, আর্থিক সামর্থ্য আরও কম এবং এই সব ভীরু লোকের জন্য ধর্মের মুখোশ দরকার। মুখোশ উদ্ভাবনে, সময়োপযোগী বক্তৃতা দিতে জটাধরের জুড়ি নাই। তাই জটাধর উপযুক্ত মুখবন্ধ করিয়া একে একে শিকার ধরিতে লাগিল এবং একটু একটু করিয়া তাহার চাঙ্গায়নী সুধা স্বল্পমূল্যে কালীবাবুর খদ্দেরদের মধ্যে বিতরণ করিতে লাগিল। অতুল হালদার তো ইহার জন্য আগ্রহী হইয়া ছিলেন আর কপিল গুপ্ত প্রথমাবধিই তাহার প্রতি অনুকূল ছিল ; সুতরাং মাত্র চার আনার বিনিময়ে গুপ্ত মহাশয় এক হাতা এই নবাবিষ্কৃত সুধার একটু নমুনা আস্বাদ করিলেন। তারপর ধরা দিলেন অতুল হালদার এবং তারপর বীরেশ্বর সিংঘী ; ইহাও দেখা গেল ইহারা সবাই এই অতি উপাদেয় বস্তুর আস্বাদে মুগ্ধ হইয়াছেন। এবার বড় শিকার রামতারণও ফাঁদে পা দিলেন ; তিনি এক বেশি জড়াইয়া পড়িলেন কারণ তিনি বেশখানিকটা পান করিলেন এবং তাঁহার সৎদৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া উপস্থিত সবাই একটু বেশি করিয়া সোমরস সেবন করিলেন। অতুল হালদার তো বলিলেন ইহার কাছে বিলাতী পানীয়ের রাজা শ্যাম্পেনও তুচ্ছ।

মাদক দ্রব্যের যাহা ফল এই বিশুদ্ধ সন্ন্যাসীর 'অবদান' বলিয়া বিজ্ঞাপিত মাদকসেবনেও সেই প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। প্রথমে লোভ, তারপর সাময়িক উত্তেজনা, তারপর মোহ, তারপর বুদ্ধিভ্রংশ ও স্মৃতিবিভ্রম, তৎপর সুখনিদ্রা। স্ব স্ব চরিত্রানুযায়ী বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য রাখিয়া অতুল হালদার, কপিল গুপ্ত, বীরেশ্বর সিংঘী ও রামতারণ এবং অন্যান্য সকলেই বুদ্ধিভ্রংশের পরিচয় দিয়া নিদ্রায় লীন হইলেন। সুযোগ বুঝিয়া দোকানের মালিক কালীবাবু এবার আগাইয়া আসিলেন, তিনি ধর্মীয় বক্তৃতার অন্তরালে ব্যবসায়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন; কাজেই টেন পারসেণ্ট কাটিয়া লইলেন। কিন্তু জটাধর তাঁহাকেও চিনিত। কালীবাবুরও চাঙ্গায়নী সুধার প্রতি লোভ হইবে ইহা স্বাভাবিক এবং জটাধর ধনলোভী ও সুধালোভীকে এক আঘাতেই একেবারে ঘায়েল করিল। কালীবাবু দাম দিবেন না, সদাশয় জটাধর সমব্যবসায়ীর নিকট হইতে দাম দাবীও করিল না। পাত্রে বাকী যাহা ছিল প্রসন্নবদনে সে তাহা কালীবাবুকে দিল এবং একটু বেশি মাত্রায় পানের ফলে কালীবাবুর চোখ ঢুলু ঢুলু করিতে লাগিল। মজাটা শেষ করিয়া জটাধর কালীবাবুর অনুমতি লইয়া তাঁহার ক্যাশবাক্স হইতে পঁচিশ টাকা হাওলাত (!) লইয়া চম্পট দিল। সূক্ষ্ম হিসাব করিলে দেখা যাইবে এই পঁচিশ টাকার মধ্যে পাঁচ টাকা—টেন পার্সেণ্ট—জটাধরের দেওয়া কমিশন। আর সবাই গড়ে টাকা তিনেক দিয়াছিলেন; কালীবাবুর ভাগে পড়িল কুড়ি টাকা। কালীবাবু পান করিয়াছিলেন বেশি মাত্রায় আর মুনাফা করিতে যাওয়ার লোভেরও প্রায়শ্চিত্ত চাই। সুতরাং তাঁহার দণ্ডও যে খুব বেশি হইল তাহা বলা যায় না। সবটা হিসাব করিলে, জটাধরের ভাষা অবলম্বন করিয়াই বলা যায় যে সে অতি সস্তায় উপস্থিত ব্যক্তিদের 'মনোরঞ্জন' করিয়াছিল। তাহার নিজের ব্যয় বাদ দিলে তাহার আর্থিক লাভ ছিল অতি অকিঞ্চিৎকর।
